# গল্পসমগ্র

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী



# গল্পসমগ্র

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
বিজয়কৃষ্ণ দাস
৩৬, কলেজ রো
কলিকাতা-৯



প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা—১৯৮৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৭
তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৮৯

**মূল্য—বার টাকা**

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীঅসিত কুমার মণ্ডল
এ. এস. বি. প্রিণ্টার্স
১৯/এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

# সূচীপত্র

## সহজে কি বড়লোক হওয়া যায় ?

ছেলেবেলায় একটু একটু একগুঁয়েমো প্রায় সকলেরই থাকে। আমার কথা শুনিয়া কেহ চটিবেন না। চটিলেও বড় একটা অসুবিধা বোধ করিব না। অনেকের অভ্যাস আছে তাহারা খাঁটি কথা শুনিলে বিরক্ত হয়, কিন্তু কাহাকেও বিরক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার নিজের দশা দেখিয়াই আমি উপরের কথাগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

ছেলেমানুষের একটা রোগ আছে। অনেক কাজ তাহারা আপনা আপনি করিয়া অন্য লোককে বিরক্ত করে, আবার যদি কেহ সেই কাজ তাহাদিগকে করিতে বলিল অমনি সেই কাজের মিষ্টত্বটুকু তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যায়। দাদা প্রথম বই পড়িতে শিখিয়াছে, তার বইয়ে সুন্দর সুন্দর ছবি। পড়িবার সময় দাদা বই খুঁজিয়া পাইত না। আমার চোখ পড়িলেই আমি বইখানা হস্তে করিয়া, কেহ খুঁজিয়া না পায় এমন কোন জায়গায় যাইয়া বসিতাম। শেষে, একদিন শুনিলাম ঐ বইখানা আমারও পড়িতে হইবে। আমার আনন্দের সীমা রহিল না, তখনই দৌড়াইয়া যাইয়া সঙ্গীদের সকলকে খবরটা দিয়া আসিলাম। পরদিন মাষ্টার আসিলেই বই হাতে করিয়া হাজির। মনে করিলাম, প্রথম ছবিটার কথা আজ হইবে। মাষ্টার প্রথম ছবির পাতে একটু আসিলেনও না—ছবিশূন্য একটা পাতা উল্টাইয়া, এ, বি, সি, ডি করিয়া কি বলিতে লাগিলেন ! তখন হইতে আর সেই বই আমার ভাল লাগিল না।

দাদা ইস্কুলে যাইবার সময় মাঝে মাঝে আমাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইত। দাদাদের মাষ্টার বড় ভালমানুষ। আমি মনে করিলাম ইস্কুলের সকল মাষ্টারই বুঝি ঐরূপ। বাড়িতে তিন বছর থাকিয়া কয়েকখানা বই শেষ করিলাম। তাহার পর আমাকেও স্কুলে পাঠাইয়া দিল। কয়েক বছর বেশ চলিতে লাগিলাম ; কিন্তু মাষ্টারকে আর তত ভাল লাগে না। কবে বড়মানুষ হইয়া ইস্কুল ছাড়িয়া দিব এই চিন্তাটা বড় বেশি মনে হইত। তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, ইংরাজি যে কয়েকখানা বই পড়িয়াছিলাম তাহার একখানিতে এক সাহেবের কথা লেখা ছিল। তিনি বাড়ি ছাড়িয়া বিদেশে গিয়াছিলেন, সেখানে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া শেষটা অনেক টাকা করিয়াছিলেন। সাহেব যে বয়সে বাড়ি ছাড়িয়াছিলেন, মিলাইয়া দেখিলাম আমারও এখন ঠিক সেই বয়স। তবে

আর চাই কি ! ক্লাসে সতীশের সঙ্গে আমার বড় ভাব ; আমি সতীশের কাছে মনের কথাগুলি খুলিয়া বলিয়া ফেলিলাম। কথা শুনিয়া সতীশ যেন আর তার ছোট শরীরটির মধ্যে আঁটে না। তখনই সে লাফাইয়া উঠিল। বোধ হইল বাড়ি হইতে বিদেশে চলিয়া গেলেই বড়লোক হওয়া যাইবে। সতীশ বলিল, 'কালই চল।' কাল চলাটা তত সহজ বোধ হইল না। কিন্তু বেশি দেরি করা হইবে না, সেটা ঠিক করা হইল।

একদিন ইস্কুল হইতে ছুটি লইয়া বাড়ি আসিলাম ; সতীশও আসিল। বাবা বাড়ি ছিলেন না। বাড়ির অন্যান্য লোকও চুপ করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। চুপি চুপি কয়েকখানা কাপড় দিয়া একটি পুঁটুলি বাঁধিলাম। তারপর বাবার বাক্স হইতে কতকগুলি টাকা লইয়া দুজনে চোরের মত বাড়ির বাহির হইলাম। পাছে কেহ আসিয়া ধরে, সেই ভয়ে দুজনে মাঝে মাঝে দৌড়াইতে লাগিলাম। এইরূপে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটিয়া এক বাড়িতে যাইয়া উঠিলাম।

সেই বাড়ির কর্তা আমাদের অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন ; আমাদের সম্বন্ধে যা যা কথা সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমরা কোনো কথারই ঠিক উত্তর দিই নাই। স্থানে স্থানে দু-একটি কথা গড়িয়া কহিতে হইল। তিনি আমাদের কথায় বুঝিয়া লইলেন যে আমরা দুজন পথ হারাইয়া ঘুরিতেছি ; বলিলেন, 'কাল আমি একজন লোক দিয়া তোমাদের দুজনকে বাড়ি পাঠাইয়া দিব।'

খাইবার সময় ভদ্রলোকটি আমাদের সম্মুখে বসিয়া থাকিলেন, আমাদের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠিলেন না। একটি কুঠুরিতে আমাদের দুজনের ঘুমাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। সেখানে আর কেহ ঘুমাইতে আসিল না। আমি কিছু সুবিধা ভোগ করিলাম। ভাবিলাম কর্তা যাহা বলিলেন তাহা কাজে করিলে আর বড়লোক হওয়া হইবে না ; সুতরাং কেহ জাগিবার পূর্বেই কর্তাকে ধন্যবাদ না দিয়া চলিয়া যাওয়া ঠিক হইল। সতীশকে ডাকিলাম, 'সতীশ ! সতীশ !'—সতীশ কথা কয় না। সতীশের চক্ষে জল পড়িতেছে ! কর্তার কথায় সতীশের মন ফিরিয়া গেল নাকি ? বাস্তবিকই তাই ; অনেক পীড়াপীড়ি করার পর বলিল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।' আপনারা কি মনে করিতেছেন ? সতীশের কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব কি প্রকার হইল ? বড়লোক হওয়ার ইচ্ছাটা আমার এত বেশি হইয়াছিল যে, বাড়ি ছাড়িয়া অবধি আমার বোধ হইতেছিল, যেন বড়লোকের কাছাকাছি একটা কিছু হইয়াছি ! সতীশকে আমি কাপুরুষ মনে করিতে লাগিলাম, সতীশের মা বাপ আছেন, আমারও মা বাপ আছেন। প্রভেদ এই যে আমি স্বার্থপর ; সতীশ তাহা নহে। সতীশের মনে যে সকল চিন্তা উঠিতেছিল, আমার অন্তঃকরণে তাহার স্থান পাইল না। আমি সতীশের অবস্থা বুঝিতে পারিলাম না। মা বাপের মনে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু নিজের কথা

লইয়া এত ব্যস্ত ছিলাম যে তাঁহাদের কথা ভাবিবার অবসরই পাই নাই। নানা চিন্তার মধ্যে ঘুম আসিল।

ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিলাম যে, আমি বাড়িতে কি একটা কথা লইয়া মার সঙ্গে রাগারাগি করিয়াছি। মা কত সাধিতেছেন আমার ভ্রূক্ষেপ নাই; রাগ যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। মার চক্ষে জল পড়িতেছে দেখিয়া যেন আমার প্রতিহিংসার ভাবটা চরিতার্থ হইতে লাগিল। আমি দাঁত খিঁচাইয়া মাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলাম। মা আমার হাত ধরিতে আসিলেন; আমি পাশের



একটা গাছে উঠিতে চেষ্টা করিলাম। হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম; এমন সময় আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। স্বপ্নের কথা ভাবিয়া চক্ষে দুফোঁটা জল আসিল, কিন্তু আবার সেই বড়লোক হওয়ার কথা! সতীশের মন ফিরিয়া গিয়াছে। সতীশ জাগিয়া আর যাইতে চাহিবে না, হয়ত আমারও

যাওয়া হইবে না। রাত হয়ত আর বেশি নাই ; এইবেলা সতীশকে না বলিয়া যাওয়াই ভাল। আমি আস্তে আস্তে উঠিলাম। আমার কাপড় আর টাকাগুলি লইয়া বাহির হইলাম। রাত্রি তখনো অনেক ছিল, কিন্তু আমার বোধ হইতে লাগিল যেন এই ভোর হইয়া আসিতেছে। একটা বড় রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। অনেকক্ষণ হাঁটিলাম, কিন্তু রাত ফুরায় না। রাস্তাটা একটা বড় নদীর ধারে যাইয়া শেষ হইয়াছে ; আমিও সেইখানে যাইয়া থামিলাম—তারপর যাই কোথা ? রাস্তাটা নিশ্চয় ওপারে যাইয়া আবার চলিয়াছে কিন্তু ওপারে যাই কেমন করিয়া ? এতক্ষণ রাত ফুরাইল না। হয়ত আরো অনেক দেরি। ঘাটে একখানি নৌকা বাঁধা ছিল—নৌকার ছই নাই। একজন লোককে অনায়াসে ওরূপ নৌকা অনেকবার চালাইতে দেখিয়াছি, আমার বোধ হইতে লাগিল আমিও পারি। নৌকায় উঠিতে বিলম্ব হইল না। যে লগিটিতে নৌকা বাঁধা ছিল তাহা তুলিয়া লইলাম। ডাঙ্গায় ভর করিয়া ঠেলিয়া নৌকা জলে ভাসাইয়া দিলাম। জলের গায় এত জোর আগে ভাবি নাই। শোঁ শোঁ করিয়া নৌকার গায় জল বাধিতে লাগিল ; নৌকাখানা ঘুরিয়া গেল। হঠাৎ ঘুরিবার সময় তাড়াতাড়ি লগিটি ছাড়িয়া দিলাম। নৌকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাঙ্গা হইতে অনেক দূরে যাইয়া পড়িল—স্রোতে ভয়ানক বেগের সহিত ভাসিয়া যাইতে লাগিল, আমি কিছুকাল হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলাম।

বিপদের পরিণামটা প্রথম তত বুঝি নাই, শেষে কিছু কিছু করিয়া হুঁশ হইতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া গেল। দুহাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলাম। ঢেউগুলি তড়াক তড়াক করিয়া নৌকাখানিকে দোলাইতে লাগিল, তখন মায়ের সেই মুখখানি মনে হইল। কেন বাড়ি ছাড়িয়া আসিলাম ? সেই অন্ধকার রাত্রি, ভয়ানক নদী, আর বাড়ির ছোট কুঠুরীটি—সেই কোমল সুন্দর বিছানাটি মনে হইল। দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। সেই আঁধারে পড়িয়া, মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কেন সতীশের সঙ্গে গেলাম না। তাহাকে কেন ছাড়িয়া আসিলাম ?

এইভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ নৌকাখানি একদিকে যাইয়া ঠেকিল। চমকিয়া দেখিলাম কতকগুলি বড় বড় নৌকা, তাহারি একটাতে আমার নৌকা ঠেকিয়াছে। আমি সেই মুহূর্তের জন্য আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু তার পরক্ষণেই নৌকা হইতে কতকগুলি কালো অর্ধ-উলঙ্গ লোক বাহির হইয়া কেঁউ মেঁউ করিয়া কি বলিতে লাগিল ; আমি বুঝিতে পারিলাম আমাকে গালি দিতেছে ; তাহারা আমার কথা বুঝিল বলিয়া বোধ হইল না। আরো বেশি গালাগালি দিতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য নৌকার লোক আসিয়া গোলমালে যোগ দিল। আমার কথা শুনিয়া সকলেই ঐ লোকগুলিকে গালি দিতে লাগিল। একটি ভদ্রলোক সেখানে ছিলেন ; তিনি দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার নৌকায় লইয়া গেলেন, নিজ হাতে আমার পুঁটুলিটি

যত্ন সহকারে এককোণে রাখিয়া দিলেন। তারপর আমাকে বলিলেন, 'আমি কা—যাইতেছি ; তোমার আপত্তি না থাকিলে আমার সঙ্গে যাইতে পার, আমার বাড়িতে তোমার কোন ক্লেশ হইবে না'। আমি তাঁহার সঙ্গেই চলিলাম।

কা— ছোট একটি শহরের মত। অনেক লোক। বড়লোকও অনেকগুলি আছেন। আমি যাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাঁহাকে এখানে কালিদাসবাবু বলিব, তিনিও একজন বড়লোক। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার পুরাতন রোগ আবার দেখা দিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম এখানে থাকিয়া বড়লোক হওয়া যায় কি ? যায় বইকি। না হইলে ইহারা এত গাড়ি চড়ে কি করিয়া ? বোধ হইল যেন কালিদাসবাবুর বাড়িতে থাকিয়া হঠাৎ একদিন বড়লোক হইয়া যাইব। একদিন কালিদাসবাবু ডাকিলেন। কালিদাসবাবুর উপর প্রথম হইতেই আমার বড় শ্রদ্ধা হইয়াছিল। যখনই তিনি আমাকে ডাকিতেন তখনই একখানা সুন্দর কিছু উপহার পাইতাম। আমার বয়সের অনেকেই এখন ভাল কাজ করিতেছেন ; কিন্তু আমার যেন তখনো শিশু ভাবটা যায় নাই। কালিদাসবাবুও তাহা বেশ বুঝিতেন ; যাহা হউক আমি কালিদাসবাবুর নিকট যাইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার নাম ধরিয়া বলিলেন, 'গিরিশ, এখানে তোমার কেমন লাগে ?'

'দিব্যি।'

'বটে ? তা এখান থেকে তোমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না ?'

'কোথায় যাব ? এখানেই থাকব।'

'তা বেশ' বলিয়া কালিদাসবাবু কপাল হইতে চশমা নামাইয়া ছাপার কাগজ পড়িতে লাগিলেন। কাগজের প্রথম পাতে একটি ছবি। আমার সেই সাহেব ! আমি একটু আশ্চর্য হইলাম। অনেকদিন পরে কোন পরিচিত বন্ধুর সাক্ষাত পাইলে যেরূপ হয় আমারও সেইরূপ হইল। একটি ছোট কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইল ; আমি বলিয়া উঠিলাম, 'আরে !' কালিদাসবাবু কাগজ নামাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার অর্থ, ব্যাপারখানা কি ?

আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে ঐ ছবিটে !'

'ইনি একজন বড়লোক ছিলেন, তোমারও বড়লোক হতে ইচ্ছে হয়, না ?'

আমি ভাবিলাম এই বুঝি ! হঠাৎ প্রশ্ন হওয়াতে থতমত খাইয়া বলিলাম, 'বড়লোক কি সবাই হয় ?'

'হয় বই কি। ইচ্ছে করলে তুমিও হতে পার।'

'আমি পারি ?'

'অবিশ্যি। কাল থেকে তোমাকে ইস্কুলে পাঠিয়ে দেব ভেবেছি। লেখাপড়া না শিখলে বড়লোক হওয়া যায় না। তাই তোমাকে ডেকেছিলাম। কেমন ?'

আমার বাতাসের ঘর ভাঙিয়া গেল। যার চোটে বাড়ি ছাড়া সেই আপদ ! আমি কোন কথা কহিলাম না।

কালিদাসবাবু এতে সন্দেহ করেন নাই, সুতরাং কিছু বলিলেন না। এরূপ

কথাবার্তা কালিদাসবাবুতে আর আমাতে অনেক দিন হইত। তিনি আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতেনঃ 'সেই রাত্রিতে নৌকায় কেমন করিয়া আসিলে।' 'বাড়ি কোথা?' 'মা বাপ নাই?' ইত্যাদি—আমি প্রায়ই চুপ করিয়া থাকিতাম। কালিদাসবাবুর ইচ্ছা ছিল, সুযোগ পাইলেই আমাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু এ-সব সম্বন্ধে কোন খবরই আমি তাঁহাকে দিতে চাহিতাম না। তখন তিনি সে-সব বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া সেখানেই আমাকে লেখাপড়া শিখাইবার মনস্থ করিলেন।

ইস্কুলে যাইয়া অবধি আমার আর মনে শান্তি ছিল না। কয়েকদিন কোন মতে কাটাইলাম, কিন্তু শেষটা অসহ্য হইয়া উঠিল। কালিদাসবাবুর বাড়িতে থাকা হইবে না। কিন্তু হঠাৎ যাই কোথায়? গেলেও আর এবার হাঁটিয়া যাওয়া হইবে না। কা— হইতে দুখানা স্টীমার ধু—তে যাতায়াত করিত। সপ্তাহে দুদিন স্টীমার চলে। ধু— যাইতে তিনদিন লাগে। হিন্দুরা এই তিনদিনের চিঁড়ে পুঁটুলি-বাঁধিয়া লইয়া জাহাজে উঠে। ভোরবেলা জাহাজ ছাড়ে।

একদিন নদীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া দেখি স্টীমার একইমাত্র ঘাটে আসিয়া থামিল। পরের দিন ভোরে চলিয়া যাইবে। হঠাৎ স্টীমারে উঠিয়া ধু— চলিয়া যাইতে আমার বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল, বাড়ি আসিয়া কেহ না দেখে এমন ভাবে আমার কাপড়-চোপড় সব একত্র জড় করিলাম। কালিদাসবাবুর বাড়ি আসিবার কালে সঙ্গে করিয়া যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহার একটিও ব্যয় হয় নাই। কালিদাসবাবুও মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছামত খরচ করিবার জন্য দু-একটি দিতেন। আমি সমস্তই সঞ্চয় করিতাম। শুনিয়াছিলাম, বড়লোকেরা সহজে টাকা খরচ করিতে চাহে না।

যাত্রার উপযোগী সকল জিনিস প্রস্তুত রাখিয়া ঘুমাইলাম। মনে একটা চিন্তা থাকিলে সহজে ঘুম হয় না, ঘুম হইলেও শীঘ্রই ভাঙিয়া যায়। আমারও তাই হইল, বড় কামরার ঘড়িতে চারটা বাজিল, আমি অমনি উঠিলাম। সঙ্গে পুঁটুলিটি। পুঁটুলিতে কয়েকখানা কাপড়, একজোড়া চটী-জুতো, নগদ কিছু টাকা, কালিদাসবাবু মাঝে মাঝে যে উপহার দিতেন, সেগুলি—কয়েকখানা ছবি, একটা বড় ছুরি আর আমার স্কুলের পুস্তকগুলি। পুস্তকগুলি কেন সঙ্গে লইলাম ঠিক বলিতে পারি না। তবে কালিদাসবাবু বলিয়াছিলেন, 'লেখাপড়া না শিখলে বড়লোক হওয়া যায় না।' তাহাতেই মনে কেমন একটা ভয় রহিয়া গিয়াছিল। এইরূপ সাজসজ্জা করিয়া ছাতাটি হাতে করিয়া, বিছানার চাদরখানা পুঁটুলির উপর জড়াইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলাম, স্টীমার ঘাটে আসিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। সেখানেই মুদীর দোকান হইতে চিঁড়ে কিনিয়া বিছানার চাদরের এক কোণে বাঁধিয়া লইয়া, জাহাজের একজন লোক আমাকে একটা জায়গা দেখাইয়া দিল, আমি সেইখানে যাইয়া বসিলাম।

জাহাজে বিশেষ কিছু ঘটনা হইল না। তবে সঙ্গে যে টাকা আনিয়াছিলাম তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। নিয়মিত সময় জাহাজ ধু— পোঁছিল।

রামলোচনবাবু আমাদের ওদিককার লোক, তিনি ধু-তে থাকেন, সেখানকার একজন নামজাদা উকীল। আমি ভাবিলাম দেশের একজন লোক, তাঁহার কাছে গেলে তিনি অবশ্যই কিছু খাতির করিবেন। জাহাজ হইতে তীরে উঠিয়াই তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। একটি ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ি দেখাইয়া দিলেন। আমি আস্তে আস্তে বাড়ির একজন চাকরের মত লোককে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রামলোচনবাবুর এই বাড়ি ?' সে লোকটা আমার কথার উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। মুখ বিকৃত করিয়া একটা বড় ঘরে চলিয়া গেল ; অগত্যা আমি অন্য লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সে যাহা বলিল তাহাতে জানিলাম, আমি যাহাকে রামলোচনবাবুর চাকর মনে করিয়াছিলাম, তিনিই রামলোচনবাবু ! তাই অত রাগ ! আমি ভয়ে ভয়ে রামলোচনবাবুর ঘরের দরজায় দাঁড়াইলাম। তিনি একটা তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। অত কালো আমি আর দেখি নাই। মোটা বেশি নন, কিন্তু প্রায় বুকের উপর কাপড় পরেন। গোঁফগুলি সোজা সোজা, চুল অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে। কানে একটা কলম, হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় টানিয়া বসিয়াছেন। উরুদেশের উপর একটা লম্বা খাতা রাখিয়া তাহাই দেখিতেছেন, আর মাঝে মাঝে কাহার উদ্দেশ্যে মুখ বাঁকাইতেছেন। তাকিয়ার একটা অংশ কলম মুছিবার স্থান বলিয়া বোধ হইল। কিছুকাল পরে দেখিলাম যে তাহা নহে। পাশে একটি মাটির দোয়াত, তাহা হইতে ঘাঁটিয়া এক কলম কালি লইয়া খাতায় যেন কি লিখিলেন। তারপর কলমটি মাথার চুলে ঘসিয়া কানে বসাইয়া হাতের দুটি আঙ্গুল তাকিয়ার ঐ স্থানটিতে পুঁছিলেন। তার পরক্ষণেই এক হাতের কনুই তাকিয়ার উপর রাখিয়া, একখানা পা আমার দিকে বাড়াইয়া 'ভাউ' শব্দের উদগার করিলেন। শেষটা আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। প্রথম প্রশ্ন হিন্দী ভাষায় হইল ; তাহার পর বাংলা।

'কি চাই ?'

'আজ্ঞে আমি অনেক দূর থেকে এসেছি—'

'আমিও অনেক দূর থেকে এসেছি।'

'আমার নিবাস স্থ—।'

'আমারও নিবাস স্থ—। তারপর ?'

'মহাশয় যদি—'

'ম-হা-শ-য় যদি ! কি—ঞ্চি—ৎ—সা—হা—য্য ? দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার আমার কাছে নাই। হিঁয়াসে চলে যাও।'

আমি আর মুহূর্তও সেখানে বিলম্ব করিলাম না। কোথা যাইব ঠিক

নাই, কিন্তু রামলোচনবাবুর বাড়িতে আর পদার্পণ করা হইবে না। রাস্তায় বাহির হইয়া একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'যে কোন মুদীকে পয়সা দিলেই থাকবার জায়গা আর খেতে দেবে।' মুদীর দোকান খুঁজিয়া লওয়া কঠিন বোধ হইল না। দুদিন মুদীর দোকানে খাইলাম। কিন্তু এরূপ ভাবে খাইলে বেশিদিন পয়সায় কুলাইবে না, এই চিন্তায় রাত্রিতে ঘুম হয় না। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া মুদীর পয়সা হিসাব করিয়া দিলাম। তারপর পুঁটুলিটি হাতে করিয়া বাহির হইলাম। রাস্তায় কতদূর হাঁটিয়া দেখি একটা বড় বাড়ি। এ বাড়ির কর্তা রামলোচনবাবুর মত না-ও হইতে পারেন। আস্তে আস্তে বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলাম. কর্তা বসিয়া আছেন, আর ইয়ার গোছের একটা অভ্যাগত লোক তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন। আমি দাঁড়াইবামাত্র কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে বাপু ?'

'আমি। আমি পথিক, কষ্টে পড়েছি।'

'ইয়ার ! বড় খিদে পেয়েছে বুঝি ?'

আমি কোন উত্তর করিলাম না ; ইয়ার-বাবু উত্তর দিকে আঙুল নির্দেশ করিয়া চোখ বড় করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—

'হোটেল আছে, হোটেল। বাবুরচি লোক দিব্যি রাঁধে—রোজ পাঁচ টাকাতেই চলে।'

আমি নিরাশ হইয়া বাবুর দিকে তাকাইলাম। বাবু ইয়ারের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিলেন, 'নিজের বাড়িতে একটি লোককে খেতে দিতে পারো না, আবার অন্য লোকের বাড়ি এসে চাষামো কর। আর আমার বাড়ি এসো না।' বলা বাহুল্য, বাবুর উপর আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সম্মান ইত্যাদি যত হইতে পারে, সব কটা জন্মিয়া গেল। বাবু আমাকে বলিলেন, 'তোমার অন্য কোনরূপ কষ্ট না হলে আমার বাড়িতে তোমার থাকবার জায়গা আর খাবার বন্দোবস্ত হতে পারে।'

'আজ্ঞে আমি অমনি থাকতে চাই নে। আপনার কিছু কাজ করে দেব, তার পরিবর্তে যদি কিছু খাবার দেন তা হলে ভাল হয়।'

'উত্তম ! তুমি ইংরাজি লিখতে পার ?'

'কিছু কিছু ইংরাজি পড়েছিলাম বটে, কিন্তু ভাল লেখাপড়া জানি না।'

'কতদূর পড়েছ ?'

আমি বলিলাম।

'বেশ ! তাতেই হবে।'

আমি বাবুর বাড়ি রহিলাম। কাজের মধ্যে এই, বাবুর চিঠিপত্র সব একটা নকল করিয়া রাখিতে হয়। এখানে থাকিয়া মাঝে মাঝে বাড়ির কথা ভাবিতাম। বড়লোক হইবার জন্য কত কষ্ট পাইলাম, কিন্তু বড়লোক হইবার তো লক্ষণ দেখিতেছি না। কেবল বাড়ি হইতে চলিয়া আসিলেই কি বড়লোক হওয়া যায় ?

আরো কিছু চাই, আমার তাহা নাই। এইরূপ যতই ভাবিতে লাগিলাম ততই বাড়ি ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। শেষটা ঠিক করিলাম বাড়ি যাইতে হইবে। আমার হাতে যে কিছু টাকা আছে তাতে পথ খরচা চলিবে না। সুতরাং এবার স্টীমারে যাওয়া হইবে না। বৈ-তীর্থ এখান হইতে বড় বেশি দূরে নয়; সেখানে গেলে সঙ্গী পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তার পর মনে করিলাম, বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ— যাইব; সেখানে সঙ্গী পাইলে তাহাদের সহিত বাড়ি যাইব।

কর্তার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৈ— আসিতে বড় বেশি দেরী হইল না। জায়গাটা দেখিতে বড় সুন্দর, একটি ছোট পাহাড়, তার উপরে তীর্থস্থান। পাথরের গায়ে সিঁড়ি কাটা আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। অনেকগুলি সিঁড়ি, উঠিতে অনেকক্ষণ লাগে। আমি উঠিতে উঠিতে তিনবার বিশ্রাম করিলাম। প্রথমেই যাহাকে দেখিলাম তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, 'যাত্রীরা কোথায় থাকে?' সে বলিল, 'যাত্রীদের থাকিবার ভাল জায়গা নাই। প্রায় সকলেই পাণ্ডাদের বাড়িতে থাকে।' উপরে যে দেব মন্দির, সেই মন্দিরের পুরোহিতদের নাম পাণ্ডা। পাণ্ডা খুঁজিতে অধিকক্ষণ ঘুরিতে হইল না। প্রথমে যে পাণ্ডা আমাকে দেখিল সেই হাত ধরিয়া আমাকে তাহার বাড়ি লইয়া গেল।

পাণ্ডার বাড়ি দুদিন থাকিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে বিষয়টা তত সুবিধা-জনক নহে। আমি যে সময় গিয়াছি সে সময় যাত্রীরা প্রায়ই আসে না। সঙ্গী পাইতে হইলে আরো তিন মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। তিন মাসের ত কথাই নাই, পাণ্ডা মহাশয় যেরূপ করিলেন তাহাতে তৃতীয় দিনেই আমাকে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিতে হইল। তৃতীয় দিন সকালে পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন, 'দেখিবি? চল্।' আমি চলিলাম। অনেক জিনিস দেখা হইল। শেষে এক জায়গায় গেলাম; সেটি একটি বড় মন্দির। মধ্যে গহ্বর, গহ্বরের নীচে ছোট এক ঝরনার মত। পাণ্ডা বলিল, 'এখানে পূজা করিতে হইবে।' কত লাগিবে তাহারও হিসাব দেওয়া হইল। আমি দেখিলাম, তা হলে আমার বাড়ি যাওয়া হয় না। আমি বলিলাম, 'আমি ছেলেমানুষ, পূজা কি করিব?' পাণ্ডা চটিয়া গেল, সেদিন হইতে আর আমাকে তাহার বাড়িতে জায়গা দিল না। অগত্যা আমার সেখান হইতে প্রস্থান করিতে হইল। কিছুদূর গেলেই কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে আসিয়া 'পয়সা' 'পয়সা' করিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। আমি কোন মতেই পয়সা দিতে চাহিলাম না। তাহারা ক্ষেপিল। কেহ গাল দেয়, কেহ কাপড় ধরিয়া টানে, কেহ দূর হইতে ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়িয়া ফেলে। আমার মাথা গরম হইয়া গেল। কাছে একখানা ছোট কাঠ পড়িয়াছিল, রাগের চোটে তাহাই হাতে করিয়া লইয়া ছেলেগুলাকে তাড়া করিলাম। মুহূর্তের মধ্যে সকলে অদৃশ্য হইল। আমার যেন ভূত ছাড়িল। সেখান হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া

পাহাড়ের প্রায় অর্ধেক পথ আসিয়া পড়িলাম। তখন মনে হইল, জুতা জোড়াটি ফেলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইহার পূর্বের পঁচিশ মিনিটের মধ্যে পাহাড় সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে মনে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। আমি জুতার আশা পরিত্যাগ করিলাম। চলিবার সময় সর্বদাই চটি জোড়াটি পুঁটলিতে বাঁধিয়া লইয়া যাইতাম, এক্ষণে তাহাই খুঁজিয়া লইলাম।

পাহাড়ের নিচে নামিতে নামিতে অনেক বেলা হইল। একটু একটু করিয়া ক্ষুধা বাড়িতে লাগিল। কোন দোকানে যাইতে হইলে অন্তত এক প্রহর চলিতে হইবে। সেই রোদে আর এক ঘণ্টা চলাই অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। পথের ধারে দু-একটি গাছ দেখিলেই ইচ্ছা হইতেছিল যে সেইখানেই শুইয়া পড়ি। কিন্তু একদিকে তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যাইতেছে এবং অন্যদিকে ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। কি করিব কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া পথের ধারে একটি বাড়ি খুঁজিয়া লইলাম। বাড়িতে উঠিয়া একটা বড় ঘরে গেলাম, সেখানে দুটি ছেলে বসিয়া ছিল। আমি তাহাদের নিকটে আমার ক্ষুধার কথা জানাইলাম। তাহারা 'তুই' 'তুই' করিয়া আমার কথার উত্তর দিতে লাগিল। একজন বলিল—'বাঙালী লোক চোর আর খ্রীষ্টান; বাঙালী লোককে কিছু দিব না।'

'আমি ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ, চোর নই।'

'যা তুই এখান থেকে ঃ c-r-i-p crip ঃ d-a-s-h dash.'

আমার তখন ঠাট্টার মেজাজ ছিল না। তথাপি এরপর আর হাসি থামাইতে পারিলাম না। তখন তাহাদের ধরনের কথা কহিতে লাগিলাম ঃ 'ওর মানে কি হলো ?'

'ও ইংরাজী। Ram is ill. I will not let him run in the sun. বাঙালী লোক চোর ; যা তুই এখান থেকে।'

'তোরা ইস্কুলে পড়িস ?'

এবার যেন তাহারা কিছু ভয় পাইল। বলিল, 'আমাদের মাষ্টার বড় বই পড়ে।'

'তোমাদের মাষ্টারের চাইতে আমি কি কম একটা কিছু ? এই দেখ ত !'

আমার পুঁটুলিতে যে বইগুলি ছিল, তাহার মধ্যে Lamb's Talesও ছিল। সেইখানা এখন বাহির করিলাম।

এইবেলা একটু পরিবর্তন দেখা গেল। তাহাদের মুখভঙ্গিতে বুঝা গেল যেন তাহারা মনে করিয়া লইয়াছে যে আমি একটা কিছু হইব। একজন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উঠিয়া গেল। যে রহিয়া গেল আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাহার সহিত আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তাহার কথায় বুঝা গেল যে তাহারা দুভাই। সে ছোট। বাবা নাই, মা আছেন, ইস্কুলে

পড়ে ; টাকা আছে, চাকর চাকরাণী আছে। বলা বাহুল্য, সে বাড়িতে তখনকার জন্য আমার বিশ্রামের সংস্থান হইল।

আমার জন্য একটি ছোট ঘর নির্দিষ্ট করা হইল। আমি তাহাতে যাইয়া বসিলাম। তখন সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে, সুতরাং নূতন আহারের আয়োজন করা হইল। একজন আসিয়া আমাকে স্নান করিতে বলিল। আমি কাছের একটা পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম যে জল-খাবারের জন্য কতকগুলো ভিজানো চাল আর কিছু সন্দেশ লইয়া বড় ছেলেটি আমার ঘরে বসিয়া আছে। চালগুলি ভিজিয়া ঠিক ভাতের মত হইয়াছে। সেখানে খাবার সময় ঐরূপ চাল অনেককে খাইতে দেখিয়াছি। আমি খাইতে বসিলাম। ছেলেটি আমার কাছে বসিয়া রহিল। তাহার ভাব ভঙ্গিতে বোধ হইতে লাগিল যেন কিছু বলিতে আসিয়াছে। কিছুকাল পরেই সে আমার গায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। আমি কিছু চমৎকৃত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। সে বলিল, 'মা বলে দিয়েছেন আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি শাপ দিলে আমার অনিষ্ট হবে। আমি আপনাকে মন্দ কথা বলেছি।'

'তোমার উপর আমি রাগ করি নাই। তোমার কথায় আমার কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিব, যেন তিনি তোমার ভাল করেন।' তাহাকে বুঝানো কিছু কষ্টকর বোধ হইল। কিন্তু শেষটা সে যেন খুসী হইল এবং বলিল, 'তবে যাই, মা'র কাছে বলিগে।'

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিলে সেই ছেলে দুটির নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইলাম। সেদিন রাত্রিতে এক বাজারে মুদীর দোকানে ছিলাম। তারপর দুই দিন ঐ ভাবে গেল ; সারাদিন পথ চলিতাম ; কেবল দু-বেলা খাবার জন্য কোন মুদীর দোকানে উঠিতাম। রাত্রিতে কোন মুদীকে পয়সা দিয়া তাহার ঘরে থাকিবার জায়গা পাইতাম। তৃতীয় দিন রাত্রিতে থাকিবার জন্য আর মুদীর ঘর পাইলাম না। কাজেই একজন গৃহস্থের বাড়ি যাইতে হইল। গৃহস্থ জায়গা দিতে কোন আপত্তি করিলেন না। কিন্তু খাওয়া শেষ হইলে 'কড়া' 'বগুণো' সব দেখাইয়া বলিলেন, 'কাল চলে যাবার আগে এইগুলো মেজে দিয়ে যেতে হবে। তুমি বাঙালী, তোমার এঁটো কে নেবে?' আমি মহা বিপদে পড়িলাম। বলিলাম, 'ওগুলো আমি ছুঁই নাই। তবে আমি যা যা ছুঁয়েছি সেগুলো দাও, এখনি মেজে দিচ্ছি।' সুতরাং একখানা থালা আর একটি বগুণো (বগুণোতে ডাল ছিল) আমার ঘাড়ে চাপিল। তিনি বাড়ির কাছে একটা পুকুর দেখাইয়া দিলেন ; আমি তথায় যাইয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া আসিলাম। প্রায় অর্ধঘণ্টা সময় লাগিল।

পরিশ্রমের পর সুনিদ্রা হইল। পরদিন গৃহস্থ ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইলেন, উঠিয়া দেখি সূর্য উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি পুঁটুলি হাতে করিয়া বাহির হইলাম। গৃহস্থের নিকট বিদায় লইবার সময় ফা—যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি

বলিলেন, 'একটা বড় মাঠ, তারপর একটা পাহাড়, তারপর ফা—। একই পথ, ভুল হবার জো নাই।'

কিছুদূর হাঁটিয়াই একটা মাঠে আসিলাম। সেখানে পথিকদিগের জন্য একটি ঘর আছে। তথায় একজনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার সঙ্গে একটা ঘোড়া। সে আমাকে দেখিয়াই বলিল, 'বেশ, চল। একজন সঙ্গীর জন্য বসিয়াছিলাম।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সঙ্গীর প্রয়োজন কি?' সে বলিল 'তুমি আর কখনো এখানে চল নাই? একা গেলে খেয়ে ফেলবে!' আমার ভয় হইল।

মাঠের এপাশ থেকে ওপাশ দেখা যায় না। অতি কম চওড়া পথ; দশ বার হাত অন্তর ছোট ছোট খসখসের ঝোপ। জীবজন্তুর মধ্যে এক জাতীয় পাখি। পাখিটি একটি চড়াই অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়, গায়ের রং সবুজ; ঠোঁট সরু এবং লম্বা, স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল। ক্রমাগত একই রূপ শব্দ করিতেছে—'টিরিরিণ টিরিরিণ টিরিরিণ।' লেজে একটা নতুনত্ব আছে। লেজের মধ্যদেশ হইতে প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা একটি সূচীর মত বাহির হইয়াছে। আমার সঙ্গী বলিল, 'শ্বশুর বাড়ি গিয়ে ছুঁচ চুরি করেছিলেন। তাতেই ঐ শাস্তি।' অন্য কিছু না থাকাতে ঐ পাখিকেই বারবার ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ চারিটার সময় ছোট একটি ঘর দেখিতে পাইলাম। সঙ্গী বলিল, 'আজ এখানেই থাকিতে হইবে। আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, 'চারটের সময় বসে থাকতে হবে কেন!'

সঙ্গী বলিল, 'মাঠে রাত হলে বাঘে খাবে।' বাঘে খায় এরূপ ইচ্ছা আমার ছিল না। সুতরাং সে রাত্রির জন্য ঐ ঘরেই থাকিলাম। রাত্রিতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া অনেক প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে-সব নাকি হাতির শব্দ। সৌভাগ্যক্রমে হাতিগণ আমাদের কোন খবর লইতে আসিলেন না। কিন্তু পরদিন উঠিয়া দেখি ঘোড়াটি নাই! ঘোড়ার স্বামী অনেক আক্ষেপ করিল।

মাঠ পার হইতে প্রায় চারিটা বাজিল। মাঠ যে জায়গায় শেষ হইয়াছে, সেখানেও দেখিলাম একটি ছোট ঘর। সেখানে আসিলে সঙ্গী বিদায় লইয়া অন্য পথে গেল। আমি আমার নির্দিষ্ট পথে আস্তে আস্তে চলিলাম। কিছুদূর যাইয়া একটি মাহুতকে পাইলাম, সে হাতি লইয়া ফা— চলিয়াছে। আমি চারি আনা পয়সা দিব বলাতে সে আমাকে তাহার হাতির পিঠে একটু স্থান দিল। মহাসুখে ফা— আসিলাম। কালিদাসবাবুর সাথে সাক্ষাৎ করিতে সাহস পাইলাম না। রাত্রিতে একটি মুদীর দোকানে থাকিয়া পরদিন ভোরে রওয়ানা হইলাম।

পথে যে-সকল ছোটখাট ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে একদিনের কথা বলা আবশ্যক। দুই প্রহরেও আর মানুষের সাড়া শব্দ পাইলাম না। বেলা যতই কমিয়া আসিতে লাগিল, ততই ক্রমাগত নির্জন স্থানে

যাইয়া পড়িতে লাগিলাম, তারপর কেবল একটা মাঠ ; দুই ধারে উলুবন এবং অন্যান্য দুই একটি ছোট ছোট গাছ। এরূপ জায়গায় সন্ধ্যা হইল। কি করি, কোথায় যাই ? প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলাম। পথ এত সংকীর্ণ যে দুই পাশের গাছে গা লাগে। থাকিয়া থাকিয়া আমার বুক গুড় গুড় করিয়া উঠিতে লাগিল ! এমন সময় হঠাৎ যেন পিঠে একটা কি লাগিল ! চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, একজন পাহাড়ী লোক। সে আমাকে কি একরকম ভাষায় বলিল—'তুই কোথায় যাস ? তোর প্রাণের ভয় নাই ?' এই বলিয়া সে আমাকে তাহার পিছু পিছু যাইতে সংকেত করিল। আমি সহজেই তাহার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলাম। সে দুই হাতে উলুবন সরাইয়া শুয়োরের মত দৌড়াইতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে আমাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, 'আরে আয়, মরে যাবি।' আমি হতবুদ্ধি হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এইরূপে চলিলাম বলিতে পারি না। অবশেষে একটা বড় নদীর ধারে আসিলাম। সেখানে দেখিলাম, আরো কয়েকজন লোক বসিয়া আছে। পাহাড়ী বলিল, যতক্ষণ নৌকা আসিয়া ওপারে না যায়, ততক্ষণ এখানে বসিয়া থাকিতে হইবে। আমি তাহাদের সঙ্গে মাটিতে বসিলাম। অন্যান্য সকলে পুঁটুলি হইতে খাবার খুলিয়া খাইতে লাগিল। পাহাড়ীর সঙ্গে কতকগুলি কমলালেবু ছিল। সে আমাকে তাহার খাবার খাইতে দিল। আমি তাহাই খাইয়া, নাক-মুখ কাপড়ে ঢাকিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। অন্যান্য লোকেরা আমাকে বলিতে লাগিল, 'ঘুমিও না, খেয়ে ফেলবে।' তেমন অবস্থায় ঐরূপ উপদেশ বাক্যের অত্যন্ত আবশ্যক ছিল, কারণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমে আমার গা অবশ হইয়া আসিতেছিল। এবং একটুকু পরেই অতি নিকটে 'ঘঁ্যাওর' ঘঁ্যাওর' করিয়া বাঘ ডাকিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি চারি পাশে দূরে নিকটে হিংস্র জন্তুর শব্দ হইতে লাগিল। সে রাত্রির কথা আমার জীবনে আর কখনো ভুলি নাই। নৌকাওয়ালা পারে বসিয়া সুখভোগ করিতেছে ; সেখানে নৌকা বোঝাই না হইলে ফিরিয়া আসিবে না। সমস্ত রাত্রি আমাদের প্রাণ হাতে করিয়া সেই ভয়ানক স্থানে বসিয়া থাকিতে হইল। পরদিন নৌকা আসিলে আমরা ওপারে গেলাম।

ইহার তিনদিন পরে বাড়ির কাছে বাজারে আসিলাম। সেখানে দই চিঁড়া সন্দেশ ইত্যাদি যাহা কিছু মনে হইল উদরস্থ করিয়া পথ কষ্টের প্রতিহিংসা বিধান করিলাম। দুইটার সময় বাড়ি আসিলাম। তখন বাড়িতে কেহ ছিল না। গা ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল ; শীতে অস্থির হইয়া গেলাম। আশে পাশে যে কয়খানা লেপ কাঁথা ছিল, উপর্যুপরি গায় দিয়া বিছানায় পড়িলাম। শক্ত জ্বর হইল। ফাঁকি দিয়া বড়লোক হওয়া স্বপ্নটা ভাল রকমেই ভাঙ্গিয়া গেল।

## বড়লোক কিসে হয় ?

সহজে কি বড়লোক হওয়া যায় ? এই নামের প্রস্তাবটি শেষ করিবার সময়ে আমরা গিরিশের পরে কি হইল তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। কিন্তু গিরিশের জীবনে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল যে আমরা সে-সব বলিতেও কষ্ট বোধ করি। তবে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে বেচারা কোনদিনই বড়লোক হইতে পারে নাই। দুঃখ-কষ্টের একশেষ তাহার জীবনে হইয়াছিল। পরিশেষে সে নিজের হাতে নিজের জীবন শেষ করিয়া দিল।

গিরিশের সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা হইয়াছে মোটামুটি সবগুলিই সত্য। কথাগুলি যথার্থ বলিয়াই সেগুলি এত গুরুতর। তাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, আমরা যদি তাহার মতন কাজ করি, কে জানে, কোনদিন আমাদের সম্বন্ধেও কেহ এইরূপ গল্পসকল বলিয়া লোককে সাবধান করিবে না। পরে কষ্ট পাওয়ার চাইতে আগে সতর্ক হওয়া ভাল।

বড়লোক হওয়ার ইচ্ছা থাকিলেই বড়লোক হয় না; তাহা হইলে অত কম লোককে বড়লোক হইতে দেখিতাম না। ইচ্ছা ত সকলেরই আছে, তোমার আমার নাই ? কিন্তু আমি যে আজিও ছোটলোকই রহিয়াছি। শুধু ইচ্ছা থাকিলেই বড়লোক হয় না, ইচ্ছার খুব দরকার, কিন্তু আরো কিছু চাই। গিরিশের ইচ্ছা যথেষ্ট ছিল। তাহার পক্ষে যতটুকু কুলাইয়াছিল সে ত চেষ্টারও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তবুও সে বড়লোক হইল না। হইবে কেমন করিয়া ? কিরূপে কি করিতে হইবে তাহা যদি না জানিলাম, তবেত সেই গাধা রামকান্তের মতই রহিলাম। রাম ক্লাশে একদিনও উপরে উঠিতে পারিল না, নিচে নামিবারও জায়গা ছিল না। গুরু মহাশয় তাহকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, 'ওরে তোর আর কি কিছু হবে! ভাল ছেলে হতে হলে তেল পোড়াতে হয়, খাটতে হয়, কষ্ট সহ্য করতে হয়!' রামকান্ত একদিন বাড়ি আসিয়াই দু-সের তেল কিনিয়া আনিল। ঐ তেলে কাপড় ভিজাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। তারপর ঘরের চালে দড়ি বাঁধিয়া তাহাতে প্রাণপণে দুলিতে লাগিল। সর্বশেষ দড়ি ছিঁড়িয়া আগুনের উপর অর্ধদগ্ধ, অর্ধভগ্ন শরীরে নিষ্কৃতি পাইল। যে দুই সপ্তাহ শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল তাহার মধ্যে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিল, মাষ্টার মহাশয় ভুল করিয়াছেন। সে সরল লোক, যেদিন স্কুলে গেল সেদিনই মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করিল। রামকান্তের যে ভুল, গিরিশ বেচারারও সেই ভুল। ভাই, আমরা যে বড়লোক হই

না, আমাদেরও অনেকের সেই ভুল। যদি বড়লোক হইতে ইচ্ছা থাকে—'নাই' যদি বল তবে আমি হাসিব—তবে প্রথমে কি কি কাজ করিলে বড়লোক হয়, বেশ করিয়া জানো, তারপর নিঃশব্দে শান্তভাবে আপন কার্যে প্রবৃত্ত হও। অনেক কষ্ট পাইতে হইবে ; তাহার জন্য যথেষ্ট সহিষ্ণুতা চাই। অনেক সুখ পায়ে ঠেলিতে হইবে। তাহার জন্য সমুচিত ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। এত করিয়াও কতজন উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে বড় হইতে পারিতেছে না। তুমিও পারিবে কিনা জানি না—আমি ইচ্ছা করিতেছি তোমরা সকলেই পারিবে। কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে তোমার পক্ষে যতটুকু হওয়া সম্ভব তাহা হইতে গেলেই আমি যাহা বলিলাম সব কয়টি করিতে হইবে।

বড়লোক, বড়লোক, এতবার বলিলাম। কিন্তু যতজন বড়লোক হইতে চাহিতেছেন সকলেই কি বুঝিতে পারিতেছেন যে বড়লোক হওয়ার অর্থ কি? একটা লোক বলিতেছিল যে, 'আমার ছেলের বিবাহেতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছি।' তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল ; 'বল ত দেখি লাখ টাকা বলিলে কতগুলি টাকার কথা বলা হয়?' সে বলিল, 'কেন, লাখ টাকা আর লাখ টাকা দুকুড়ি দশ টাকা।' বড়লোক হওয়া সম্বন্ধেও অনেকের ঐরূপ মত। অনেকের কেবল নিজের বেলাই ঐ মত। তাহারা বড় ছোটলোক। ভাই, বড়লোক না হও দুঃখ নাই, কিন্তু ছোটলোক হইও না।

কোন ভাল বিষয়ে খুব ভাল হইলে বড়লোক হয়। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়লোক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়লোক, লর্ড রিপন বড়লোক, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বড়লোক, সুরেন্দ্রবাবু বড়লোক ইত্যাদি। ইহাদের সকলেই এক বিষয়ের জন্য বড় হন নাই। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখিবে ইঁহাদের যাঁহার মধ্যে যেটুকু ভাল তাহার জন্যই তাঁহাকে বড়লোক বলা হয়। বড় চোরকেও বড়লোক বলা হয় না, বড় ডাকাতকেও বড়লোক বলা হয় না।

আর এক কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যার জন্য আমরা তাঁহাকে অত বড়লোক বলি না। মহেন্দ্রবাবু নিজের ঘরে কবাট দিয়া বিজ্ঞানচর্চা করিলে আমরা তাঁহাকে অত বড়লোক বলিতাম না, অন্তত তাঁহার প্রতি আমাদের অত শ্রদ্ধা হইত না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লর্ড রিপন, ইঁহারা কে কি শাস্ত্র অধিক জানেন, কি কিছু বা জানেন না তাহার হিসাবও হয়ত আমরা কেহ দিতে পারিব না। সুরেন্দ্রবাবুর স্কুল আছে, সেখানে তিনি পড়ান, এজন্য তাঁহাকে কেহ বড়লোক বলে না। যিনি যে পরিমাণে লোকের উপকার করিতেছেন তিনি সেই পরিমাণে লোকের ভালবাসা পাইতেছেন। বড়লোক এবং ভাল লোক, এ উভয় হইলেই যথার্থ বড়লোক। বড়লোক হওয়া যেরূপই কঠিন হউক না কেন, ভাল লোক চেষ্টা করিলেই হওয়া যায়, এবং তাহাই আগে হওয়া উচিত। কাহারো যদি এক কোটি টাকা থাকে তাঁহাকে সুদ্ধ ঐ টাকাগুলির জন্য বড়লোক বলিব না। তিনি নিজের সদ্‌গুণের সাহায্যে উহা

উপার্জন করিয়া থাকিলে অবশ্য তাঁহাকে বড়লোক বলিব। কিন্তু যখন দেখিব তিনি ঐ টাকা দিয়া দেশের উপকার করিতেছেন, তখনই তাঁহাকে যথার্থ বড়লোক বলিব। কারণ, তখন তিনি বড়লোক এবং ভাল লোক উভয়ই হইয়াছেন। বড়লোক বড়, ভাল লোক ভাল, বড়লোক ভাল হইলে বড় ভাল।

## বানর রাজপুত্র

এক রাজার সাত রানী, কিন্তু ছেলেপিলে একটিও নেই। রাজার তাতে বড়ই দুঃখ, তিনি সভায় গিয়ে মাথা গুঁজে বসে থাকেন, কেউ এলে ভাল করে কথা কন না।

একদিন হয়েছে কি, এক মুনি রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। মুনি রাজার মুখ ভার দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজা, তোমার মুখ যে ভার দেখছি; তোমার কিসের দুঃখ?'

রাজা বললেন, 'সে কথা আর কি বলব মুনি ঠাকুর! আমার রাজ্য, ধন, লোকজন সবই আছে, কিন্তু আমার যে ছেলেপিলে নেই, আমি মরলে এ-সব কে দেখবে?'

মুনি বললেন, 'এই কথা? আচ্ছা, তোমার কোন চিন্তা নেই। কাল ভোরে উঠেই তুমি সোজাসুজি উত্তর দিকে চলে যাবে। অনেক দূর গিয়ে একটা বনের ধারে দেখবে একটা আমগাছ রয়েছে। সেই আমগাছ থেকে সাতটি আম এনে তোমার সাত রানীকে বেটে খাইয়ে দিলেই, তোমার সাতটি ছেলে হবে। কিন্তু খবরদার, আম নিয়ে আসবার সময় পিছনের দিকে তাকিয়ো না যেন!'

এই কথা বলে মুনি চলে গেলেন। তারপর দিন গেল, রাত হলো, ক্রমে রাত ভোর হলো। তখন রাজামশাই তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে সোজাসুজি উত্তর দিকে চলতে লাগলেন। যেতে যেতে অনেক দূর গিয়ে তিনি দেখলেন, সত্যি সত্যি বনের ধারে একটা আমগাছ আছে, তাতে পাকা পাকা সাতটি আমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেই বনে তিনি কতবার শিকার করতে এসেছেন, কিন্তু আমগাছ কখনো দেখতে পান নি। যা হোক, তিনি তাড়াতাড়ি সেই গাছে উঠে আম সাতটি পেড়ে নিয়ে বাড়িতে ফিরে চললেন।

খানিক দূরে যেতে না যেতেই শুনলেন, কে যেন পিছন থেকে তাঁকে ডাকছে,

ওগো রাজা, ফিরে চাও,
আরো আম নিয়ে যাও।

মুনি যে সাবধান করে দিয়েছিলেন, সে কথা রাজার মনে ছিল না। তিনি পিছন থেকে ডাক শুনেই ফিরে তাকিয়েছেন, আর অমনি আমগুলো তাঁর হাত থেকে ছুটে গিয়ে আবার গাছে ঝুলতে লেগেছে। কাজেই রাজামশাই-এর আবার গিয়ে গাছে উঠে আমগুলি পেড়ে আনতে হলো। এবার আর তিনি কিছুতেই মুনির কথা ভুললেন না। তিনি চলে আসবার সময় পিছন থেকে তাঁকে কত রকম করে ডাকতে লাগল, 'চোর' 'চোর' বলে কত গালও দিল। রাজামশাই তাতে কান না দিয়ে বোঁ বোঁ করে বাড়ির পানে ছুটলেন।



বাড়ি এসে রানীদের হাতে সাতটি আম দিয়ে রাজামশাই বললেন, তোমরা সাতজনে এই সাতটি আম বেটে খাও।'

ছোটরানী তখন সেখানে ছিলেন না। বড় রাণীরা ছ'জনে মিলে তাঁকে কিছু না বলেই সব কটি আম খেয়ে ফেললেন। ছোটরাণী এর কিছুই জানতে পারলেন না, কিন্তু তাঁর ঝি সব দেখল। বড় রাণীদের খাওয়া হয়ে গেলে সে আমের ছালগুলি চুপিচুপি কুড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই ছালগুলো ধুয়ে বেটে ছোটরাণীর হাতে দিয়ে বলল, 'মা, এই ওষুধটা খাও, তোমার ভাল হবে।' ওষুধ খেতে হয়, তাই ছোটরাণী আর কোন কথা না বলেই সেটা খেয়ে ফেললেন।

তারপর বড় রাণীদের সকলের এক-একটি সুন্দর খোকা হলো, রাজা তাতে খুশি হয়ে খুব ধুমধাম আর গানবাজনা করালেন। ছোটরাণীরও একটি খোকা

হলো, কিন্তু সেটি হলো বানর। বানর দেখে রাজা চটে গিয়ে ছোটরাণীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। দেশের লোকের তাতে বড়ই দুঃখ হলো। তারা একটি কুঁড়ে বেঁধে ছোটরাণীকে বলল, 'মা, তুমি এইখানে থাকো।'

সেইখানে ছোটরাণী থাকেন। বানরটি সেখানে থেকে দিন দিন বড় হচ্ছে। সে মানুষের মত কথা কয়। আর তার এমনি বুদ্ধি যে, কোন কথা তাকে শিখিয়ে দিতে হয় না। যখন যে কাজের দরকার, অমনি সে তা করে। সারাদিন সে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে যে ফল দেখে তা খায়, খুব ভাল লাগলে মা'র জন্যে নিয়ে আসে। তাকে কেউ কিছু বলে না, কারুর গাছের ফল খেতে গেলে সে ভারি খুশি হয়ে ভাল ভাল ফল দেখিয়ে দেয়। তার বুদ্ধি দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়।

এমনি করে দিন যাচ্ছে। বড় রানীদের ছ'টি ছেলেও এখন বড় হয়েছে। তারা বানরটিকে যার-পর-নাই হিংসা করে। সে তাদের সঙ্গে খেলা করতে গেলে তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়।

তারপর একদিন বানরটি দেখল যে, বড় রানীদের ছেলেদের জন্য মাষ্টার এসেছে, তারা পুঁথি নিয়ে তার কাছে বসে পড়ে। তা দেখে বানর গিয়ে তার মাকে বলল, 'মা, আমাকে পুঁথি এনে দাও, আমি পড়ব।'

মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'হায় বাছা, কি করে পড়বে? তুমি যে বানর।'

বানর বলল, 'সত্যি মা, আমি পড়ব; তুমি বই এনে দিয়েই দেখ। তুমি আমাকে পড়াবে।'

বানরের এমনি বুদ্ধি, যে বই পায় সে দুদিনে পড়ে শেষ করে ফেলে। সে দু বছরে মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠল। বড় রানীদের ছেলেরা তখনো দু-তিনখানি বই-পুঁথি শেষ করতে পারেনি; রোজ খালি মাষ্টারের বকুনি খায়।

এ-সব কথা শুনে রাজা একদিন বললেন, 'বটে! বানরের এমনি বুদ্ধি? নিয়ে এসো ত তাকে আমি দেখব।'

বানরের কিছুতেই ভয় নেই; রাজা ডেকেছেন শুনে সে অমনি তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। তাকে দেখে আর তার কথাবার্তা শুনে রাজার এমনি ভাল লাগল যে, তিনি আর কিছুতেই ছোটরানীকে কুঁড়েঘরে ফেলে রাখতে পারলেন না। বাড়িতে আনতেও ভরসা পেলেন না, পাছে বড় রানীরা কিছু বলেন। তাই তিনি ছোটরানীকে রাজবাড়ির পাশেই খুব সুন্দর একটি বাড়ি করে দিলেন। সেই বাড়িতে তখন থেকে ছোটরানী তাঁর বানর পুত্র নিয়ে থাকেন। টাকাকড়ি যত লাগে রাজার লোক এসে দিয়ে যায়। লোকে তাঁর বাড়িটাকে বলে বানরের বাড়ি। এ-সব দেখে বড় রানীদের ছেলেরা বানরকে আরো বেশি হিংসা করতে লাগল।

একটু একটু করে ছেলেরা বড় হয়ে উঠল। সকলে রাজাকে বলল, 'রাজপুত্রেরা বড় হয়েছেন, এখন এঁদের বিয়ে দিন।'

রাজা বললেন, 'তাদের দেশে-বিদেশে ঘুরতে দাও। তারা নানান জায়গা দেখে নানানরকম শিখে, টুকটুকে ছয়টি রাজকন্যা বিয়ে করে আনুক।'

সকলে বলল, 'বেশ বেশ, তাই হোক।'

তারপর ছয় রাজপুত্র সেজেগুজে, টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে দেশ দেখতে বেরুল। তা দেখে বানর তার মাকে গিয়ে বলল, 'মা, আমিও যাব।'

তার মা বললেন, 'তুমি কি করতে যাবে যাদু, তোমাকে কোন্ টুকটুকে রাজকন্যা বিয়ে করবে?'

বানর বলল, 'মা, আমি অনেক দেশ দেখতে পাব।'

মা বললেন, 'তুমি যে দেশ দেখতে যাবে, আমি তোমাকে ছেড়ে কি করে থাকব?'

বানর বলল, 'আমি দেখতে দেখতে ফিরে আসব। তোমার পায়ে পড়ি মা, আমাকে যেতে দাও।'

কাজেই ছোটরানী আর কি করেন, বানরকে যেতে দিতেই হলো।

ছয় রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে, রাজবাড়ি থেকে অনেক দূর চলে এসেছে। একটা বনের ভিতর দিয়ে তাদের পথ, সেই পথে চলতে চলতে তাদের নানারকম কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় বনের ভিতর থেকে বানর বেরিয়ে এসে বলল, 'দাদা, আমিও এসেছি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো।'

তাতে রাজপুত্ররা যার-পর-নাই রেগে বলল, 'বটে রে, তোর এত বড় আস্পর্ধা! আমরা রাজকন্যা বিয়ে করে আনতে যাচ্ছি বলে তুইও তাই করতে যাবি। দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি!' এই বলে তারা বানরকে মারতে মারতে আধমরা করে একটা গাছে বেঁধে রেখে চলে গেল।

সেই বনে ছিল একদল ডাকাত। তারা দেখল যে ছয়জন রাজপুত্র ভারি সাজ করে টাকাকড়ি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। দেখেই ত তারা মার-মার করে চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলল। রাজপুত্রেরা ভয়েই জড়সড়, তলোয়ার খুলবার কথা আর তাদের মনেই নেই। তাদের টাকাকড়ি, ঘোড়া, পোশাক—সবসুদ্ধ তাদের হাত-পা বেঁধে নিয়ে যেতে তাদের দু মিনিটও লাগল না।

রাজপুত্রদের ধরে নিয়ে খানিক দূরে এসেই ডাকাতেরা দেখল পথের ধারে একটা বানর বাঁধা রয়েছে। তাকেও তারা সঙ্গে করে নিয়ে চলল। বানর যেন তাতে বেশ খুশি হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তাদের সঙ্গে যেতে লাগল। তা দেখে ডাকাতেরা ভাবল, বুঝি কারু পোষা বানর, কাজেই তাকে আর তারা তেমন করে বাঁধল না।

সেই বনের ভিতরেই ডাকাতদের ঘর। সেদিন তাদের বড্ড পরিশ্রম হয়েছিল, তাই রাজপুত্রদের নিয়ে সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে এসে বাঁধনসুদ্ধই ছটি ভাইকে একটা জায়গায় ফেলে রেখে তারা খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন খুব করে তাদের নাক ডাকতে লেগেছে, তখন বানর চুপিচুপি তার নিজের

বাঁধন দাঁত দিয়ে কেটে তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজপুত্রদের বাঁধন খুলে দিয়েছে। তখন আর তারা বানরকে ফেলে যাবে কোন্ লাজে? কাজেই তাকেও সঙ্গে করে, জিনিসপত্র নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে অমনি তারা প্রাণপণে ছুট দিল। ডাকাতেরা কিছু টেরও পেল না।

ডাকাতদের ওখান থেকে পালিয়ে রাজপুত্রেরা প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে লাগল, ভোরের আগে আর তারা কোথাও থামল না। সকালে তারা দেখল যে ভারি চমৎকার একটা শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে খুব বড় এক রাজার দেশ; তাঁর বাড়ি দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, যেন একটা ঝকঝকে সাদা পাহাড়।

ছয় রাজপুত্র সেই বাড়ির কাছে গিয়েই টকটক করে ঘোড়া হাঁকিয়ে তার ভিতর ঢুকে পড়ল। দারোয়ানরা তাদের পোশাক আর ঘোড়ার সাজ দেখে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সেলাম করল, আর কিছু বলল না। বানর কিন্তু জানে যে সে সেখানে গেলেই তাকে ধরে ফেলবে; তাই সে রাজবাড়ির পিছনের দিকে গিয়ে, খিড়কির পুকুরের ধারে শুয়ে রইল।

সেই দেশের রাজারও ছিল সাত রানী। তাদের বড় ছ'জন ছিল ভারি হিংসুটে আর দেখতে বিশ্রী, আর ছোটটি ছিলেন পরীর মত সুন্দর আর বড় লক্ষ্মী। বড়রা রাজাকে মিছামিছি নানান কথা বলে ছোটরানীকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি খিড়কির পুকুরের ধারে একটি কুঁড়ের ভিতরে থাকতেন, রাজা তাঁর কোন খবরও নিতেন না। বড় ছয় রানীর ছটি মেয়ে ছিল, তারা দেখতে ছিল ঠিক তাদের মায়ের মতন, আর তাদের মনও ছিল তেমনি; আর ছোটরানীর যে মেয়েটি ছিল, সেও ছিল ঠিক তার মায়ের মত—যেমনি সুন্দর, তেমনি লক্ষ্মী। কিন্তু তা হলে কি হয়, বড় রানীরা রাজাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, ছোটরানীর মেয়েটা পাগল, কালো, কুঁজো, কানা, খোঁড়া, কালা, আর বোবা।

সেই খিড়কির পুকুরের ধারে, ছোটরানীর সেই কুঁড়েঘরের কাছে বানর গিয়ে শুয়ে রয়েছে। খানিক বাদে বড় রানীদের ছয় মেয়ে ছ'টি ঘটি নিয়ে সেখানে স্নান করে চলে আসবার সময় সেই মেয়েদের ঘটি থেকে কেমন করে খানিকটা জল বানরের গায়ে পড়ে গেল। অমনি বড় রানীদের ছয় মেয়ে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ওমা! ওমা! তোমরা দেখ এসে—ছোটরানীর মেয়ে বাঁদরটাকে বিয়ে করেছে!'

বড় রানীরাও তা শুনে ছুটে এসে বলতে লাগল, 'তাই ত, তাই ত! ছোটরানীর মেয়ে বানরটাকে বিয়ে করেছে!'

সেই খবর তখনি তারা রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল। দেশের সকল লোক রাজার সভায় বসে শুনল যে, ছোটরানীর মেয়ের একটা বানরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।

ছোটরানীর মনে যে কি কষ্ট হলো, তা আর কি বলব। তিনি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে, মেয়েটিকে বুকে নিয়ে মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। তা দেখে বানর তাঁদের ঘরের দরজায় এসে বাইরে থেকে হাত জোড় করে বলল, 'মা, আপনি কাঁদবেন না। ভগবান যা করেন ভালই করেন ; এ থেকেও আপনাদের ভাল হতে পারে।' বানরকে মানুষের মত কথা কইতে দেখে রানী উঠে বসলেন। তাঁর মনের দুঃখ যেন কোথায় চলে গেল। সেই থেকে বানর তাঁর ঘরের কাছে গাছের ওপরে থাকে, আর প্রাণপণে তাঁর সেবা করে। রানী যখন শুনলেন যে, সে রাজপুত্র, তখন সে যে বানর, সে কথা তিনি ভুলে গেলেন ; তাঁর মনে হলো যে এমন ভাল আর বুদ্ধিমান লোক আর মানুষের ভিতরে নেই।

এদিকে হয়েছে কি, সেই ছয় রাজপুত্রও রাজার বাড়িতে ঢুকে একেবারে তাঁর সভায় এসে হাজির হয়েছে ; রাজা দেখেই বুঝতে পেরেছেন, এরা রাজপুত্র। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাপু, তোমরা কে ? কি করতে এসেছ ?' তারপর যখন তাদের বাপের নাম শুনলেন, আর শুনলেন যে তারা বিয়ে করবার জন্য রাজকন্যা খুঁজতে বেরিয়েছে তখন ত আর তাঁর খুশির সীমা রইল না। তিনি বললেন, 'বাঃ ! তোমরা যে আমার বন্ধুর ছেলে ! ভালই হলো ; আমার ছয় মেয়েকে তোমরা ছ'জনে বিয়ে করবে।'

ঠিক এমনি সময় বাড়ির ভিতর থেকে খবর এল যে, ছোটরানীর মেয়ের সঙ্গে একটা বাঁদরের বিয়ে হয়েছে। রাজপুত্ররাও তখনি বুঝে নিল যে এ আর কেউ নয়, তাদেরই বাঁদর। তাদের মনে কি যে হিংসা হলো ! বাঁদর এসে তাদের আগেই রাজার মেয়ে বিয়ে করে ফেলল, লোকে আবার কানাকানি করে বললে যে সে মেয়ে নাকি রাজার আর ছয় মেয়ের চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর আর ভাল—এ-সব কথা তারা যত ভাবে ততই খালি হিংসায় জ্বলে মরে।

যা হোক, রাজার ছয় মেয়ের সঙ্গে ত তাদের ছয়জনের বিয়ে হয়ে গেল, তারপর ঝকঝকে ময়ূরপঙ্খী সাজিয়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তারা বউ নিয়ে দেশে চলল। বানরও একটি ছোট নৌকায় তার স্ত্রীকে নিয়ে তাদের পিছু পিছু চলেছে। তাকে দেখেই ছয় রাজপুত্র রেগে ভুত হয়ে গেছে আর ভেবেছে যে একে বউ নিয়ে দেশে পৌঁছতে দেওয়া হবে না। মুখে কিন্তু 'ভাই, ভাই' বলে ভারি আদর দেখাতে লাগল, যেন তাকে কতই ভালবাসে। শেষে যখন বাড়ির কাছে এসেছে, তখন রাত্রে ঘুমের ভিতরে বেচারার হাত পা বেঁধে তাকে জলে ফেলে দিল। ভাগ্যিস ছোট বউ টের পেয়ে তাড়াতাড়ি একটা বালিশ ফেলে দিয়েছিল, আর তাই ধরে অনেক কষ্টে সে কোনমতে ডাঙায় উঠল, নইলে সে যাত্রা বাঁচার উপায়ই ছিল না।

তারপর সকালবেলায় নৌকা এসে ঘাটে লাগল, রাজা খবর পেয়ে ছেলে বউদের আদর করে ঘরে নিতে এলেন। ছয় ছেলে এসে তাঁকে প্রণাম করল,

রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার বানর ছেলে কই ?' তারা বলল, 'সে জলে ডুবে মারা গিয়েছে।'

বানর ত মরে নি, সে নদীর ধারে ধারে তাদের আগেই ঘাটে এসে গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। ওরা 'সে জলে ডুবে মারা গেছে' বলতেই বানর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে প্রণাম করে বলল, 'আমি মরিনি বাবা, ওরা আমার হাত পা বেঁধে আমাকে জলে ফেলে দিয়েছিল, আমি অনেক কষ্টে বেঁচে এসেছি।'

তখন ত রাজপুত্রদের মুখ চুন। রাজা ভয়ানক রেগে তাদের বললেন, 'বটে! তোদের এই কাজ ? দূর হ' তোরা আমার দেশ থেকে ; আর তোদের মুখ দেখব না।'

এই বলে দুষ্ট ছেলেগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজা যার-পর-নাই আদরের সহিত বানর আর ছোট বউকে ঘরে নিয়ে এলেন। বানরের মা ছেলেকে ফিরে পেয়ে আর এমন সুন্দর লক্ষ্মী বউ পেয়ে যে কত সুখী হলেন তা বুঝতেই পার।

তারপর খুব সুখেই দিন কাটতে লাগল। এর মধ্যে হয়েছে কি, বউমা দেখলেন যে বানর শুধু দিনের বেলায়ই বানর সেজে বেড়ায় ; রাত্রে সে বানরের ছাল খুলে দেবতার মত সুন্দর মানুষ হয়। এ কথা তিনি ছোটরানীকে বললেন, ছোটরানী আবার রাজাকে জানালেন। রাজা ত শুনে ভারি আশ্চর্য হয়ে এসে বললেন, 'বউমা, তুমি এক কাজ কর। আজ রাতে যখন সে বানরের ছাল খুলে ঘুমোবে, তখন তুমি সেই ছালটাকে পুড়িয়ে ফেলবে।'

সেদিন বানরের শোবার ঘরের পাশের ঘরে মস্ত আগুন জেবলে রাখা হলো, বানর তা জানতে পেল না। তারপর রাত্রে যেই ছাল খুলে রেখে সে ঘুমিয়েছে অমনি রাজকন্যা চুপিচুপি সেটাকে নিয়ে সেই আগুনে ফেলে দিয়েছেন। সকালে বানর উঠে দেখে তার ছাল নেই। তখন সে ত ধরা পড়ে গিয়ে খুবই ব্যস্ত হলো, কিন্তু ব্যস্ত হলে কি হবে, আর বানর হবার জো নেই। দেখতে দেখতে সেই খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়ল, আর ছেলে-বুড়ো সকলে ছুটে এসে, সব দেখে শুনে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল।

## পাকা ফলার

পাড়াগাঁয়ে এক ফলারে বামুন ছিল। তাহাকে যাহারা নিমন্ত্রণ করিত, তাহারা সকলেই খুব গরিব ; দৈ-চিঁড়ে বেশি কিছু খাইতে দিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না।

ব্রাহ্মণ শুনিয়াছিল দৈ-চিঁড়ের ফলারের চাইতে পাকা ফলারটা ঢের ভাল। সুতরাং এরপর যে ফলারের নিমন্ত্রণ করিতে আসিল, তাহাকে সে বলিল, 'পাকা ফলার খাওয়াতে হবে।' সে বেচারা গরীব লোক, পাকা ফলার সে কোথা হইতে দিবে? তাই সে বিনয় করিয়া বলিল, 'মশাই, পাকা ফলার দেওয়া কি যার-তার কাজ? রাজা-রাজড়া হলে তবে পাকা ফলার দিতে পারে।' এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল, 'তবে, রাজা যেখানে থাকে, সেইখানে গিয়ে আমি পাকা ফলার খাব।'

ব্রাহ্মণ পাকা ফলার খাইবার জন্য রাজার বাড়ি চলিয়াছে। পথে যাহাকে দেখে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁগা, রাজার বাড়িটা কোন্‌খানটায়?'

একজন তাহাকে রাজার বাড়ি দেখাইয়া বলিল, 'ঐ যে পাকা বাড়ি দেখছ, ঐটে রাজার বাড়ি।'

ব্রাহ্মণ 'পাকা ফলার' যেমন খাইয়াছে, 'পাকা বাড়ি'ও তেমনি দেখিয়াছে। সুতরাং, 'পাকা বাড়ি'র কথা শুনিয়া সে ভারি আশ্চর্য হইয়া রাজার বাড়ির দিকে তাকাইল। সে দেশের সব লোকেরই কুঁড়ে ঘর; খালি রাজার একটি সুন্দর পাকা বাড়ি ছিল। রাজার বাড়ি দেখিয়া ব্রাহ্মণের মুখে লাল পড়িতে লাগিল। সে গদগদ স্বরে বলিল, 'পাকা বাড়ি! আহা! পাকা বাড়িই বটে! না হবে কেন? সে যে রাজা, তাই সে অমন বাড়িতে থাকে। ওটা তয়ের করতে না জানি কত ক্ষীর, ছানা আর চিনি লেগেছিল!

এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি গিয়া রাজার বাড়ির একটা কোণ কামড়াইয়া ধরিল; আবার তখনই 'উঃ-হুঃ-হুঃ' করিয়া কামড় ছাড়িয়া দিল।

তারপর সে ভাবিতে লাগিল, 'তাই ত, এই পাকা ফলারের এত নাম!' আর খানিক ভাবিয়া সে বলিল, 'ওঃ হো! বুঝেছি। নারকেলের মতন আর কি! ওটা ওর খোলা; আসল জিনিসটা ভিতরে আছে!' এই বলিয়া সে আগের চাইতে দ্বিগুণ উৎসাহে কামড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার দুইটা দাঁত ভাঙিয়া গেল, তাহাতে গ্রাহ্য নাই। কামড়াইতে কামড়াইতে সে সেই কোণের অনেকখানি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, আর মনে করিতেছে যে, 'আর বেশি দেরি নেই, এরপরই পাকা ফলার আসবে!' এমন সময় কোথা হইতে মস্ত পাগড়িওয়ালা এক দরোয়ান আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। 'আরে ঠাকুর, ক্যা করতে হো? মহারাজকে ইমারত খা ডালতে হো? চলো তুম হমারে সাথ।' এই বলিয়া দরোয়ান তাহাকে রাজার নিকট লইয়া চলিল।

দরোয়ানের কাছে সকল কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'কি ঠাকুর, ওখানে কি করছিলে?' ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, 'মহারাজ! আমি পাকা ফলার খাচ্ছিলুম। খোলাটা ভাঙতে না ভাঙতেই এই বেটা দরোয়ান আমাকে ধরে এনেছে!'

এই কথা শুনিয়া রাজামহাশয় হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন, আর বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, ঠাকুরের পেটে অনেক বুদ্ধি। যাহা হউক, তাহার

সাদাসিধে কথাগুলি রাজার বেশ ভাল লাগিল। সুতরাং তিনি হুকুম দিলেন যে, এই ব্রাহ্মণকে পেট ভরিয়া পাকা ফলার খাইবার মত ময়দা, ঘি আর মিঠাই দাও।

ব্রাহ্মণ মনের সুখে রাজাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে ময়দা, ঘি আর মিঠাই লইয়া ঘরে ফিরিল। আসিবার সময় বলিয়া আসিল যে, পাকা ফলার খাইয়া আবার রাজামশায়কে আশীর্বাদ করিতে আসিবে।

পরদিন সকালে রাজামশায় মুখ হাত ধুইয়া সভায় আসিয়াই সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ঠাকুর, কাল পাকা ফলার খেলে কেমন?' ব্রাহ্মণ বলিল, 'মহারাজ, অতি চমৎকার খেয়েছি! পাকা ফলার কি আর মন্দ হতে পারে? গুঁড়োগুলো আগে গলায় বড্ড আটকাচ্ছিল। জল দিয়ে গুলে নিতে শেষে তরল হলো; কিন্তু অর্ধেক খেতে না খেতেই বমি হয়ে গেল!'

ময়দা আর ঘি দিয়া যে লুচি তৈয়ারী করিতে হয়, ব্রাহ্মণ বেচারা তাহা জানিত না। কাজেই সে ঐ কাঁচা ময়দাগুলিকেই ঘি আর মিঠাই দিয়া মাখিয়া খাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। সহজে তরল হয় না দেখিয়া, আবার তাহার সঙ্গে জল মিশাইয়াছে। খাইতে তাহার খুব ভালই লাগিয়াছিল, তবে পেটে রহিল না, এই যা দুঃখ!

রাজা দেখিলেন, লুচি নিজে তয়ের করিয়া খাইতে হইলে আর ব্রাহ্মণের ভাগ্যে পাকা ফলার ঘটিতেছে না। সুতরাং তিনি তাহার রসুয়ে বামুনদের একজনকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'এখান থেকে ময়দা ঘি নিয়ে, তোমার বাড়িতে লুচি তয়ের করে, এই ঠাকুরকে পেট ভরে পাকা ফলার খাইয়ে দাও।'

রসুয়ে বামুন ফলারে বামুনকে তাহার বাড়ি দেখাইয়া বলিল, 'আমি খাবার তয়ের করে রাখব, বিকালে আপনি এসে খাবেন। আমি বাড়ি থাকব না, আমার ছেলে আপনাকে খেতে দেবেখন।' ব্রাহ্মণ রাজি হইয়া বাড়ি গিয়া বিকাল বেলার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রসুয়ে বামুনের সেই ছেলেটা ভাল লোক ছিল না; একটা চোরের সঙ্গে তাহার বন্ধুতা ছিল। রসুয়ে বামুন ফলারে বামুনের জন্য লুচি, সন্দেশ ইত্যাদি তয়ের করিয়া তাহার ছেলেকে বলিল, 'সেই লোকটি এলে তাকে বেশ করে খাওয়াস।' তাহার ছেলে বলিল, 'তার জন্যে কিছু চিন্তা ক'র না, আমি তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াবখ'ন।' রসুয়ে বামুন রাজবাড়িতে রান্না করিতে চলিয়া গেল। আর তাহার ছেলে ফলারে বামুনের খাবারের আয়োজনে মন দিল। দু সেরের বেশি লুচি আর তাহার মত তরকারি মিঠাই ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। খানচারেক লুচি আর তাহার মত তরকারি ফলারে বামুনের জন্য রাখিয়া, আর সমস্ত সেই হতভাগা তাহার সেই বন্ধু আর নিজের জন্য রাখিয়া দিল। ফলারে বামুন আসিলে পর সে সেই চারখানা লুচি তাহাকে খাইতে দিল। সে বেচারা জন্মেও লুচি খায় নাই, তাহাতে আবার এমন চমৎকার লুচি

—রাজার বামুন ঠাকুর যাহা তয়ের করিয়াছে। এমন জিনিস দু-চারখানি মাত্র খাইয়া তাহার পেট ত ভরিলই না, বরং তাহার ক্ষুধা বাড়িয়া গেল। সে খালি দুঃখ করিতে লাগিল, 'আহা! আর যদি খানকতক দিত!'

রসুয়ে বামুনের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ফলারে বামুন রাস্তা দিয়া চলিল। তাহার মনের দুঃখ রাখিবার আর জায়গা দেখিতেছে না। চলে, আর খালি বলে, 'আহা! আর যদি খানকতক দিত!'

এমন সময় হইয়াছে কি, রাজার প্রধান ভাণ্ডারী সেই রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। সে নিজের হাতে সেদিন সকাল বেলায় ঐ ফলারে বামুনের জন্য পুরো দু সের ময়দা আর তাহার মতন অন্য সব জিনিস মাপিয়া দিয়াছে। ফলারে বামুনের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ঠাকুরমশাই? কি যদি আর খানকতক দিত?' ফলারে বামুন বলিল, 'বাবা, আমি পাকা ফলারের কথা বলছি। রাজামশাই চিরজীবী হউন, আমাকে এমন জিনিস খাইয়েছেন! খালি যদি আর খানকতক হতো!'

ভাণ্ডারী জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাকে ক'খানা দিয়েছিল?' ফলারে বামুন বলিল, 'চারখানি পাকা ফলার আমাকে দিয়েছিল।' ভাণ্ডারী সবই বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'সে কি ঠাকুরমশাই! দু'সের ময়দা দিয়েছি, তাতে কি মোটে চারখানা লুচি হয়?' ব্রাহ্মণ বলিল, 'হাঁ বাপু, চারখানাই ছিল। আর খেতে খুব চমৎকার লেগেছিল।' ভাণ্ডারী বলিল, 'দুসের ময়দায় তার চেয়ে ঢের বেশি লুচি হয়। আমার বোধ হচ্ছে, ঐ রসুয়ে বামুনের ছেলেটা বাকি লুচিগুলো মাচায় তুলে রেখেছে। আপনি আবার যান। এবারে গিয়ে একেবারে মাচায় উঠবেন; দেখবেন আপনার লুচি সেখানে আছে।' ব্রাহ্মণ বলিল, 'তাই নাকি? বাপু তুমি বেঁচে থাকো। হতভাগা, বেল্লিক, বাঁদর, শয়তান, পাজি'—বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ সেই রসুয়ে বামুনের বাড়ির পানে ছুটিল। গালিগুলি অবশ্য সে ভাণ্ডারীকে দেয় নাই—রসুয়ে বামুনের ছেলেকে দিয়াছিল।

রসুয়ে বামুনের ছেলে ফলারে বামুনকে চারখানি লুচি খাওয়াইয়াই তাহার সেই চোর বন্ধুর কাছে গিয়াছিল। সেখানে গিয়া সে চোরকে বলিল, 'বন্ধু, ঢের লুচি তয়ের করে মাচার উপর রেখে এসেছি। তুমি শিগ্‌গির যাও, আমিও এই বাজার থেকে একটা জিনিস নিয়ে এখনি আসছি।'

চোর রসুয়ে বামুনের মাচার উপর উঠিয়া সবে লুচির ঢাকনা খুলিতে যাইবে, এমন সময় ফলারে বামুন আসিয়া উপস্থিত। এবারে কথাবার্তা নাই, একেবারে মাচায় গিয়া উঠিল। চোর মুশকিলে পড়িল। লুকাইবারও স্থান নাই, পলাইবারও পথ নাই। এখন সে যায় কোথায়? শেষটা আর কি করে, মাচার কোণে একটা কাঠের থাম জড়াইয়া কোন রকমে বেমালুম হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। একে সন্ধ্যাকাল, তাহাতে আবার ফলারে বামুন নিতান্তই সাদাসিদা লোক, লুচি খাইবার জন্য তাহার মনটা যার-পর-নাই ব্যস্ত

রহিয়াছে। সুতরাং চোরকে সে দেখিতে পাইল না। ফলারে বামুন সামনে লুচি, সন্দেশ, তরকারি মিঠাই সাজানো দেখিয়াই খাইতে বসিয়া গেল। পেটে যত ধরিল, তত সে খাইল; আর একটি হজমি গুলির স্থানও নাই।

এমন সময়ে ভারি মজা হইল। রসুয়ে বামুনের ছেলেও বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আর ঠিক সেই সময় রসুয়ে বামুনও আসিয়াছে। অন্যদিন সে প্রায় দুপুর রাত্রের পূর্বে ফিরে না, কিন্তু সেদিন সে ভুলিয়া একটা ঝাঁজরা ফেলিয়া গিয়াছিল, সেটার ভারি দরকার। ছেলে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, তুমি এখনি ফিরে এলে যে?' রসুয়ে বামুন বলল, 'ঝাঁজরা ফেলে গিয়েছিলুম, তাই নিতে এসেছি।'

এতক্ষণে ফলারে বামুনের পেট এত বোঝাই হইয়াছে যে, আর একটু হইলেই তাহার দম আটকায়। পিপাসায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেখানে জল নাই। সে 'জল জল' বলিয়া চেঁচাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভাল করিয়া কথা ফুটিল না।

রসুয়ে বামুন তাহার ছেলেকে বলিল, 'ওটা কি রে?' ছেলে দেখিল, ভারি মুশকিল। সে ফলারে বামুনের কথা ত আর জানিত না, কাজেই সে মনে করিয়াছে যে ওটা তাহার বন্ধু, গলায় সন্দেশ আটকাইয়া বিশ্রী স্বরে জল চাহিতেছে। বন্ধুর খবরটা বাপকে দিলে সে আর বন্ধুর হাড় আস্ত রাখিবে না, আর কিছু না বলিলেও হয়ত এখনই মাচায় উঠিয়া দেখিবে। এমন সময় হঠাৎ তাহার বুদ্ধি জোগাইল—সে বলিল, 'বাবা, ওটা নিশ্চয় ভূত। তা নইলে মাচার থেকে অমন বিশ্রী আওয়াজ দেবে কেন।'

ভূতের কথা শুনিয়া বামুন কাঁপিতে লাগিল। আরো মুশকিলের কথা এই যে, ভূতটা জল চাহিতেছে। তাহার কাছে জল লইয়া যাইতে কিছুতেই ভরসা হইতেছে না, অথচ জল না পাইলে সে নিশ্চয় ভয়ানক চটিয়া যাইবে। তারপর সে কি করে তাহার ঠিক কি? ছেলের ভারি ইচ্ছা, সে ভূতকে জল দিয়া আসে। কিন্তু রসুয়ে বামুন বলিল, 'তা হবে না, যদি তোর ঘাড় ভেঙে দেয়।' এই সময়ে তাহার মনে হইল যে, মাচার উপর কয়েকটা নারকেল ছাড়ানো আছে, সুতরাং সে ভূতকে বলিল, 'মাচায় নারকেল আছে, থামে আছড়ে ভেঙে খাও।'

ফলারে বামুনের হাতের কাছেই নারকেলগুলি ছিল। সে তাহার একটা হাতে লইয়া থামে আছড়াইয়া ভাঙিতে গেল। যে থাম জড়াইয়া চোর দাঁড়াইয়া ছিল, ব্রাহ্মণ পিপাসার চোটে থাম মনে করিয়া সেই চোরের মাথাতেই নারকেল আছড়াইয়া বসিয়াছে—একেবারে মাথা ফাটাইয়া ফেলিবার জোগাড় আর কি!

এরপর একটা মস্ত গোলমাল হইল। নারকেলের বাড়ি খাইয়া চোর ভয়ানক চেঁচাইয়া উঠিল; আর তাহাতে ভয়ানক চমকাইয়া গিয়া ব্রাহ্মণও হাঁউমাঁউ করিতে লাগিল। গোলমাল শুনিয়া পাড়ার সমস্ত লোক সেখানে আসিয়া

জড়ো হইল। আসল কথাটা জানিতে এরপর আর বেশি দেরী হইল না। চোর ধরা পড়িল, আর রসুয়ে বামুন তাহার ছেলেকে সেই ঝাঁজরা দিয়া এমনি ঠেঙান ঠেঙাইল যে কি বলিব।

## দুঃখীরাম

দুঃখীরাম খুব গরীবের ছেলে ছিল। সকলে তাহাকে দুঃখীরাম বলিয়া ডাকিত, কিন্তু তাহার এর চাইতে ঢের ভাল একটা নাম ছিল, সেটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

দুঃখীরামের যখন সবে দুই বছর বয়স, তখন তাহার মা-বাপ মরিয়া গেল। পৃথিবীতে তাহার আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না, খালি ছিল মামা কেষ্ট। দু'বছরের ছেলে দুঃখীরাম তাহার মামার খবর কিছুই জানিত না, তাহার মামাও তাহার কোন খবরই লইত না। কাজেই পাড়ার লোকেরা দয়া করিয়া তাহাকে মানুষ করিতে লাগিল। তখন হইতেই লোকে তাহাকে দুঃখীরাম বলিয়া ডাকিত।

গরীবের ছেলের দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়াই অনেক সময় মুশকিল হয়, এর উপর আবার কে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবে। অন্য ছেলেদের ফেলিয়া দেওয়া ছেঁড়া বই পড়িয়া আর পাড়ার লোকের খুঁটিনাটি কাজ করিয়া তাহার দিন যাইতে লাগিল। ইহার মধ্যে একদিন দুঃখীরাম শুনিল যে কেষ্ট বলিয়া তাহার এক মামা আছে। শুনিয়াই সে মনে করিল যে, একবার মামার বাড়ি যাইতে হইবে।

অনেক সন্ধান করিয়া শেষে সে কেষ্টর বাড়ি বাহির করিল। কেষ্ট তাহাকে দেখিয়াই বলিল, 'তাই ত, দুঃখীরাম এসেছ! এখানে কত কষ্ট পাবে তা ত জান না! আমরা যে দু মাসে একদিন খাই! কাল খেয়েছি, আবার দু মাস পরে খাব।'

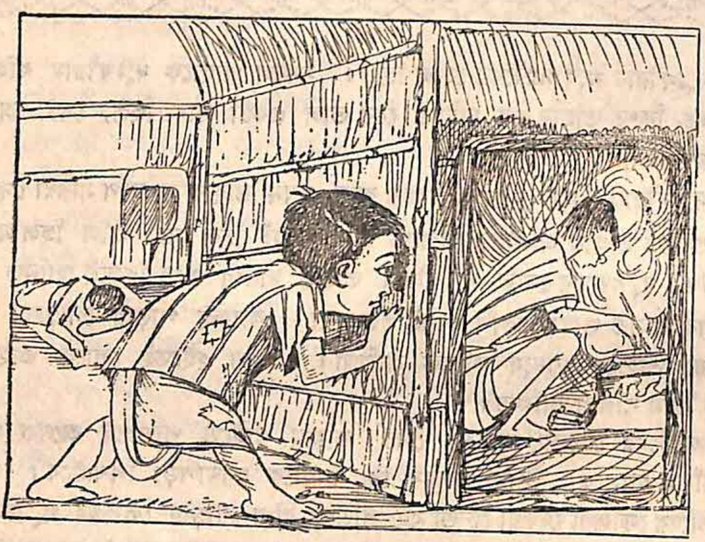
দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, তার জন্য ভাবনা কি। তোমরা যখন খাবে, আমিও তখনই খাব।' কেষ্ট আর কিছু বলিল না, দুঃখীরামও আর কিছু বলিল না। মামার বাড়িতে খালি মামা আর মামাত ভাই হরি ছাড়া আর কেহ নাই। মামাত ভাইকে সে দাদা বলিয়া ডাকিত লাগিল।

সারাদিন কেষ্ট আর হরি কেহই কিছু খাইল না। কাজেই দুঃখীরামেরও খাওয়া জুটিল না। দুঃখীরাম এর চাইতে অনেক বেশি সময় না খাইয়া কাটাইয়াছে, সুতরাং তাহার বড় একটা ক্লেশ হইল না। সন্ধ্যার সময় সে

কেষ্টকে বলিল, 'মামা, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমোই।' ইহাতে কেষ্ট যেন ভারি খুশি হইল আর তখনই তাহাকে একটা মাদুর বিছাইয়া দিল। দুঃখীরাম সেই মাদুরে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খানিক পরে কেষ্ট আর হরি আসিয়া তাহার পাশেই ঘুমাইতে লাগিল। আসল কথা, কেহই ঘুমায় নাই—মামা খালি ভাবিতেছে, কতক্ষণে দুঃখীরাম ঘুমাইবে, আর দুঃখীরাম ভাবিতেছে, এরপর মামা কি করে।

দেখিতে দেখিতে হরির নাক ডাকিল। দুঃখীরাম বুঝিল দাদা ঘুমাইয়াছে।



একটু পরে দুঃখীরাম পাশে একটা খচমচ শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিল যে, এবারে মামা উঠিয়াছে। তারপর হেঁশেলে হাঁড়ি নাড়ার শব্দ হইল। তারপর হাঁড়ি ধুইবার খলখল শব্দ, উনান ধরাইবার ফুঁ সকলই শুনা গেল। দুখীরামের আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন সে চুপিচুপি উঠিয়া রান্নাঘরের বেড়ার ফুটা দিয়া দেখিল, কেষ্ট পায়স রাঁধিতেছে।

দুঃখীরাম এক-একবার উঠিয়া দেখে, আবার আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। যখন দেখিল যে, পায়স প্রস্তুত হইয়াছে, তখন হাউমাউ করিয়া উঠিয়া বসিল। গোলমাল শুনিয়া কেষ্ট তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কি রে দুঃখীরাম, কি হইয়াছে?'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, ও ঘরে তুমি কি করছিলে, আর একজন লোক বেড়ার ফুটো দিয়ে উঁকি মারছিল।' দুঃখীরাম নিজের কথাই বলিয়াছে, কিন্তু কেষ্ট মনে করিল বুঝি চোর আসিয়াছে। তাই লাঠি হাতে ঘরের পেছনে বনের ভিতরে চোর তাড়াইতে ছুটিল।

তখন দুঃখীরাম তাহার দাদাকে ঠেলিয়া তুলিয়া বলিল, 'দাদা শিগ্‌গির ওঠ, মামা একটা লাঠি হাতে তাড়াতাড়ি কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন।'

হরি বেচারার মনে ভারি ভয় হইল। সে মনে করিল যে লাঠি হাতে যখন গিয়াছে তখন নিশ্চয়ই একটু দূরে কোথাও গিয়াছে। তিন মাইল দূরে হরির ভগ্নীর বাড়ি, হয়ত হঠাৎ তাহার কোন ব্যারাম হইয়াছে, আর বাবা খবর পাইয়া তাহাকে দেখিতে গিয়াছে। এইরূপ ভাবিয়া হরি ব্যস্ত হইয়া তাহার ভগ্নীর বাড়ি চলিল। খানিক পরে কেষ্ট ফিরিয়া আসিল। সে চোরকে ধরিতে পারেই নাই, লাভের মধ্যে বিছুটি লাগিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে। সে আসিয়া হরিকে দেখিতে না পাইয়া দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হরি কোথায় রে?'

দুঃখীরাম বলিল, 'মামা, তুমিও গেলে আর যে লোকটা তোমার ঘরে উঁকি মারছিল, সেই লোকটা দাদাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তার সঙ্গে কথা কইল, আর দাদাও তখ্‌খুনি বেরিয়ে গেল।'

ইহা শুনিয়া কেষ্ট মনে করিল যে হরি নিশ্চয় পাড়ায় দুষ্ট ছেলের সঙ্গে জুটিয়া তাস খেলিতে গিয়াছে। সুতরাং হরি এবং সেই পাড়ার দুষ্ট ছেলেটার উপর তাহার ভয়ানক রাগ হইল, সেই লাঠি হাতে করিয়াই সে তাহার সঙ্গীকে শাস্তি দিবার জন্য পাড়া খুঁজিতে বাহির হইল।

দুঃখীরাম যখন দেখিল যে, ওর মামা আর দাদার বাড়ি ফিরিতে একটু বিলম্ব হইবে, তখন সে আস্তে আস্তে রান্নাঘরে গিয়া পায়সের হাঁড়ি নামাইল। একে দুঃখীরামের বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছিল, তাহার উপর আবার তাহার মামা রাঁধে বড় সরেস। সুতরাং দেখিতে দেখিতে সেই পায়সের হাঁড়ি খালি হইয়া গেল। তারপর দুঃখীরাম আবার সেই মাদুরে শুইয়া আরামে নিদ্রা গেল।

হরি ভগ্নীর বাড়িতে গিয়া তাহাকে ভালই দেখিতে পাইল। কিন্তু সে রাত্রে তাহার বোন আর তাহাকে বাড়ি ফিরিয়া আসিতে দিল না। এদিকে কেষ্ট তাহাকে আকাশ-পাতাল করিয়া খুঁজিয়াছে কিন্তু তাহাকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া রাগে আর বিছুটির জ্বালায় ছটফট করিতেছে। সুতরাং ভোরবেলা হরি যেই বাড়ি ফিরিয়া আসিল, অমনি কেষ্ট সেই লাঠি দিয়া তাহাকে খুব কয়েক ঘা লাগাইল।

এইরূপে সমস্ত রাত্রি নাকাল হইয়া, শেষে রান্নাঘরে গিয়া সে দেখে—পায়সের হাঁড়ি খালি! তখন আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। দুঃখীরাম সকালে উঠিয়া অবধি কেমন আড়চোখে চায়, আর একটু হাসে। সুতরাং তাহা যে দুঃখীরামেরই কাজ, ইহা বেশ বুঝা গেল।

পরদিন বাপ-বেটায় মিলিয়া রাজার নিকট নালিশ করিতে গেল। রাজা দুঃখীরামকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে, তুই এমন কাজ কেন করলি?

ওদের পায়স চুরি করে কেন খেলি ? আর মিছে কথা বলে কেন ওদের নাকাল করলি ?'

দুঃখীরাম হাত জোড় করিয়া বলিল, 'দোহাই ধর্মাবতার ! ওঁরা দুমাসে একদিন খান। পরশু খেয়েছিলেন, আবার কাল পায়স রাঁধলেন কেন ? ওঁরাই বলুন। তারপর নাকাল করার কথা বলছেন ? তা আমি ত সত্যি কথাই বলেছি তাতে যদি ওঁরা খামকা নাকাল হতে যান, তা আমার কি দোষ।'

রাজা আগাগোড়া সমস্ত শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গেল।

দুঃখীরামকে বেশ চালাক-চতুর দেখিয়া রাজা তাহাকে একটি চাকরি দিলেন। দুঃখীরাম এত ভাল করিয়া কাজ করিতে লাগিল যে, কয়েক বৎসরের ভিতরেই সেই সামান্য চাকরি হইতে ক্রমে সে ছোট মন্ত্রীর পদে উঠিল। বড় মন্ত্রীর পদ খালি হইলে যে তাহাও সে পাইবে, এ কথা সকলেই বলিতে লাগিলেন।

বড় মন্ত্রী লোকটি বড় সুবিধার ছিলেন না। দুঃখীরামকে তিনি ভারি হিংসা করিতেন, আর কি করিয়া তাহাকে জব্দ করিবেন ক্রমাগত তাহাই ভাবিতেন।

এক সওদাগরের সঙ্গে বড় মন্ত্রীর বন্ধুতা ছিল। সেই সওদাগরের একটি পক্ষিরাজ ঘোড়া ছিল। পক্ষিরাজ ঘোড়া মানুষের মত কথা কহিতে পারে, শূন্যে উঠিয়া এক মাসের পথ এক মিনিটে যাইতে পারে, আর ভূত ভবিষ্যৎ সব বলিয়া দিতে পারে। এই ঘোড়াটাকে পাইবার জন্য মন্ত্রীমহাশয় অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সওদাগর কিছুতেই সেটা তাঁহাকে দিতে চায় না।

এর মধ্যে সওদাগর একবার বিদেশে গিয়াছিল, সেখান হইতে একটা খুব আশ্চর্য আমের আঁটি লইয়া আসিয়াছে। সে আঁটির এই গুণ যে, তাহা পুঁতিবামাত্র গাছ হয়, তাতে তৎক্ষণাৎ আম হয়, তখনই সেটা পাকে, আর তখনই তাহা খাওয়া যায়। খাওয়ার পর আবার সেই আঁটি মাটির ভিতর হইতে তুলিয়া বাক্সে পুরিয়া রাখা যায়।

মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের চাকরকে টাকা দিয়া বশ করিলেন। সে তাঁহার কথায় সওদাগরের আমের আঁটি সিদ্ধ করিয়া রাখিল। তারপর একদিন মন্ত্রী-মহাশয় সওদাগরের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বন্ধু, তুমি নাকি ভারি আশ্চর্য একটা আমের আঁটি আনিয়াছ ?' সওদাগর বলিল, 'হ্যাঁ বন্ধু, সেটাকে পুঁতিলে তখনই গাছ হয়, তখনই তাতে ফল হয়, তখনই তাহা পাকে, আর তখনই তাহা খাইয়া আঁটিটি আবার বাক্সে রাখিয়া দেওয়া যায়।'

মন্ত্রীমহাশয় নাক মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, 'ও কথা আমার বিশ্বাস হয় না।'

সওদাগর বলিল, আচ্ছা, বাজি রাখুন। আমার কথা সত্য হয় ত কি হইবে ?' মন্ত্রী বলিলেন, 'তাহা হইলে পরদিন আমার বাড়িতে গিয়া প্রথমে যে

জিনিসটিতে হাত দিবে সেইটা তোমার, আর যদি তোমার কথা সত্য না হয় ?' সওদাগর বলিল, 'তবে আপনি পরদিন আমার বাড়িতে আসিয়া প্রথমে যাহাতে হাত দিবেন তাহাই আপনার হইবে।'

ঠিক হইল, পরদিন সওদাগরের বাড়িতে মন্ত্রীমহাশয়ের নিমন্ত্রণ, আর তখন আমের আঁটির পরীক্ষা হইবে। আঁটি সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং পরীক্ষার ফল কি হইল তা বলিয়া দিতে হইবে না। সওদাগর বেচারার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এবারে সে বুঝিতে পারিল যে, আর পক্ষিরাজ ঘোড়াকে রাখিতে পারিবে না।

অনেক ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া শেষে সওদাগর ছোট মন্ত্রীর কাছে গেল। সেখানে হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা নিবেদন করিল। বুদ্ধিমান ছোট মন্ত্রী একটু চিন্তা করিয়া তাহাকে একটি উপায় বলিয়া দিলেন। সওদাগর সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরিয়া পক্ষিরাজ ঘোড়ার আস্তাবলের দরজা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া নিদ্রা গেল।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই মন্ত্রীমহাশয় সওদাগরের বাড়ি গিয়া ডাকিতে লাগিলেন, 'বন্ধু! বন্ধু!' সওদাগর শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। মন্ত্রীমহাশয়ের একটু বসিবার দেরি সয় না। তিনি না বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কই বন্ধু, সে কথার কি হইল ?' সওদাগর বলিল, 'আমি প্রস্তুত আছি, এখন আপনার যাহাতে খুশি হাত দিয়া লইয়া যাইতে পারেন।' মন্ত্রীমহাশয় অমনি আস্তাবলের দিকে চলিলেন ; সওদাগরও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

আস্তাবলের দরজা বাঁধা ছিল। মন্ত্রীমহাশয় দড়ি ধরিয়া একটান দিয়া বাঁধন খুলিয়া ফেলিলেন। অমনি সওদাগর বলিল, 'সে কি বন্ধু! আপনার মতন লোকের ঐ সামান্য দড়িগাছটায় লোভ! একটা দামী কোন জিনিস লইলে সুখী হইতাম।' মন্ত্রীর ত চক্ষুস্থির! অত সহজে ঠকিবেন, তাহা তিনি মনে করিতে পারেন নাই। সওদাগরের কথার উত্তর দিতে না পারিয়া আমতা আমতা করিয়া ঘরে ফিরিলেন।

পথে যাইতে যাইতে মন্ত্রীমহাশয় স্থির করিলেন যে, ছোট মন্ত্রী ছাড়া এ আর কাহারো কর্ম নয়, তারপর যখন শুনিলেন যে, সেদিন রাত্রে সওদাগর ছোট মন্ত্রীর বাড়ি গিয়াছিল তখন বুঝিলেন, নিশ্চয় ইহা ছোট মন্ত্রীর কাজ।

পরদিন দুপুরবেলা যখন রাজা ঘুমাইতেছিলেন, তখন মন্ত্রীমহাশয় গিয়া জোড়হাতে তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে রাজা চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বড় মন্ত্রী ?' মন্ত্রী বলিলেন, 'দোহাই মহারাজ! সুলক্ষণ সওদাগরের একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া আছে, কিন্তু মহারাজের আস্তাবলে একটাও পক্ষিরাজ ঘোড়া নাই।' রাজা বলিলেন, 'বটে! ও ঘোড়া আমার চাই।' মন্ত্রী আরো বিনয় করিয়া কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিলেন,

'মহারাজের যাহাতে ভাল হয় আমার সেই চেষ্টা, আর ছোট মন্ত্রী দিনরাত তাহাতে বাধা দেন।' রাজা বলিলেন, 'সে কি রকম?' মন্ত্রী বলিলেন, 'মহারাজের জন্য সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া আনিতে গিয়াছিলাম কিন্তু ছোট মন্ত্রী সুলক্ষণকে মন্ত্রণা দিয়া সে ঘোড়া আনিতে দেয় নাই।'

রাজদের মেজাজ সেকালে বড়ই অস্থির ছিল। সহজেই সন্তুষ্ট হইতেন, আর সামান্য কথাতেই চটিয়া উঠিতেন। বকশিশ দিতেন ত অর্ধেক রাজ্যই দিয়া ফেলিতেন, আর সাজা দিতেন ত মাথাটাই কাটিয়া ফেলিতেন। রাজা ছোট মন্ত্রীর উপর এতদিন সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই তাহাকে ছোট মন্ত্রী করিয়াছিলেন আজ বড় মন্ত্রীর কথা শুনিয়া এতই চটিয়া গেলেন যে, তখনই তাহাকে হাত-পা বাঁধিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। বেচারা কোন বিপদের কথা জানিত না, সুখে ঘুমাইতেছিল, এমন সময় রাজার লোক আসিয়া তাহার হাত-পা বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

দুঃখীরামের এই সাজার হুকুম হইল যে, তাহাকে থলের ভিতর পুরিয়া পাথর বাঁধিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। রাজামহাশয়ের সামনেই থলে আর পাথর আনিয়া সব বাঁধিয়া ঠিক করা হইল, তারপর রাজা চারিটা জল্লাদকে হুকুম দিলেন, 'একে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়।'

দুঃখীরামকে সকলেই ভালবাসিত। সুতরাং তাহার এই সাজার কথা শুনিয়া সকলেরই ভারি ক্লেশ হইল। পথে যাইতে যাইতে জল্লাদেরা চুপিচুপি পরামর্শ করিল যে, এমন ভাল লোককে কখনই সমুদ্রে ফেলিয়া মারা হইবে না। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা সমুদ্রের ধারে একটা বনের ভিতরে দুঃখীরামকে রাখিয়া থলের মুখ খুলিয়া দিয়া আসিল। আসিবার সময় তাহাকে একখানি কুড়াল আর এক টুকরা নেকড়া দিয়া বলিয়া আসিল, 'ছোট মন্ত্রীমশাই, আমরা আর তোমাকে কি দিতে পারি, এই নেকড়া ও কুড়াল নাও, কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে খেও। তোমার দোহাই ছোট মন্ত্রীমশাই, আমাদের রাজার দেশে যেও না। সেখানে তোমাকে দেখতে পেলে রাজা তোমাকে আস্ত রাখবে না, আমাদেরও আস্ত রাখবে না।'

দুঃখীরাম এখন কাঠুরে হইয়াছে, লম্বা লম্বা চুল দাড়ি গোঁফ রাখিয়াছে আর নিজের পোশাকটা ফেলিয়া দিয়া সেই জল্লাদের দেওয়া নেকড়াখানা পরে। ভাল করিয়া স্নান না করাতে তাহার গায়ের রং ময়লা হইয়া গিয়াছে। পেট ভরিয়া খাইতে না পাওয়াতে ঢের রোগা হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাকে দেখিলে আর চট করিয়া চেনা যায় না। এইরূপ অবস্থায় কষ্টে দুঃখীরামের দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন কাঠ কাটিতে বাহির হইয়া দুঃখীরাম দেখিল যে, ঝরণার ধারে গাছতলায় এক বুড়ি ঘুমাইতেছে। সে এতই বুড়া হইয়াছে যে, তেমন বুড়ামানুষ আর দুঃখীরাম কখনো দেখে নাই। বুড়িকে দেখিয়া সে চলিয়া যাইতেছে,

এমন সময় দেখিল যে, একটা বিষাক্ত সাপ চুপিচুপি সেই বুড়ির দিকে যাইতেছে। দুঃখীরাম তখনই কুড়াল দিয়া সাপটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল আর সেই টুকরাগুলি ঝরণার জলে ফেলিয়া দিল। কি আশ্চর্য! সেই টুকরাগুলি জলে পড়িবামাত্র জলটা টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার শব্দ শুনিয়া বুড়ি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল।

বুড়ি খানিক অবাক হইয়া ঝরণার দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর দুঃখীরামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে বাবা?' দুঃখীরাম বলিল, 'আমি দুঃখীরাম।' বুড়ি বলিল, 'বাবা তুমি কি চাও?' দুঃখীরাম বলিল, 'আমি কিছু চাই না। তুমি বুড়োমানুষ বনের ভিতর কেন আসিয়াছ? কত জন্তু-টন্তু আছে, শীঘ্র চলিয়া যাও।' বুড়ি বলিল, 'বাপু, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছ, আমি তোমাকে কিছু না দিয়া অমনি যাইতে পারিতেছি না।' দুঃখীরাম কিন্তু কিছুই লইবে না, সুতরাং বুড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় চুপিচুপি বলিয়া গেল, 'তুমি কিছু লইলে না—আচ্ছা, আমি তোমাকে এক বর দিয়া যাইতেছি যে, তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহাই হইবে।' দুঃখীরাম ততক্ষণে কুড়াল হাতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং এ-সকল কথা সে শুনিতে পাইল না।

আজ দুঃখীরামের ঢের বেলা হইয়া গিয়াছে। কখন কাঠ কাটা হইবে, সেই কাঠ বাজারে বিক্রি হইবে, তবে তাহার পেটে দুটি ভাত পড়িবে। এ-সকল কথা ভাবিয়া বেচারীর মনটা একটু দুঃখিত ছিল, তাই তত সাবধান হইয়া পথ চলিতে পারিতেছে না। সামনে একটা ছোট গাছ পড়িয়া ছিল তাহাতে হোঁচট খাইয়া দুঃখীরাম পড়িয়া গেল। একে মন ভাল নাই, তাহার উপর এরূপ দুর্ঘটনা হইলে কাহার না রাগ হয়? দুঃখীরাম রাগিয়া বলিল, 'দূর হ ছাই। এ গাছপালা না থাকিলেই ভাল ছিল!'

যেই এ কথা বলা, আর অমনি সেখানকার যত গাছপালা সব কোথায় চলিয়া গেল। যেখানে ভয়ানক বন ছিল, সেখানে খালি মাঠ ধূধূ করিতে লাগিল। কি সর্বনাশ! এখন কাঠই বা কোথা হইতে মিলে, আর দুঃখীরামের খাওয়াই বা কি করিয়া হয়? বেচারা ব্যাপার দেখিয়া একেবারেই অবাক! ইহার কারণ কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া আপনমনে খালি হাঁটিয়া চলিল। বেলা ঢের হইয়াছে, ক্ষুধা আরো বেশি হইয়াছে, এমন অবস্থায় শুধু পথ চলিতেই কত কষ্ট, তাহাতে আবার হাতে প্রকাণ্ড কুড়াল; সে যে-সে কুড়াল নয়, জল্লাদের কুড়াল। সাধারণ কুড়ালের দুখানার সমান তাহার একখানা ভারি হয়। সেদিন দুঃখীরামের কাছে সেটা যেন দশটা কুড়ালের মত ভারি ঠেকিতে লাগিল, আর সেটাকে বহিয়া নিতে ইচ্ছা হয় না। সুতরাং দুঃখীরাম সেটাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, 'আমি আর পারি না, অত ভারি কুড়ালের হাত পা থাকা উচিত, তাহা হইলে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারে।'

কুড়াল তাহাই করিল। কোথা হইতে মাকড়সার পায়ের মতন তাহার সব পা হইল ; আর সে টুকটাক করিয়া দুঃখীরামের পিছু পিছু চলিল। দেখিয়া শুনিয়া বেচারার মাথায় আরো গোল লাগিয়া গেল। সে একভাবেই চলিয়া যাইতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল, হইল কি !

যাইতে যাইতে দুঃখীরাম একেবারে নিজের দেশের বাজারে গিয়া উপস্থিত ! প্রভুভক্ত কুড়াল সঙ্গেই আছে ; সে এমনিভাবে চলিয়াছে, যেন চিরকাল তাহার ঐ রকম করিয়াই চলা অভ্যাস।

একটা কুড়াল যদি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তোমার সামনে দিয়া চলিয়া যায়, তুমি তাহা হইলে কি কর ? আর তেমন একটা কুড়াল যদি বাজারে গিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বাজারের লোকগুলিই বা কি করে ? বাজারে প্রথম মোড়েই এক গোয়ালার দোকান। সেখানে এক বড়লোকের দরোয়ান ঘি কিনিতে আসিয়াছে। গোয়ালার হাতে ঘিয়ের বাটি দিয়া সবে সে পৈঠায় বসিয়া তামাক খাইবার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখে, দুঃখীরামের সেই কুড়াল হাত-পাসুদ্ধ একেবারে তাহার সামনে উপস্থিত ! 'হায় বাপ !' বলিয়া চারি হাত-পা ঊর্ধ্বে উঠাইয়া দরোয়ানজী আপনিই এক লাফে একেবারে গোয়ালার ঘাড়ে গিয়া উঠিল। গোয়ালাও তাড়াতাড়ি দরোয়ানজীকে ঠেলিয়া মাখনের হাঁড়িতে ফেলিয়া, ঘরে দরজা আঁটিল। তারপর যখন দেখিল যে, সেটা কাহাকেও কিছু বলে না, তখন দরজা খুলিয়া দুজনেই তাহার পিছু পিছু তামাশা দেখিতে চলিল।

সেদিন বাজারে কেনাবেচা বন্ধ। বাবুদের চাকর যাহারা বাজার করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই কুড়ালের পিছু পিছু চলিয়াছে, তাহাদের বাজার করা আর হয় নাই। দোকানীরাও তাহাই করিতেছে—পুলিস-পাহারা সকলেই সেই কুড়ালের পিছু চলিয়াছে। চাকরদের সন্ধান লইতে বাবুরা আসিয়াছিলেন, তাহারাও সেই কুড়ালের তামাশা দেখিতেই রহিয়া গেলেন। এইরূপ করিয়া দেশের প্রায় সকল লোক সেইখানে আসিয়া জড়ো হইল। দুঃখীরামের সেই মামা আর মামাত ভাই কেষ্ট আর হরিও তাহাদের ভিতরে ছিল।

কেষ্ট আর হরি প্রথমে কুড়ালের তামাশা দেখিতেই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু তারপর একবার যেই দুঃখীরামের মুখের উপর চোখ পড়িল, অমনি তাহাদের বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। ভাল করিয়া দেখিয়া তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল যে, এ দুঃখীরাম। সুতরাং তাহারা তাড়াতাড়ি মন্ত্রীর নিকট গিয়া খবর দিল, 'মন্ত্রীমহাশয়, সেই দুখেটা আসিয়াছে।' মন্ত্রী অবিলম্বে এই সংবাদ রাজাকে দিলেন আর বলিলেন, 'মহারাজ, কুড়াল কি কখনো হাঁটে ? এ নিশ্চয় কোন জাদু-টাদু শিখিয়া বদ মতলবে এখানে আসিয়াছে।' রাজা শুনিয়া বলিলেন, 'ঠিক বলিয়াছ মন্ত্রী, এখনি দশজন সিপাহী পাঠাইয়া দাও,

উহাকে বাঁধিয়া নিয়া আসুক।' রাজার হুকুমে দানবের মত দশটা পালোয়ান দুঃখীরামকে আনিতে চলিল।

এদিকে বাজারের লোকেরা দুঃখীরামকে তত গ্রাহ্য করে নাই, কিন্তু তাহার কুড়ালটাকে রাজার কাছে লইয়া যাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে কুড়ালের গায়ে কি ভয়ানক জোর! তাহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া বাজারের সমস্ত লোক মিলিয়া কত টানিল, কিছুতেই তাহাকে এক পা-ও নাড়িতে পারিল না; বরং তাহারা যে দশ মিনিট ধরিয়া প্রাণপণে 'হিঁয়ো' করিয়াছে, ততক্ষণে দুঃখীরামের কুড়ালই তাহাদিগকে আধ মাইল খানেক টানিয়া লইয়াছে।

এমন সময় রাজার পালোয়ানেরা আসিয়া দুঃখীরামকে বাঁধিতে লাগিল। দুঃখীরামের কাছে আজ আর কিছুই আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয় না। সে কেবল দেখিতেছে, এরপর কি হয়। স্বয়ং বড় মন্ত্রী পালোয়ানদের সঙ্গে আসিয়াছেন, আর বলিতেছেন, 'শক্ত করিয়া বাঁধ।' এ কথা শুনিয়া দুঃখীরাম নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, 'অন্যের বেলা বলা খুব সহজ; তোমাকে একবার ওরকম করিয়া বাঁধিত, তবে দেখিতে কেমন লাগে।'

অমনি চারটি পালোয়ান মন্ত্রীমশায়কে চিত করিয়া ফেলিয়া ঠিক দুঃখী-রামের মতন করিয়া বাঁধিতে লাগিল। মন্ত্রীমহাশয় প্রথমে আশ্চর্য বোধ করিলেন, তারপর চটিয়া লাল হইলেন; কিন্তু পালোয়ানেরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না। রাগে মন্ত্রীমহাশয়ের কথা বাহির হইতেছে না, চোখ দুটো ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, গলার শির ফুলিয়াছে, মুখে ফেনা উঠিতেছে। কিন্তু পালোয়ানেরা তথাপি তাঁহাকে বাঁধিতে কসুর করিতেছে না। বেশ করিয়া বাঁধিয়া তারপর পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ঠিক দুঃখীরামের মতন বাঁধা হইয়াছে কি না। যখন দেখিল যে দুজনকেই ঠিক একরকম করিয়া বাঁধা হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগকে কাঁধে করিয়া রাজার নিকট লইয়া চলিল। বাজারের লোকেরা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এই-সকল লোক যখন রাজার কাছে উপস্থিত হইল, তখন রাজামহাশয়ের ভারি রাগ হইল এমনও নহে। মন্ত্রীর বাঁধন তিনি নিজ হাতে খুলিয়া দিলেন, তারপর তাঁহাকে লইয়া দুঃখীরামের বিচার করিতে বসিলেন। যে-সকল পালোয়ান মন্ত্রীমহাশয়কে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, প্রথমে তাহাদের ফাঁসির হুকুম হইল। দুঃখীরামের সম্বন্ধে একটা হুকুম দিবার পূর্বেই আহারের সময় হওয়াতে মাঝখানে রাজামহাশয় উঠিয়া গেলেন, খাওয়া-দাওয়ার পর দুঃখীরামের হুকুম হইবে।

দুঃখীরাম বেচারা সেই বাঁধা অবস্থাতেই পড়িয়া আছে। তাহার চারধারে বিস্তর প্রহরী আছে, দর্শকদিগেরও অধিকাংশই রহিয়া গিয়াছে। দুঃখীরামের দুঃখের কথা আর কি বলিব। অন্য কষ্টের বিষয় আর এখন ততটা ভাবে না; কিন্তু ক্ষুধা ত কিছুতেই থামিয়া থাকিবার নহে। রাজামহাশয়, মন্ত্রীমহাশয়

সকলেই আহার করিতে গিয়াছেন। কত সুখাদ্য জিনিস খাইয়া তাঁহারা পেট ভরিয়া আসিবেন। দুঃখীরাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'আহা, ও-সব জিনিস যদি আমাকে কেহ এখন আনিয়া দিত!'

রাজামহাশয় আহারে বসিয়াছেন, সোনার পাত্রে শত ব্যঞ্জন সাজাইয়া তাঁহার সামনে রাখিয়াছে, তাহার সুগন্ধ নাকে গেলে লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস টানিতে ইচ্ছা হয়, জিভে জল আসে। হাত ধুইয়া সবে রাজামহাশয় খাইবার উপক্রম করিয়াছেন, অমনি থালাসুদ্ধ খাবার জিনিস কোথায় মিলাইয়া গেল! মন্ত্রী মহাশয়েরও ঐরূপ দশা হইল।

এদিকে দুঃখীরামের আক্ষেপ শেষ হইতে না হইতেই তাহার সামনে রাজা ও মন্ত্রীর আহারের সমস্ত আয়োজন আসিয়া হাজির হইল। দুঃখীরাম তাহাতে কিছুই আশ্চর্য বোধ করিল না; তাহার খালি দুঃখ হইতে লাগিল 'হায় রে, হাত পা বাঁধা!' বলিতে বলিতে তখনি তাহার বাঁধন খুলিয়া গেল, সে এক লাফে উঠিয়া বসিয়া দুহাতে লুচি, মাংস, পোলাও, পায়স, মেঠাই, মোণ্ডা মুখে পুরিতে লাগিল।

প্রহরীরা ব্যাপার দেখিয়া এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া ছিল। হঠাৎ তাহাদের চৈতন্য হইল। একজন বলিল, 'আরে ধর পালাবে।' আর-একজন বলিল, 'কোথায় আর পালাবে, আমরা এতজন চারধারে দাঁড়িয়ে আছি। আহা, বেচারার সামনে এত জিনিস এসেছে, একটু খেয়ে নিতে দে।' ও কথা শুনিয়া সকলেই বলিল, 'আহা, খাক খাক!' দুঃখীরাম ইহাতে নিতান্ত কৃতার্থ হইয়া বলিল, 'বাপুসকল, তোমরা রাজা হও।'

সেই রাজসভায় রাজার সিংহাসন ছিল; দেখিতে দেখিতে সেখানে তেমনি আরো হাজারটা সিংহাসন হইল। তারপর সকলেরই রাজার মত বেশভুষা হইল, আর তাহারা এক-একটা সিংহাসনে উঠিয়া বসিল।

রাজামহাশয় সভায় আসিয়া দেখেন, তাঁহার মতন ঢের রাজা সভায় বসিয়া আছে। তাহারা তাঁহাকে বলিল, 'মহারাজ, উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক।' রাজা আর কি করেন, এতগুলি রাজার অনুরোধ ঠেলিয়া ফেলা ত সহজ কথা নয়। কাজেই দুঃখীরাম তাড়াতাড়ি খালাস পাইল।

এমন সময় মন্ত্রীমহাশয় আসিয়া উপস্থিত। তিনি এতগুলি রাজাকে এক-ঠাঁই দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। যেদিকে চান সেই দিকেই রাজা, আর মন্ত্রীমহাশয় খালি দু হাত তুলিয়া সেলাম করেন! সেদিন পেটে ভাত অল্পই পড়িয়াছিল, তাহাও হাজার রাজাকে সেলাম করিতে করিতে কখন হজম হইয়া গেল।

দুঃখীরামের কথা শুনিয়া মন্ত্রীমহাশয় যার-পর-নাই ব্যস্ত হইলেন। জোড়হাতে তিনি রাজাদিগকে অনুনয় করিতে লাগিলেন, 'দোহাই ধর্মাবতারগণ, পুনরায় ইহার বিচার করিতে আজ্ঞা হয়। এমন দুষ্ট লোককে সহজে ছাড়িয়া

দিবেন না, কখন কার সর্বনাশ করে তার ঠিক নাই।' এই কথা শুনিয়া রাজাদের ভিতর হইতে একজন বলিল, 'সর্বনাশটা যে কে করলে তা ত বুঝতে পারছি না। আমি তোমার মেথর ছিলাম, আর আজ আমাকে রাজা করে দিয়েছে। এই এখনি তুমি দু হাতে আমাকে কত সেলাম করলে!'

মন্ত্রীমহাশয় আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, সত্যি সত্যি তাঁহার মেথর রাজা সাজিয়া বসিয়া আছে, আর তিনি তাহাকে সেলাম করিয়াছেন। ক্রমে দেখা গেল যে যত রাজা বসিয়া আছে সকলেই কেহ সহিস, কেহ দরোয়ান, কেহ দোকানী কেহ ভিখারী ছিল।

রাজামহাশয় আর মন্ত্রীমহাশয় লজ্জা রাখিবার আর স্থান পান না। রাজা তাড়াতাড়ি হুকুম দিলেন, 'আবার বিচার হইবে, উহাকে ধর।' কিন্তু কে ধরিবে? সবাই রাজা সাজিয়া বসিয়াছে, হুকুম খাটিতে কাহারো ইচ্ছা নাই। অগত্যা মন্ত্রীমহাশয়ই ধরিতে গেলেন। দুঃখীরাম তাহা দেখিয়া বলিল, 'মন্ত্রী-মহাশয়, অত কষ্ট করেন কেন? এই যে আমি হাজির আছি। কিন্তু আমার প্রাণদণ্ড হইলে আমাকে মারিবে কে? জল্লাদ যে রাজা হইয়া গিয়াছে। এখন আপনি আর রাজামহাশয় জল্লাদ হইলে তবে হয়।'

বলিতে বলিতে রাজা ও মন্ত্রীর সেই সুন্দর চেহারা আর জমকালো পোশাক কোথায় চলিয়া গেল, তাহার পরিবর্তে নেংটি-পরা, কুড়াল-হাতে, কালো-ভূত দুই জল্লাদ সাজিয়া, জোড়হাতে হুকুমের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এখন হুকুম দেয় কে?

দুঃখীরাম এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, যে কারণেই হউক, সে যে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, ঘটনায় তাহাই হইতেছে। ইচ্ছা করিলে এখন সে কি না করিতে পারিত। কিন্তু সে বলিল, 'মহারাজ, আপনার নুন খেয়েছি, আপনার নিকট অকৃতজ্ঞ হইব না। আপনার রাজত্ব আপনারই রহিল। এখন আমাকে বিদায় দিতে আজ্ঞা হউক।'

লজ্জায় রাজামহাশয় মাথা হেঁট করিয়া আছেন। দুঃখীরামের কথায় তিনি আর কি উত্তর দিবেন! কেবল বলিলেন, 'আমার সমস্ত রাজ্যই তুমি লইতে পারিতে, ইচ্ছা করিলে আমায় প্রাণেও মারিতে পারিতে। এখন তুমি যাহা বলিলে তাহাতে বুঝিলাম, তুমি মহৎ লোক। আমার অর্ধেক রাজ্য তোমার হউক, আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিয়া সুখে রাজত্ব কর।'

দুঃখীরাম রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পরমসুখে রাজত্ব করিতে লাগিল।

আর-সকলের কি হইল? মন্ত্রীমহাশয়ের সম্বন্ধে দুঃখীরাম কিছু বলে নাই, সুতরাং তিনি জল্লাদই রহিয়া গেলেন। যাহারা রাজা হইয়াছিল, তাহাদের এক নতুন মুশকিল উপস্থিত হইল।

রাজা হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজ্য কোথায় পাইবে? অথচ সকলেই বলে, 'আমি রাজা হয়েছি যে, কাজ কেন করব?' ইহাতে ভারি অসুবিধা হইতে

লাগিল। দুঃখীরাম বলিল, 'বাপুসকল, তোমাদের রাজা-টাজা হইয়া কাজ নাই, তোমরা যার যার যোগ্যতা অনুসারে কাজকর্ম কর গিয়া, আর সৎপথে থাকিয়া সুখে তোমাদের দিন কাটুক।'

## ঠাকুরদা

এক গ্রামে এক বুড়ো ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ভবানীচরণ ভট্টাচার্য। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। তারা তাঁকে বলত ঠাকুরদা। তাদের কাছ থেকে শিখে দেশসুদ্ধ লোকেও তাঁকে ঐ নামেই ডাকত।

ছেলেরা ঠাকুরদার কাছে খুবই আদর পেত, আর তাঁকে জ্বালাতন করত তার চেয়েও বেশি। ঠাকুরদা ভারি পণ্ডিত আর বুদ্ধিমান ছিলেন। খালি এক বিষয়ে তাঁর একটু পাগলামী ছিল; পেয়াদার নাম শুনলেই তিনি ভয়ে কেঁপে অস্থির হতেন। ছেলেরা সে কথা খুবই জানত আর তা নিয়ে ভারি মজা করত।

ঠাকুরদা রোজ তাঁর চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসে পুঁথি লিখতেন। সেই সময়ে মাঝে মাঝে পাড়ার এক-একটা দুষ্টু ছেলে দাড়ি পরে, লাল পাগড়ি এঁটে, মালকোচা মেরে, লাঠি হাতে এসে ঘরের আড়াল থেকে গলা ভার করে বলত, 'ভওয়ানী ভট্চাজ কোন্ হ্যায় ?' ঠাকুরদা তাতে বিষম থতমত খেয়ে ঘাড় ফিরিয়েই যদি লাল পাগড়ির খানিকটা দেখতে পেতেন, তবে আর সে পাগড়ি কার মাথায়, সে কথার খবর নেবার অবসর তাঁর থাকত না। তিনি অমনি এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে একেবারে দিদিমার কাছে হাজির হতেন। ছেলেরা বলে যে, তখন নাকি প্রায়ই ঠাকুরদাকে স্নান করতে হ'ত। কিন্তু সে বোধ হয় তাদের দুষ্টুমি।

যা হোক, এমন বিষম ভয়ের কাণ্ডটা যে ছেলেদের কাজ, এ কথা মুহূর্তের তরেও ঠাকুরদার মাথায় আসত না। তিনি ছেলেগুলিকে বাস্তবিকই খুব ভালবাসতেন। তাঁর কুলগাছটিতে কুল পাকলে তাদের সকলকে ডেকে ডেকে প্রত্যেকের হাতে একটি-একটি করে কুল দিতেন, কাউকে বঞ্চিত করতেন না— একটির বেশি কখনও কাউকে দিতেন না। সেই পরগণার ভিতরে এমন মিষ্টি কুল আর কোথাও ছিল না। কাজেই, একটি খেয়ে ছেলেদের যেমন ভাল লাগত, আর খেতে না পেয়ে তাদের তেমনি কষ্ট হত।

তবুও এমন কথা শোনা যায় নি যে, ঠাকুরদার দেওয়া ছাড়া আর-একটি কুল কেউ কখনো তাঁর গাছ থেকে খেতে পেরেছে। তাঁর চণ্ডীমণ্ডপ থেকে সেই কুলগাছটি পরিষ্কার দেখা যেত। সেদিকে কাউকে যেতে দেখলেই তিনি 'কে-রে

এ-এ' বলে এমনি বিষম হাঁক দিতেন যে কি বলব ! তখন আর হাত পা সামলে ছুট দেবার উপায় থাকত না। দু মাইল দূরে থেকে লোকে বলত, 'ঐ রে ! ঠাকুরদা তাঁর কুল আগলাচ্ছেন।'

খালি একবার ছেলেরা ঠাকুরদার কাছ থেকে একপোয়া সন্দেশ আদায় করেছিল। ঠাকুরদা চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসে একমনে পুঁথি লিখছিলেন; তিনি দেখতে পাননি যে, এর মধ্যে ও পাড়ার বোসেদের বানরটা কেমন করে ছুটে এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছে, আর তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের পুরনো বাঁধানো হুঁকোটি নিয়ে গাছে উঠেছে। তারপর তামাক খেতে গিয়ে দেখেন, কি সর্বনাশ ! বানরটাকে তিনি কত ঢিল ছুঁড়ে মারলেন, কত লম্বা লম্বা সংস্কৃত বকুনি বকলেন, কিছুতেই তার কাছ থেকে হুঁকোটি আদায় করতে পারলেন না। লাভের মধ্যে সে বেটা তাঁকে গোটা দশেক ভেংচি মেরে হুঁকো সুদ্ধ পাশের বাড়ির আমবাগানে চলে গেল।

সেদিন ছেলেরা না থাকলে ঠাকুরদার আবার তাঁর হুঁকোর মুখ দেখবার কোন আশাই ছিল না। তিনি তাদের সন্দেশ কবুল করে অনেক কষ্টে তাদের দিয়ে বানরের হাত থেকে হুঁকোটি আদায় করালেন। তার পরদিনই নিজে গিয়ে বেচু ময়রার দোকান থেকে তাদের জন্য এক পোয়া সন্দেশ কিনে আনলেন। সে সন্দেশ খেয়ে নাকি তারা মুখ সিঁটকিয়েছিল। ঠাকুরদা তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তারা বলল, 'সন্দেশটা বড্ড মিষ্টি।' ঠাকুরদা তখন খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'তাই ত, আমি জানতুম না তোমরা তেতো সন্দেশ খাও। আমি মিষ্টি সন্দেশই কিনে এনেছি।'

পয়সা খরচ নিয়ে কিন্তু ঠাকুরদার একটু বদনাম ছিল। ঐ যে হুঁকোর খাতিরে ছেলেদের একপোয়া সন্দেশ কিনে খাইয়ে ছিলেন, তা ছাড়া আর তাঁর জীবনে তিনি কখনো কাউকে কিছু কিনে খাওয়ান নি। লোকে বলত তাঁর ঘরের ভিতর তিন-জালা টাকা পোঁতা আছে। কিন্তু নিজে তিনি এমনভাবে চলতেন যেন অনেক কষ্টে তাঁর দুটি খাবার জোটে, সেও বুঝি-বা একবেলা বই দুবেলা নয়। একদিন দিদিমা ডাল রাঁধতে গিয়ে তাতে একটু বেশি ঘি দিয়ে ফেলেছিলেন, সেই অপরাধে নাকি ঠাকুরদা দুমাস তাঁর সঙ্গে কথা কন নি।

ছেলেরা তাঁর সেই সন্দেশ খেয়ে অবধি তাঁর উপর একটু চটে ছিল। না চটবেই বা কেন ? সেই হতভাগা বানরটার কাছ থেকে হুঁকো আদায় করতে গিয়ে তারা কি কম নাকাল হয়েছিল ? কুড়িজন মিলে তিনটি ঘণ্টা ধরে তারা সেদিন কত গাছই বেয়েছে, কত ছুটোছুটিই করেছে, কত কাদাই লাগিয়েছে, কত বিছুটির ছ্যাঁকাই খেয়েছে। তার পুরস্কার হলো কিনা অমনিতর একপোয়া সন্দেশ !

তখন ছিল পুজোর সময়। কুমোরদের বাড়িতে অনেক ঠাকুর গড়া হচ্ছিল,

তার তামাশা দেখবার জন্যে সকালে বিকালে ছেলেদের প্রায় সকলেই সেখানে যেত। সেখানেই তাদের একটা মস্ত মিটিং হলো ; ঠাকুরদাকে জব্দ করতে হবে। তিনি যেমন সন্দেশ খাইয়েছেন, তাঁকে দিয়ে বেশি কিছু হাতে টাকা খরচ করাতে পারলে তবে তাদের দুঃখটা মেটে। কিন্তু এমন লোকের পয়সা ত সহজে খরচ করানো যেতে পারে না ; তার কি উপায় হতে পারে।

কতজনে কত কথা বলতে লাগল। কেউ বলল, 'চল, ঠাকুরদার কুলগাছ কেটে ফেলি।' কেউ বলল, 'তাঁর হুঁকো লুকিয়ে রাখি।' কিন্তু এ-সব কথা কারুর পছন্দ হলো না। এমন কুলগাছটি কাটলে ভারি অন্যায় হবে। হুঁকো লুকিয়ে রাখলেও ত শেষটা তাঁকে ফিরিয়ে না দিলে চলবে না। তা ছাড়া, এ সব করলে তাঁকে আর টাকা খরচ করানো হলো কই ? ঠাকুরদাকে ছেলেরা আসলে ভালবাসত ; নাহক তাঁর লোকসান করাতে কারো ইচ্ছা ছিল না। কাজেই সব কথায় সকলের অমত হলো। এমন ভাবে তাঁকে দিয়ে টাকা খরচ করাতে হবে যে সেটা তাঁর ক্ষতির মধ্যে ধরা না যেতে পারে।

ছেলেরা দেখল কাজটি তেমন সহজ নয়। বুড়ো কুমোর এর মধ্যে এসে বুদ্ধি জুগিয়ে না দিলে তাদের পক্ষে একটা মতলব ঠিক করাই ভার হত। বুড়ো যে যুক্তি বলল, সে ভারি চমৎকার। ছেলেরা তার কথায় যার-পর-নাই খুশি হয়ে ঘরে চলে গেল। ঠিক হলো, পরদিনই সেই কাজটি করতে হবে।

রাত থাকতেই ঠাকুরদার ঘুম ভাঙে। তখন তিনি শুয়ে শুয়ে সুর করে শোলোক আওড়ান। তারপর ভোর হবার একটু আগে উঠে, স্নান তর্পণ সেরে, শেষে গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসেন। সেদিনও দোয়েল ডাকবার আগেই তিনি জেগে সবে বসেছেন, 'ব্রহ্মামুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী'—অমনি বাইরে কে যেন ডাকল, 'ভওয়ানী ভট্‌চাজ ঘরমে হ্যায় ?'

আর ঠাকুরদার শোলোক আওড়ানো হলো না। স্নান আহ্নিক আজ তিনি খিড়কির পুকুরেই সারলেন। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বসে পুঁথি লেখার কাজটিও আজ বন্ধ রইল—তার চেয়ে দিদিমার রান্নাবান্নার খবর নেওয়াই বেশি দরকার মনে হয়েছে। এমনিভাবে দুপুর অবধি কেটে গেল। এরপর যখন আর কেউ 'ভওয়ানী ভট্‌চাজ' বলে ডাকল না, তখন ঠাকুরদা সাহস পেয়ে ভাবলেন, একটু বাইরে গিয়ে দেখে আসি না কেন !

এই বলে আস্তে আস্তে বাইরে এসে ঠাকুরদা দেখলেন—কি সর্বনাশ ! কি চমৎকার ! তাঁর মণ্ডপের মাঝখানে দুর্গা প্রতিমা ঘর আলো করে বসে আছেন। ঠাকুরদার আর পা সরল না। তিনি সেইখানেই মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবলেন—হায় ! হায় ! কোন্ শয়তান এই কাজ করল ? এই প্রতিমা আমার ঘরে রেখে গেছে, এখন ওকে পুজো না করলে মহাপাপ হবে। আর পুজো করতে গেলেও যে তিনশোটি টাকার কম লাগবে না। বাবা গো, আমি কোথায় যাব !

যা হোক, ঠাকুরদা কৃপণ হলেও অতি ধার্মিক আর পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি তখনই ভাবলেন—আর দুঃখ করে কি হবে? ঘরে টাকা রেখেও আমি দেবসেবায় হেলা করেছিলাম, তাই দেবতা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। ভালই হলো, এখন থেকে আমি ফি-বছর দুর্গোৎসব করব।

ততক্ষণে ছেলেরা দুটি একটি করে প্রাণপণে হাসি চাপতে চাপতে এসে উপস্থিত হয়েছে। কাজটি ত তাদেরই, তারাই ঠাকুরদাকে পেয়াদার ভয় দেখিয়ে বাড়ির ভিতর পাঠিয়ে সেই অবসরে প্রতিমাটিকে এনে মণ্ডপের ভিতরে রেখে গেছে। তাদের মুখের দিকে চেয়ে ঠাকুরদারও আর সে কথা বুঝতে বাকি রইল না। তখন তিনি বললেন, 'ভালই করেছ দাদা, বুড়ো পাপীর সুমতি জন্মিয়ে দিয়েছ। তোমরা বেঁচে থাকো। আমি খালি ভাবছি—এত বড় ব্যাপার, আমার লোকজন কিছু নেই, আমি কুলোব কি করে?'

ছেলেরা ভেবেছিল, ঠাকুরদা লাঠি নিয়ে তাড়া করবেন! তার বদলে তিনি এমন কথা বলবেন, তা তারা মোটেই ভাবে নি। তারা তাতে ভারি খুশি হয়ে বলল. 'তার জন্যে চিন্তা কি ঠাকুরদা। আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনি শুধু বসে বসে হুকুম দিন।' অমনি ঠাকুরদার মুখ ভরে হাসি ফুটে উঠল, তাঁর চোখ দুটি বুজে এল। ছেলেদের মাথায় হাত বুলিয়ে, গাল টিপে আর নাকে কানে চিমটি কেটে তিনি তাদের বিদায় করলেন।

এবারে ঠাকুরদা যে সন্দেশ এনেছিলেন তা খেয়ে আর কারো নাক সিঁটকোতে হয় নি।

## ঠানদিদির বিক্রম

আমাদের এক ঠানদিদি ছিলেন। অবশ্য ঠাকুরদাদাও ছিলেন, নইলে ঠানদিদি এলেন কোত্থেকে? তবে ঠাকুরদাদাকে পাড়ার ছেলেরা ভাল রকম জানত না। ঠাকুরদাদার নাম রামকানাই রায়। লোকে তাঁকে কানাই রায় বলে ডাকত, কেউ কেউ রায়মশায়ও বলত।

ঠাকুরদাদাকে যে ছেলেরা জানত না তার একটু নমুনা দিচ্ছি। ঠানদিদির বাড়িতে এক-ঝাড় তল্‌তা বাঁশ ছিল, ঐ বাঁশে ভাল মাছ ধরবার ছিপ হত। একবার কয়েকটি ছেলে ছিপ তৈরি করবে বলে চুপি চুপি একটি বাঁশ কেটে রাস্তায় টেনে এনেছে, অমনি দেখে—রায়মশায় সম্মুখে। তারা তখনি হাত জোড় করে বললে, 'আপনার পায়ে পড়ি, ঠানদিদিকে বলবেন না।' তিনি ত শুনে অবাক! —'আরে বলিস কি? আমার বাঁশ নিয়ে পালাচ্ছিস, আর বলছিস বলবেন না!'

ছেলেগুলি সকলে মিলে কেবলই বলতে লাগল, 'আপনার পায়ে পড়ি, ঠানদিদিকে বলবেন না।' তখন রায়মশায় বেগতিক দেখে বললেন, 'তোরা বাঁশ দিয়ে কি করবি ?' 'আজ্ঞে ছিপ করব।' 'আচ্ছা, নিয়ে যা।' তখন আবার 'দেখবেন, ঠানদিদিকে যেন বলবেন না' বলে ছেলেগুলো বাঁশ নিয়ে ছুট। এখন বোধ করি তোমরা বুঝতে পারছ, রায়মশাই যে ঠাকুরদাদা তা অনেক ছেলেই জানত না। ছেলেরা জানত—ঠানদিদির বাড়ি। ঠানদিদির বাঁশঝাড়, ঠানদিদির কাঁঠালগাছ, বিশেষভাবে ঠানদিদির কুলগাছ আর পেয়ারাগাছ।

ঠানদিদির পুত্রসন্তান নেই, কেবল তিনটি মেয়ে। বড় মেয়ে দুটির বিবাহ হয়ে গিয়েছে, ছোটটির বয়স ন-দশ বৎসর। ঠানদিদির বয়স চল্লিশের উপর। বাড়িতে অন্য লোকজন নেই, কিন্তু তা হলেও, ঠাকুরদাদা বিদেশে গেলে ঠানদিদির চৌকিদার বা ঘরে শোবার জন্য বুড়ো স্ত্রীলোকের দরকার হয় না। ঠানদিদি অনায়াসে একাই থাকেন।

একবার ঠাকুরদাদা বিদেশে গিয়েছেন ! ঠানদিদি কেবল ছোট মেয়েটিকে নিয়ে বাড়িতে আছেন। সেই সময়ে একদিন দুপুর রাত্রে মেয়েটি বলল, 'মা, কে যেন আমার গায়ে হাত দিল !' ঠানদিদি বললেন, 'চুপ কর, কথা বলিস না।'

ঠানদিদি পূর্বেই টের পেয়েছেন, ঘরে চোর ঢুকেছে। তারপর চোর যেই বাক্স পেঁটরার সন্ধানে ঘরের অন্য দিকে গিয়েছে, অমনি ঠানদিদি আস্তে আস্তে উঠে, বাটনাবাটা শিলখানা সিঁদের মুখে চাপা দিলেন।

তোমরা শহরের ছেলেরা বোধ করি বুঝতে পারলে না, সিঁদ কি ! পাড়াগাঁয়ে অনেক মেটে ঘর। ঐসব মেটে ঘরে সিঁদকাঠি, খুঁড়ে চোর ঘরের ভিতর ঢুকে চুরি করে। এইবার আরো মুশকিল হলো, সিঁদকাঠি কি ? সিঁদকাঠি যে কি তা আমিও কখনো চোখে দেখি নি। সম্ভবত ওটা খন্তা বা শাবলের মত লোহার কোন অস্ত্র হবে।

এই সিঁদকাঠি তৈরি সম্বন্ধে পাড়াগাঁয়ে একটি কথা আছে 'চোরে কামারে কখনো দেখা হয় না।' সিঁদকাঠি যখন লোহার অস্ত্র, তখন অবশ্যই ওটা কামারে গড়ে। কিন্তু চোর কি কামারের বাড়ি গিয়ে বলে, 'কর্মকার ভায়া, আমাকে একটা সিঁদকাঠি তৈরি করে দাও !' নিশ্চয়ই না। তা হলে ত সেইখানেই সে চোর বলে ধরা দিল। কামার ভায়া চোরের নিতান্ত বন্ধু হলেও সময় মত অন্য দু-দশজন বন্ধুর কাছে সে গল্পটা করবেই। দরকার হলে পুলিশের কাছেও বলতে পারে।

তবে চোর কি করে সিঁদকাঠি গড়ায় ? আমরা ছোটবেলায় শুনতাম চোরের সিঁদকাঠির দরকার হলে, চোর একখানি লোহা আর একটি আধুলি রাত্রে কামারশালের এমন জায়গায় রেখে যায় যাতে কামার সকালে কামারশাল খুলবার সময়েই সেটা তার নজরে পড়ে। তখন কামার অন্য কাজ বন্ধ রেখে সকলের

অসাক্ষাতে সিঁদকাঠি তৈরি করে। তারপর কামারশাল বন্ধ করবার সময়, ঠিক সেই জায়গায় সেটি রেখে দেয়। রাত্রে চোর এসে সেটি নিয়ে যায়।

এখন আসল কথা শোন। ঠানদিদি সিঁদের মুখে শিলটি চাপা দিয়ে তার পাশে চুপ করে বসে আছেন। তারপর চোর একটি বাক্স এনে সিঁদের কাছে যেমন নামিয়েছে, অমনি বেটাকে জাপটে ধরেছেন। তখন চোর নাকি-সুরে বলল, 'মা ঠাকরুণ ছেড়ে দিন!' ঠানদিদি বললেন, 'বল্ বেটা তুই কে? নইলে এখনি পাড়ার লোক ডেকে তোকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করব।' চোর দেখল নাম না বললে আর নিষ্কৃতি নেই, কাজেই বলল, 'মা ঠাকরুণ, আমি



শীতল!' তা শুনে ঠানদিদি বললেন, 'হতভাগা! মরতে আর জায়গা পাও নি? যাও! ঐ বাইরে কলসী আছে—পুকুরে গিয়ে জল আনো, তারপর কাদা করে সিঁদ বোজাও। ঐ গোয়ালে গোবর আছে; গোবর দিয়ে ভিতর-বার ভাল করে নিকিয়ে দিয়ে যাও। আমি সকালে উঠে এ সব হাঙ্গামা করতে পারব না।'

শীতল তখন কলসীটি নিয়ে আস্তে আস্তে পুকুর ঘাটে গেল। তখন

ফাল্গুন মাস, পাড়া গাঁয়ে বেশ শীত। সেই শীতে পুকুর থেকে জল এনে, কাদা করে, সিঁদ বুজিয়ে, ভাল করে নিকিয়ে তবে শীতল ছুটি পায়!

তোমরা চালাক ছেলেরা ভাবছ, চোরটা কি বোকা, কলসী নিয়ে অমনি পালাল না কেন? শীতল কলসী নিয়ে পালালে তার কি দশা হত, তা আর একদিন তোমাদের বলব।

## ঘ্যাঁঘাসুর

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল একটি মেয়ে। মেয়েটি হইয়া অবধি খালি অসুখেই ভুগিতেছে। একটি দিনের জন্যও ভাল থাকে না। কত বদ্যি, কত ডাক্তার, কত চিকিৎসা, কত ওষুধ—মেয়ে ভাল হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিনই রোগা হইতেছে। এত ধন জন থাকিয়াও রাজার মনে সুখ নাই। কিসে মেয়েটি ভাল হইবে, তাঁহার কেবল সেই চিন্তা।

এমনি করিয়া দিন যায়। এর মধ্যে একদিন এক সাধু রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি রাজার মেয়ের অসুখের কথা শুনিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, তোমার মেয়ে একটি লেবু খাইয়া ভাল হইবে।'

একটি লেবু! সে কোন্ লেবুটি, কোথায় কাহার বাগানে তাহা পাওয়া যাইবে, সাধু তাহার কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। রাজা আর উপায় না দেখিয়া দেশের লোককে এই কথা জানাইয়া দিলেন, যাহার লেবু খাইয়া আমার মেয়ে ভাল হইবে, সে আমার মেয়েকে বিবাহ করিবে, আর আমার রাজ্য পাইবে।'

এখন মুশকিলের কথা এই যে, সে রাজ্যে লেবু মিলে না। কেবলমাত্র এক চাষির বাড়িতে একটি লেবুর গাছ আছে; চাষি অনেক কষ্ট করিয়া শ্রীহট্ট হইতে সেই গাছটি আনিয়াছিল। সবে সেই বৎসর তাহাতে লেবু হইয়াছে। লেবু ত নয়, যেন রসগোল্লা! এক-একটা বড় কত! যেন এক-একটা বেল! তেমন লেবু তোমরা দেখও নাই, খাও-ও নাই। আমিও দেখিতে পাই নাই; দেখিতে পাইলে খাইতে চেষ্টা করা যাইত।

চাষির তিন ছেলে; যদু, গোষ্ঠ আর মানিক। রাজার হুকুম শুনিয়া চাষি যদুকে এক ঝুড়ি লেবু দিয়া বলিল, 'শিগ্গির এগুলি রাজার বাড়ি নিয়ে যা। এর একটা খেয়ে যদি মেয়ের ব্যামো সারে, তবে রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবি।'

যদু লেবুর ঝুড়ি মাথায় করিয়া রাজার বাড়ি চলিয়াছে, এমন সময় পথে একহাত লম্বা একটি মানুষের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। সেই লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার ঝুড়িতে কি ও?' যদু বলিল, 'ব্যাঙ।' সেই লোকটি বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

রাজার দরোয়ানেরা লেবুর কথা শুনিয়া যার-পর-নাই আদরের সহিত যদুকে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা মহাশয় ব্যস্ত হইয়া নিজেই ঝুড়ির ঢাকা খুলিলেন। আর অমনি চারটি ব্যাঙ তাঁহার পাগড়ির উপর লাফাইয়া উঠিল। সেই ঝুড়িতে যতগুলি লেবু ছিল, সব কয়টাই ব্যাঙ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং লেবু খাওয়াইয়া রাজার মেয়েকে ভাল করা, আর রাজার জামাই হওয়া, যদুর ভাগ্যে ঘটিল না। সে বেচারা অনেকগুলি লাথি খাইয়া প্রাণে বাঁচিয়া যে বাড়ি ফিরিল, তাহাই ঢের বলিতে হইবে।

এরপর চাষি আর-এক ঝুড়ি লেবু দিয়া গোষ্ঠকে পাঠাইল। এবারেও সেই একহাত লম্বা মানুষটি কোথা হইতে আসিয়া গোষ্ঠর ঝুড়িতে কি আছে জিজ্ঞাসা করিল। গোষ্ঠ বলিল, 'ঝিঙের বীচি।' একহাত লম্বা মানুষটি বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

রাজবাড়ির দরোয়ানেরা প্রথমে গোষ্ঠকে ঢুকিতে দেয় নাই। তাহারা বলিল, 'তোরই মত একটা লোক সেদিন এসে রাজামশাইয়ের পাগড়ি নোংরা করে দিয়ে গেছে। তুই আবার একটা কি করে বসবি কে জানে!' অনেক পীড়াপীড়ির পর গোষ্ঠ ঢুকিয়া রাজার মেয়েকে কিরূপ লেবু খাওয়াইল, বুঝিতে পার। সাজাটাও তার তেমনিই হইল।

মানিককে সকলেই একটু বোকা মনে করে। কাজেই তাহাকে কেহ আর লেবুর ঝুড়ি দিয়া রাজার বাড়ি পাঠাইতে বলিল না। কিন্তু সে যাইবার জন্য একেবারে সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। যতক্ষণ না চাষি তাহাকে যাইতে বলিল, ততক্ষণ তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না। শেষটা তাহাকেও এক ঝুড়ি লেবু দিয়া পাঠাইতে হইল।

পথে সেই একহাত লম্বা মানুষের সহিত মানিকেরও দেখা হইল। একহাত লম্বা মানুষ জিজ্ঞাসা করিল, 'ঝুড়িতে কি ও?' মানিক বলিল, 'ঝুড়িতে লেবু আছে; তাই খেয়ে রাজার মেয়ের অসুখ সারবে।' একহাত লম্বা মানুষ বলিল, 'আচ্ছা তাই হোক।'

রাজবাড়িতে ঢুকিতে মানিকের যার-পর-নাই মুশকিল হইয়াছিল। অনেক মিনতি আর হাত জোড়ের পর দরোয়ানেরা তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল আর বলিল, 'দেখিস, যেন ব্যাঙ কি ঝিঙের বীচি-টিচি না হয়। তা হলে কিন্তু তোর প্রাণটা থাকবে না।'

যাহা হউক মানিকের ঝুড়িতে লেবুই পাওয়া গেল। রাজামহাশয় ত খুবই খুশি। তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর লেবু পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন, 'কেমন হয়,

আমাকে খবর দিস্ !' খবরের আশায় রাজামহাশয় বসিয়া আছেন, এমন সময় মেয়ে নিজেই খবর লইয়া উপস্থিত ! সেই লেবু মুখে দিতে না দিতেই তাহার অসুখ একেবারে সারিয়া গিয়াছে !

ইহাতে রাজামহাশয় যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাহার পরেই ভাবিতে লাগিলেন—'তাই ত, করিয়াছি কি ! এখন যে চাষির ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে হয় !' এই ভাবিয়া রাজামহাশয় স্থির করিলেন যে চাষির ছেলেকে যেমন করিয়াই হউক ফাঁকি দিতে হইবে।

মানিকলাল ভাবিতেছে, 'এরপরই বুঝি মেয়ের বিয়ে দিবে।' এমন সময় রাজামহাশয় তাহাকে বলিলেন, 'বাপু, তুমি কাজটা বেশ ভালই করিয়াছ, কিন্তু রাজার মেয়ে বিবাহ করা সহজ নয়। আগে, আর-একখানা কাজ করিয়া দাও, তারপর দেখা যাইবে কি হয়। জলে যেমন চলে, ডাঙায়ও তেমনি চলে, এইরূপ একখানা নৌকা আমাকে গড়িয়া না দিতে পারিলে, তোমার কোন আশাই নাই।'

মানিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায় হইল। তারপর বাড়ি আসিয়া সকল কথা বলিল।

বাড়ির সকলেই মানিককে নেহাত বোকা ঠাওরাইয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং তাহারা মনে করিল যে, মানুকে যখন রাজার মেয়েকে ভাল করিয়া আসিয়াছে, তখন নৌকাখানা ইচ্ছা করিলেই যে-সে তয়ের করিতে পারে।

যদু একখানা কুড়াল লইয়া তখনই নৌকা গড়িতে চলিল। বনের ভিতর হইতে গাছ কাটিয়া সেখানেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। ইচ্ছা, সেইদিনই নৌকা প্রস্তুত করিয়া ফেলে ; পরিশ্রমেরও কসুর নাই। এমন সময় কোথা হইতে সেই একহাত লম্বা মানুষ আসিয়া উপস্থিত। 'কিহে যদুনাথ, কি হচ্ছে ? যদু বলিল,—'গামলা'।

'তাই হোক' বলিয়া একহাত লম্বা মানুষ চলিয়া গেল ; যদুও নৌকা গড়িতে লাগিল। কিন্তু সে যত পরিশ্রম করে তাহার সমস্তই বৃথা হয়। সেই সর্বনেশে কাঠ খালি গামলার মত গোল হইয়া ওঠে, কিছুতেই নৌকার মতন হইতে চায় না। শেষটা যদুর রাগ হইয়া গেল। কিন্তু রাগের ভরে এক কাঠ ফেলিয়া দিয়া ক্রমাগত আর দুই তিনটা কাঠ লইয়াও গামলা ছাড়া আর কিছুই তয়ের করিতে পারিল না। যাহা হউক, গামলাগুলি হইল ভারি সরেস। সুতরাং সন্ধ্যার সময় যদুনাথ গোটা তিন চার গামলা ঘাড়ে করিয়া বাড়ি ফিরিল ; এমন ভাল গামলাগুলি বনে ফেলিয়া আসিতে কিছুতেই তাহার ইচ্ছা হইল না।

তারপর গোষ্ঠ নৌকা গড়িতে চলিল, আর সেই একহাত লম্বা মানুষের অনুগ্রহে সন্ধ্যাবেলা পাঁচখানি অতিশয় উঁচুদরের লাঙল কাঁধে ঘরে ফিরিল।

অবশ্য, এরপর মানিক নৌকা গড়িতে গেল, আর তাহাকেও সেই একহাত

লম্বা মানুষ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হচ্ছে ?' মানিক সাদাসিধা উত্তর দিল—'জলে যেমন চলে ডাঙায়ও তেমনি চলে, এমন একখানা নৌকা গড়ে দিতে পারলে রাজামশায় বলেছেন, মেয়ের বিয়ে দেবেন।' এই কথা শুনিয়া একহাত লম্বা মানুষ বলিল, 'আচ্ছা, তাই হোক।'

মানিক সবে নৌকার কাঠ কাটিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিয়াছিল। একহাত লম্বা মানুষের কথা শেষ হইতে না হইতেই সেই কাঠ ছুটিয়া চলিয়াছে। সে আর এখন কাঠ নাই ; অতি চমৎকার একখানা নৌকা। তাহাতে দাঁড়ি নাই, মাঝি নাই, দাঁড় নাই, পাল নাই। যেখানে যাইবার দরকার, তাহা নিজেই বুঝিয়া লয়, সেখানে সে নিজেই থামে। রাজা-রাজড়ার উপযুক্ত মখমলের গদি-তাকিয়ায় তাহার ভিতরটা সাজানো। বাহিরটা দেখিতে কি সুন্দর, তা কি বলিব। যে জিনিসে তাহা সাজাইয়াছে, তাহা সেই একহাত লম্বা মানুষের দেশে হয় ; আমি তাহার নাম জানি না।

রাজামহাশয় সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় মানিকলালের নৌকা সেইখানে গিয়া উপস্থিত। সকলে নৌকার রূপগুণ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল, আর কত প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজামহাশয়ও খুব আশ্চর্য না হইয়াছিলেন এমন নয়। কিন্তু তাহা চাপিয়া গিয়া মুখে মানিককে বলিলেন, 'এতেও হচ্ছে না ; আর-একখানা কাজ করিয়া দিতে হবে। ঘ্যাঁঘাসুরের লেজের পালক একগাছা হইলে আমার মুকুটের বেশ শোভা হয়। এই জিনিসটি আনিয়া দিলে নিশ্চয় আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পাবে।' মানিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ঘ্যাঁঘাসুরের পালক আনিতে চলিল।

খানিকটা পাখি, খানিকটা জানোয়ার, বিদ্ঘুটে চেহারা, খিটখিটে মেজাজ, ভারি জ্ঞানী, বেজায় ধনী, অসুর ঘ্যাঁঘা মহাশয়, এক মাসের পথ দূরে, অজানা নদীর ধারে অচেনা শহরে, সোনার পুরীতে বাস করেন। মানুষটিকে দেখিতে পাইলেই, রসগোল্লাটির মত টপ্ করিয়া তাহাকে গিলেন। সেই ঘ্যাঁঘা মহাশয়ের পালক আনিতে মানিক চলিয়াছে। যাহাকে দেখে, তাহাকেই ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকের পথ জিজ্ঞাসা করে ; আর ডাইনে বাঁয়ে না চাহিয়া ক্রমাগত সেই পথে চলে। রাত্রি হইলে কাহারো বাড়িতে আশ্রয় লয় ; আবার সকালে উঠিয়া চলিতে থাকে।

ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকে যাইতেছে শুনিয়া, সকলেই তাহাকে আদর করিয়া জায়গা দেয়। একদিন রাত্রিতে এইরূপে সে একজন খুব ধনী লোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছে। সেই ধনী অনেক কথাবার্তার পর তাহাকে বলিল, 'বাপু, তুমি ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে চলেছ শুনছি, সে অনেক বিষয়ের খবর রাখে। আমার লোহার সিন্দুকের চাবিটা হারিয়ে ফেলেছি ; ঘ্যাঁঘা তার কোন সন্ধান বলতে পারে কি না, জিজ্ঞাসা কোরো ত।' মানিক বলিল, 'আচ্ছা মশাই, আমি জেনে আসব।' আর-একদিন সে আর-এক বড়লোকের বাড়িতে অতিথি

হইয়াছে ; সেই বড়লোকের মেয়ের ভারি অসুখ। তাহার ব্যায়রামটা যে কি কোন ডাক্তার কবিরাজ তাহা ঠিক করিতে পারে না। মেয়ে দিন দিন খালি রোগা হইয়া যাইতেছে। সেই বড়লোক মানিককে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া তারপর বলিলেন, 'আমার মেয়ের অসুখ কিসে সারবে এই কথাটা যদি ঘ্যাঁঘার কাছ থেকে জেনে আসতে পার, তবে বড় উপকার হয়।' মানিক বলিল, 'অবিশ্যি মশাই, আমি নিশ্চয় জেনে আসব।'

এইরূপে একমাস চলিয়া মানিক অজানা নদীর ধারে আসিয়া ওপারে ঘ্যাঁঘাসুরের সোনার বাড়ি দেখিতে পাইল। অজানা নদীতে নৌকা নাই, খেয়া নাই ; এক বুড়ো সকলকেই কাঁধে করিয়া পার করে। মানিকও তাহারই কাঁধে চড়িয়া নদী পার হইল। বুড়ো তাহাকে বলিল, 'বাপু, আমার এই দুঃখু কবে দূর হবে, ঘ্যাঁঘার কাছে জিজ্ঞেস কোরো ত! আমার খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, খালি কাঁধে করে দিনরাত্তির মানুষই পার করছি। ছেলেবেলা থেকে এই করছি, আর এখন বুড়ো হয়ে গেছি।' মানিক বলিল, 'তোমার কিছু চিন্তা নেই, আমি নিশ্চয়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করব।'

নদী পার হইয়া মানিক ঘ্যাঁঘার বাড়িতে গেল। ঘ্যাঁঘা তখন বাড়ি ছিল না ; ঘেঁঘী ছিল। ঘেঁঘী তাহাকে দেখিয়া বলিল, 'পালা বাছা, শিগ্গির পালা। ঘ্যাঁঘা তোকে দেখতে পেলেই গিলবে।' মানিক বলিল, 'আমি যে ঘ্যাঁঘার লেজের একগাছি পালক চাই। সেটি না নিয়ে কেমন করে যাব? আর সেই যাদের চাবি হারিয়ে গেছে সেই চাবিটি কোথায় আছে? আর যাদের মেয়ের অসুখ, তারা ওষুধ জেনে যেতে বলেছে। আর যে বুড়ো পার করে দিলে, তার দুঃখ কবে দূর হবে?'

ঘেঁঘী বলিল, 'প্রাণটি নিয়ে কোথায় পালাবে, তা না আবার তার পালক চাই, আর তাকে একশো খবর বলে দাও। তুই কে রে বাপু?' মানিক বলিল, 'আমি মানিক। পালক না নিয়ে গেলে রাজা মেয়ের বিয়ে দেবে না ; একগাছি পালক আমার চাই।'

হাজার হোক স্ত্রীলোক। মানিককে দেখিয়া ঘেঁঘীর দয়া হইল। সে বলিল, 'আচ্ছা বাপু, তাহলে তুই এই খাটের তলায় লুকিয়ে থাক। তোর ভাগ্যে থাকলে হবে এখন।' মানিক ঘ্যাঁঘার খাটের তলায় লুকাইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর ঘ্যাঁঘাসুর বাড়ি আসিল। ঘেঁঘী তাড়াতাড়ি পা ধুইবার জলটল দিয়া সোনার থালায় খাবার হাজির করিল। ঘ্যাঁঘার মেজাজটা বড়ই খিটখিটে ; সবটাতেই সে দোষ ধরে। বাড়ি আসিয়াই সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, 'মানুষের গন্ধ কোত্থেকে এল? হুঁ হুঁ, মানুষের গন্ধ। মানুষ দে খাই।'

ঘ্যাঁঘার কথা শুনিয়া খাটের তলায় মানিকলালের মুখ শুকাইয়া গেল, ঘেঁঘীরও বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। সে অনেক কৌশল করিয়া

ঘ্যাঁঘাকে বুঝাইল যে, একটা মানুষ আসিয়াছিল, কিন্তু সেটা ঘ্যাঁঘার নাম শুনিয়া পলাইয়াছে। ইহাতে ঘ্যাঁঘা কিছু শান্ত হইয়া খাবার খাইতে বসিল।

খাওয়া শেষ হইলে, ঘ্যাঁঘা খাটে শুইয়া নিদ্রা গেল। ঘুমের ভিতর তাহার লম্বা লেজটি লেপের বাহিরে আসিয়া খাটের পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সেই লেজের আগায় অতি চমৎকার পালকের গোছা। মানিক খাটের তলায় অপেক্ষা করিয়া আছে; লেজ দেখিয়াই সে খ্যাঁচ করিয়া একটি পালক ছিঁড়িয়া লইল। অমনি ঘ্যাঁঘা ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, 'ঘেঁঘী, আমার লেজ ধরে কে যেন টানলে। হুঁ হুঁ মানুষের গন্ধ।'

ঘেঁঘী বলিল, 'তোমার ভুল হয়েছে। অত বড় পালকের গোছা কোথায় আটকে লেজে টান পড়েছে। আর মানুষ ত একটা এসেছিল বলেছি, এ তারই গন্ধ। সেই মানুষটা কত কথা বললে। সেই কাদের বাড়ি লোহার সিন্দুকের চাবি হারিয়ে গেছে—' ঘেঁঘীর কথা শেষ হইতে না দিয়াই ঘ্যাঁঘা বলিল, 'হাঁ হাঁ! সেই লোহার সিন্দুকের চাবি! আমি জানি। সেটাকে তাদের খোকা গদির ফুটোর ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।' ঘেঁঘী বলিল, 'আবার কাদের মেয়ের কি অসুখ— !' অমনি ঘ্যাঁঘা বলিল, 'কোনা ব্যাঙে ওর চুল নিয়ে গেছে; ঘরের কোণেই তার গর্ত। ঐখান থেকে খুঁড়ে সেই চুল আনলেই মেয়ের ব্যামো সারবে।' আবার ঘেঁঘী বলিল, 'যে লোকটা মানুষ ঘাড়ে করে নদী পার করে— ?' ঘ্যাঁঘা বলিল, 'সেটা একটা মস্ত গাধা। একজনকে কেন নদীর মাঝখানে নামিয়ে দেয় না। তাহলেই ত সে বাড়ি যেতে পারে। যাকে নামিয়ে দেবে সে-ই মানুষ পার করতে থাকবে।'

মানিকের সকল কাজই আদায় হইল। এখন রাত পোহাইলে ঘ্যাঁঘা বাহিরে চলিয়া যায়, আর সেও বাহিরে আসিতে পারে। রাত ভোর হইলে ঘ্যাঁঘা জলখাবার খাইয়া বেড়াইতে বাহির হইল; ঘেঁঘীও মানিককে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া বিদায় করিল।

এরপর প্রথমেই সেই বুড়োর সঙ্গে দেখা। বুড়ো জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা কিছু হলো?' মানিক বলিল, 'সে হবে এখন, আগে পার কর; আমার বড্ড তাড়াতাড়ি।' বুড়ো মানিককে কাঁধে করিয়া পারে লইয়া গেলে পর ডাঙায় উঠিয়া মানিক বলিল, 'এরপর একজনকে মাঝখানে নামিয়ে দিয়ো; তা হলেই তোমার ছুটি।' এই কথা শুনিয়া বুড়ো মানিককে অনেক ধন্যবাদ দিয়া বলিল, 'ভাই, তুমি আমার এমন উপকারটা করলে; আমার ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাকে আর দুবার কাঁধে করে পার করি।' মানিক বলিল, 'তুমি দয়া করে যা করেছ তাই ঢের; আর আমার বুড়ো মানুষের কাঁধে চড়ে কাজ নেই। আমি এখন দেশে চললাম।'

চারদিন চলিয়া মানিক যাদের মেয়ের অসুখ ছিল তাহাদের বাড়িতে আবার অতিথি হইল। বাড়ির কর্তা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,

'ঘ্যাঁঘা কিছু বলেছে ?' মানিক বলিল, 'হ্যাঁ।' এই বলিয়া সে ঘরের কোণ হইতে কোনা ব্যাঙের গর্ত খুঁড়িয়া যেই চুল বাহির করিল, আর অমনি যে মেয়ে দুই বৎসর যাবৎ মড়ার মতন পড়িয়া ছিল, সে উঠিয়া হাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাতে বাড়ির সকলে যে কত খুশি হইল, তাহা কি বলিব। মানিককে তাহারা এত টাকা দিল যে, দশটা উটে তাহা বহিতে পারে না।

যাহাদের চাবি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহারাও চাবি পাইয়া মানিককে ঢের টাকাকড়ি দিল। এই সমস্ত টাকাকড়ি লইয়া সে দেশে ফিরিয়া রাজামহাশয়কে ঘ্যাঁঘাসুরের পালক বুঝাইয়া দিল। দেশের সকল লোক ইহাতে মানিকের যার পর নাই প্রশংসা করিল। তাহারা সকলেই বলিল যে, মানিককে এত ক্লেশ দেওয়া রাজার ভারি অন্যায় হইয়াছে, তাহার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে আর দেরি করা উচিত নয়। রাজামহাশয় আর কি করেন, শেষটা অনেক কষ্টে রাজি হইলেন।

তারপর খুব জাঁকজমকের সহিত রাজকন্যা ও মানিকের বিবাহ হইল। মানিক এত টাকাকড়ি লইয়া আসিয়াছে যে, তাহাতেই তাহার পরম সুখে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু রাজামহাশয়ের ইহাতে ভারি হিংসা হইল। তিনি মনে করিলেন, 'ঘ্যাঁঘাসুরের দেশে গেলে যদি এত টাকা নিয়ে আসা যায়, তবে আমিও সেইখানে যাব।'

এই ভাবিয়া রাজামহাশয় ঘ্যাঁঘার মুল্লুকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেখানে পেঁছাইতে পারেন নাই। কারণ, অজানা নদী পার হইবার সময়, সেই বুড়ো তাঁহাকে মাঝখানে নামাইয়া দিল। রাজামহাশয় প্রথমে আশ্চর্য হইলেন, তারপর চটিয়া লাল হইলেন, তারপর বুড়োকে গালি দিতে লাগিলেন, তারপর হাত জোড় করিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুড়ো তাহার কথায় কান দিবার অবসরই পায় নাই ; ততক্ষণ সে ডাঙ্গায় উঠিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি পানে ছুটিয়াছে, তাড়াতাড়িতে রাজামহাশয়কে ছুটি পাইবার কৌশলটি বলিয়া দিবার কথা তাহার মনে হয় নাই। সুতরাং রাজামহাশয় আজও সেই স্থানেই মানুষ পার করিতেছেন।

পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে কেহ যদি কখনো ঘ্যাঁঘাসুরের মুল্লুকে যান, তাহা হইলে দয়া করিয়া বেচারাকে সেই কথাটা বলিয়া দিবেন। কিন্তু পুনরায় নদীর এপারে ফিরিয়া না আসিয়া এ কথা বলিবেন না, কারণ তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইতে পারে।

## চালাক চাকর

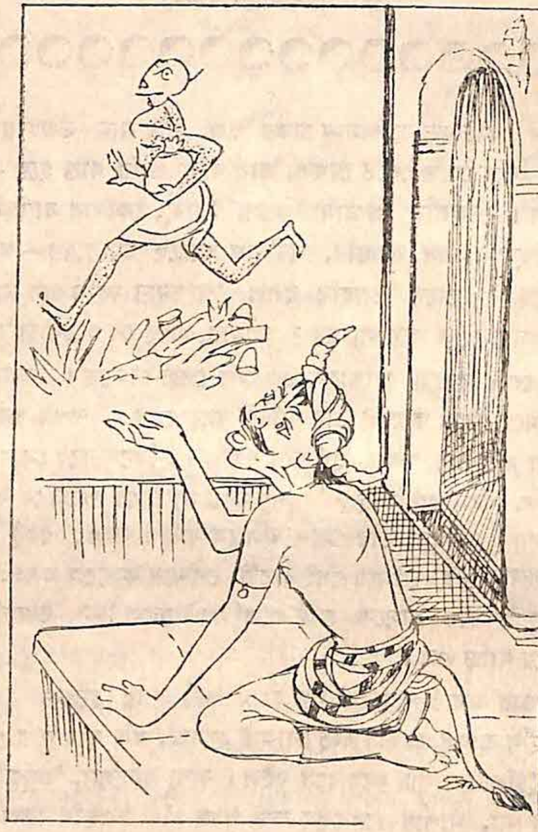
এক বাবুর একটি বড় বুদ্ধিমান চাকর ছিল, তার নাম ভজহরি। একদিন ভজহরি পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখল, তার বাবু ভারি ব্যস্ত হয়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছেন। ভজহরি জিজ্ঞাসা করল, 'বাবু, কোথায় যাচ্ছেন?' বাবু বললেন, 'শিগ্‌গির এস ভজহরি, সর্বনাশ হয়েছে আমাদের—আমাদের ঘরে আগুন লেগেছে!' তাতে ভজহরি বলল, 'আপনার কোন ভয় নাই বাবু, ও মিছে কথা। আগুন কি করে লাগবে? আমার কাছে যে ঘরের চাবি রয়েছে!'

ভজহরি গেল কলুর দোকানে, এক সের তেল কিনতে। কলু তাকে এক সের তেল মেপে দিল, তাতেই তার বাটিটি ভরে গেল। তখন ভজহরি বলল, 'ফাউ দেবে না?' কলু বলল, 'হ্যাঁ দেব বইকি। কিসে করে নেবে?' ভজহরি ভাবল, তাই ত, কিসে করে নিই? কিন্তু ফাউ না নিয়ে গেলে যে বাবু আমাকে বোকা ভাববেন! তখন তার মনে হল যে বাটির তলায় একটু গর্ত আছে। অমনি সে বাটিটি উল্টিয়ে নিয়ে সেই গর্তটা দেখিয়ে কলুকে বলল, 'এতে ফাউ দাও।' কলু হাসতে হাসতে সেই গর্তে ফাউ ঢেলে দিল, ভজহরি মহাখুশি হয়ে তাই নিয়ে বাড়ি এল।

ভজহরি তার বাবুর সঙ্গে নৌকায় চড়ে নদী পার হচ্ছে। নৌকায় ঢের লোক; ভজহরি ভাবল, নৌকা বড্ড বোঝাই হয়েছে, যদি ডুবে যায়! এই ভেবে, সে তাদের পুঁটলিটা মাথায় করে বসে রইল। বাবু বললেন, 'ভজহরি, পুঁটলিটা নামিয়ে রাখ না, মাথায় করে কেন কষ্ট পাচ্ছ?' ভজহরি বলল, 'আজ্ঞে না, নৌকা বড্ড বোঝাই হয়েছে, পুঁটলিটা তাতে রাখলে আরো বোঝাই হয়ে যাবে।'

বাড়িতে চোর এসেছে, ভজহরি তা টের পেয়েছে। সে ভাবল, বেটাকে ধরতে হবে। তখন সে মাথায় শিং বেঁধে লেজ পরে উঠানের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মতলবখানা এই যে, চোর নিশ্চয় তাকে দেখে ছাগল মনে করে তাকে চুরি করতে আসবে, তখন সে তাকে জড়িয়ে ধরবে। চোর এল, ঘরে গিয়ে ঢুকল, ভজহরি উঠানের কোণ থেকে বলল, 'ম্যা-আ-আ-আ!' চোর ঘরের সব জিনিসপত্র বাইরে এনে একটি পুঁটুলি বাঁধল, ভজহরি তাকে বলল, 'ম্যা-আ-আ-আ!' তা চোর সেই পুঁটুলি নিয়ে আঁস্তাকুড়ের উপর দিয়ে ছুট দিল। তখন ভজহরি হেসে গড়াগড়ি দিয়ে বলল, 'ব্যাটা কি বোকা, আঁস্তাকুড় মাড়িয়ে গেল, এখন বাড়ি গিয়ে স্নান করতে হবে!'

রামধন লোকটি বেশ সাদাসিধে, কিন্তু একটু রাগী। সে গিয়েছে চোরদের বাড়ি চাকরি করতে। রাত্রে চোরেরা এক জায়গায় চুরি করতে গেল, রামধনকেও



সঙ্গে নিল। সেখানে রামধনকে একটা কচুবনে বসিয়ে দিয়ে তারা বলল, 'তুই এইখানে চুপ করে বসে থাক, আমরা চুরি করে জিনিস নিয়ে এলে সেগুলো বয়ে নিয়ে যাবি।' রামধন বলল, 'আচ্ছা।'

চোরেরা সিঁদ কাটছে, রামধন কচুবনে বসে আছে। সেখানে বেজায় রকমের মশা, রামধনকে কামড়িয়ে পাগল করে তুলল। বেচারা অনেকক্ষণ সয়ে চুপ করে ছিল, তারপর চটাস্ চটাস্ করে দু-একটা মারতে লাগল। শেষে রেগে গিয়ে লাঠি দিয়ে মেরে কচুবন তোলপাড় করে তুলল। সেই শব্দে বাড়ির লোক সব জেগে গিয়ে বলল, 'কে রে তুই, এত গোলমাল করছিস?' রামধন বলল, 'আমি রামধন গো।' বাড়ির লোকেরা বলল, 'ওখানে কি করছিস?' রামধন বলল, 'আপনাদের ঘরে যে সিঁদ হচ্ছে।'

তখন ত আর ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকির সীমাই রইল না। চোরেরা আর

চুরি করবে কি, তাদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসাই ভার হলো। ঘরে এসে তারা তারপর অবশ্যি রামধনের উপর খুবই চোটপাট লাগাল। সে বলল, 'কি করি ভাই, আমার রাগ হয়ে গেল, যে ভয়নক মশা!' চোরেরা বলল, 'আচ্ছা, খবরদার! আর কখনো এমন করিস নে।'

পরদিন চোরেরা আবার রামধনকে নিয়ে চুরি করতে গিয়েছে। এবারে রামধন ঠিক করে এসেছে যে, মশায় তাকে খেয়ে ফেললেও আর সে টু' শব্দটি করবে না। আর চোরেরাও বেশ বুঝে নিয়েছে যে, রামধনকে বাইরে রেখে ঘরে ঢুকলে বড়ই বিপদ হতে পারে। তাই তারা ভেবেছে, ওকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তারা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

একটা বাড়ির কাছে এসে চোরেরা বাইরে থেকেই কেমন করে তার একটা দরজার ছিটকিনি খুলে ফেললে, তারপর রামধনকে বলল, 'এখন তুই চুপি-চুপি ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র বার করে আন। দেখিস, কোন শব্দ করিস না যেন।'

রামধন দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে গেল। দরজার কব্জা ছিল মরচে ধরা, তাই দরজা ঠেলতেই সেটা বলল, 'ক্যাঁচ্।' রামধন থতমত খেয়ে অমনি থেমে গেল। তারপর আবার যেই ঠেলতে যাবে, অমনি দরজা আবার বলল, 'ক্যাঁচ্!' রামধন তাতে দাঁত খিঁচিয়ে 'আঃ!' বলে আবার থেমে গেল। তারপর রামধন কিছুতেই আর রাগ সামলাতে পারল না। তখন সে পাগলের মত হয়ে প্রাণপণে সেই দরজা নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ক্যাঁচ্!—ক্যাঁচ্!!—ক্যাঁচ্!!!—ক্যাঁচ্!!!!' তারপর কি হলো বুঝতেই পার।

এ-সব ত শুধু গল্প, এবার একটি সত্যিকারের চাকরের কথা বলি। তার নাম, ধরে নাও যেন কেনারাম। কেনারাম সেজেগুজে একটা বোটের ছাতে উঠে বসে আছে—তার বাবুর সঙ্গে এক জায়গায় তামাশা দেখতে যাবে। খানিক বাদেই বোটের ভিতর থেকে জুতোর শব্দ এল; কেনারাম বুঝল বাবু বেরুচ্ছেন, এই বেলা যেতে হবে। সে অমনি তাড়াতাড়ি বোটের ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ল, আর পড়ল ঠিক তার বাবুর ঘাড়ে।

প্রথমে যখন কেনারাম আসে তখন একজন পুরনো চাকর বলেছিল, 'বাবু কাছারি থেকে এলে রোজ তাঁকে পান খেতে দিও।' সেদিন বাবু কাছারি থেকে এসেই পায়খানায় গেলেন, কেনারামও তাড়াতাড়ি সেইখানে গিয়েই তাঁকে বলল, 'বাবু পান এনেছি।'

# বেচারাম কেনারাম

## প্রথম দৃশ্য

( জামা রিপু করিতে করিতে কেনারাম চাকরের প্রবেশ )

কেনা। ঐ যা! আবার খানিকটা ছিঁড়ে গেল! ছুঁতেই ছিঁড়ে যায়, তা রিপু করব কি? ভাল মনিব জুটেছে যাই হোক, এই জামাটা দিয়েই ক'বছর কাটাল। তিনবছর ত আমিই এইরকম দেখছি, আরো-বা ক'বছর দেখতে হয়। তবু যদি চারটে পেট ভরে খেতে দিত। তাও কেমন? সকালে মনিব চারটি ভাত খান, আমি ফ্যানটুকু খাই, রাত্তিরে তিনি হাঁড়ি চাটেন, আমি শুঁকি। তার উপর শ্রবণশক্তিটি কি প্রখর! বাড়িওয়ালা সেদিন টাকার জন্যে কি-ই না বললে। বাড়িওয়ালা বলে, 'টাকা দাও, ঢের টাকা বাকি।' মনিব বলেন, 'তা ভাল ভাল, তোমার বাড়ি আজ নেমন্তন্ন?' বাড়িওয়ালা বলে, 'এমন করে ভাড়া ফেলে রাখলে চলে কই?' মনিব বলেন, 'তা আচ্ছা, চাকরটিও সঙ্গে যাবে।' বাড়িওয়ালা বেচারী রেগেমেগে চলে গেল। বড়লোক হতে হলে বোধহয় আমার মনিবের মতই কত্তে হয়, কিন্তু এঁর কাছে থেকে বড়লোক হওয়ার কায়দাটাই শেখা হবে। বড়লোক হওয়ার ভরসা বড় নেই। রাখবার সময় কত আশাই দিয়েছিলেন, আর আজ এই তিন বছরে একটি পয়সা মাইনে দিলেন না। দেখি, আজ যদি মাইনে না দেয়, তবে আর এর কাজ করা হচ্ছে না।

[ প্রস্থান ]

( বেচারামের মনিবের প্রবেশ )

মনিব। চাকরটা জামাটা নিয়ে কত কথাই বলছিল! সব শুনেছি। বেটা ভেবেছে আমি সত্যিই কালা। আরে আমার মত যদি কান থাকত তা হলে আর চাকরি কত্তে হ'ত না। আমি যা করে খাই, তাই করে খেতে পাও। ঘরের ভিতরে ক'জন লোক, ক'জন জেগে আছে, ক'জন ঘুমুচ্ছে, দাওয়ায় কান পেতে সব বুঝে নি। কোথায় সিন্দুকের ভেতর আরশুলা কড়কড় কচ্চে, বাইরে থেকে বুঝে নি। বাপু হে! কানে শুনি, কানে শুনি। কানে শোনাটা ত বেশ ভালই, কিন্তু না শোনার যে সুবিধা আছে, তা ত বুঝবে না? এই সেদিন বাড়িওয়ালা বেটা ফাঁকি দিয়ে টাকা আদায় কত্ত। কানে না শোনার কত সুবিধা দেখ, পাওনাদারদের টাকা দিতে হয় না, বাড়ি ভাড়া দিতে হয় না, চাকরের মাইনা দিতে হয় না—

( কেনারামের প্রবেশ )

কেনা ( উচ্চৈঃস্বরে )। মশাই, হয় এই তিন বছরের মাইনে দিন, না-হয় আপনার এইসব রইল, আমি চললেম।

মনিব। ডাকওয়ালা? চিঠি? দেখি?

কেনারাম ( স্বগত )। এই মুশকিল কল্লে। তা, এবারে বাপু এক ফন্দি এঁটেছি—সব লিখে এনেছি। ( প্রকাশ্যে ) চিঠিই বটে, এই নিন্।

মনিব ( পাঠ )। 'মনিব মহাশয়, কানে শুনেন না, কিন্তু পড়িতে অবশ্যই পারেন। তিনটি বৎসের বেতন চুকাইয়া বিদায় দিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীকেনারাম চাকর।'—তাই ত' তোমার বেতনটা দিতে হল। তা রাখবার সময় ত কোন বন্দোবস্ত হয় নি, কাজকর্মও তেমন ভাল করে কর নি। তিন বছরে তিন পয়সার বেশি তোমার প্রাপ্য হয় না। তা এই নাও। ( তিন পয়সা প্রদান ও ধাক্কা দিয়া বহিষ্করণ )

## দ্বিতীয় দৃশ্য

( কেনারামের প্রবেশ )

কেনা। এই বড়লোক হলাম আর কি? তিন-তিন বছরের মাইনে; ঢের টাকা—ঢের টাকা। এক দুই তিন, চার পাঁচ ছয়, সাত আট নয়, দশ এগার বার। ( পয়সা তিনটি পকেটে স্থাপন )

( ছদ্মবেশী স্বর্গীয় দূতের প্রবেশ )

স্বর্গীয় দূত। আরে ভাই, তোর যে ভারি ফূর্তি?

কেনা। কে ও? ছোট্ট মানুষ? দাঁড়াও, চশমাটা বার করে নি।

দূত। কেন? চোখে কম দেখ্ বুঝি?

কেনা। তা কেন? বড়লোক হয়েছি যে, ছোট মানুষ আর তেমন চট করে চোখে মালুম পড়ে না।

দূত। বটে। এত বড়লোক কি করে হলি ভাই?

কেনা। ( পকেট চাপড়াইয়া )—তি—ন—টি ব—ছ—রের মা—ই—নে। ( এক-একটি পয়সা ( বহিষ্করণ ও গম্ভীরভাবে গণন ) এ—এ—এ—ক, দু—উ—ই, তি—ই—ই—ইন ( পকেট উল্টাইয়া গম্ভীরভাবে অবস্থান )।

দূত। তাই ত ভাই, এত টাকা নিয়ে তুই কি করবি? আমি গরীব, আমাকে কিছু দে-না।

কেনা। নিবি? এই নে; ভগবান আমাকে খেটে খাবার শক্তি দিয়েছেন, খেটে খাব। ( পয়সা তিনটি প্রদান )

দূত। তুই ভাই বেশ লোক, তোর মনটা খুব খোলা। আমি ঈশ্বরের দূত, ভাল লোক দেখলে পুরস্কার দি। তোর ব্যবহারে খুব খুশি হয়েছি, তুই কি চাস্ বল্; যা চাস্ তাই পাবি।

কেনা। অ্যাঁ! আপনি ঈশ্বরের দূত? তবে ত আপনার সম্মুখে আমি বড় বেয়াদবি করেছি?

দূত। তোর কিছু ভয় নেই, 'তুই আমাকে 'তুই' তুমি' যা খুশি বল্, কিছুতেই বেয়াদবি হবে না; এখন তুই কি নিবি বল্।

কেনা। তা দাদা, যদি দেবে তবে এমন একখানা বেয়ালা দাও যে, যে তার আওয়াজ শুনবে তাকেই তিড়িং তিড়িং করে নাচতে হবে।

দূত। (ঝুলি হইতে বেহালা বাহির করিয়া) এই নে।

কেনা। বাঃ, বেশ হলো, আমাকে ত সঙ্গে সঙ্গে নাচতে হবে না?

দূত। না, সে ভয় তোর নেই, যা এখন ফূর্তি করগে। (দূতের প্রস্থানোদ্যম ও কেনারামের বাদ্যোদ্যম) আরে দূর হতভাগা, আমারই ওপর পরীক্ষা করে বসলি।

কেনা। তুমি যে ফূর্তি করতে বললে দাদা।

দূত। আমি আগে যাই, তারপর করিস।

কেনা। আ—চ্ছা।

## তৃতীয় দৃশ্য

(বেচারামের প্রবেশ)

বেচা। ঐ ঝোপটাতে ফেলে গিছলুম। পুলিশ বেটা এমনি তাড়া করে ধরেই ফেলেছিল আর কি। চট করে টাকার থলেটি ঐ ঝোপটাতে ফেলে পালালুম, এখন পেলে বাঁচি। (থলি খুঁজিতে ঝোপে প্রবেশ) বাপ্‌রে, কি ভয়ানক কাঁটা—এই পেয়েছি।

(কেনারামের প্রবেশ)

কেনা (স্বগত)। ঐ যে বেচুবাবু কাঁটাবনে ঢুকেছেন; এইবারে একটা গৎ বাজিয়ে নি, পুরোনো মনিবটে। (বেহালাবাদন)

বেচা (নৃত্য করিতে করিতে)। আরে! আরে! ও কী? উঃ! আ! আরে, তুমি কি—উঃ হু হু—আরে আর না—জামাটা—উঃ—হু—জামাটা গেল যে, উঃ—গায়ের চামড়াও যে ছিঁড়ে গেল—উঃ!

কেনা। আজ্ঞে, আমি আপনার বকেয়া চাকর কেনারাম, মাইনে চুকিয়ে দিয়েছেন বলে কি এমন মনিবকে ভুলতে পারি? আপনাকে বাজনা শুনিয়ে আমার বেয়ালা সার্থক হলো। (পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে বাদন)

বেচা (নৃত্য)। কি মুশকিল! বাবা কেনারাম, রক্ষে কর বাবা। এ কি বাজনা যে শুনলেই নাচতে হয়! বাবা আর কাজ নেই, আমি খুব খুশি হয়েছি, এই টাকার থলি তোমায় দিচ্ছি, তোমার মাইনে এ থেকে পুষিয়ে নাও, দোহাই বাবা, আমায় নাচিও না। (টাকার থলি কেনারামের হাতে প্রদান)

কেনা (বিনীত অভিবাদন করিয়া)। আজ্ঞে, তা হবে কেন? আপনার মত

মনিব না হলে গুণ কে বোঝে! দেখছি বেয়ালার আওয়াজে আপনার 'কানে খাট'র ব্যারামটাও বেশ সেরে গেল। ভাল ভাল, আবার এ ব্যারামের সূত্রপাত দেখলে আমায় খবর দেবেন, আমি বেয়ালা নিয়ে এসে চিকিৎসা করব। ( দীর্ঘ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান )

বেচা। হতভাগা বেটা, লক্ষ্মীছাড়া বেটা, জোচ্চোর, বাটপাড়, ডাকাত—বেটাকে দেখাচ্ছি। পুলিশ! পুলিশ! চোর—চোর!

## চতুর্থ দৃশ্য

( বিচারালয়। ব্যস্তভাবে বেচারামের প্রবেশ )

বেচা। দোহাই হুজুর, আমাকে ধনে-প্রাণে মেরেছে। ও হো হো (ক্রন্দন)

বিচারক। আরে ব্যাপার কি? তোমার কি হয়েছে?

বেচা। ( কাঁটার আঁচড় ও ক্ষতবিক্ষত শরীর দেখাইয়া )—আর কি হবে, আমি ধনে-প্রাণে গিয়েছি। বড় রাস্তার ধারে ঐ কেনা বেটা আমাকে মেরে ধরে টাকাকড়ি কেড়ে নিয়েছে—এঁ হেঁ হেঁ ( ক্রন্দন )। বেটাকে তিন বছর আমি খাইয়ে মানুষ কল্লুম, আর তার এই প্রতিফল দিলে! বেটা দিনরাত বেহালা নিয়ে ফেরে, এখনি ধরতে পাঠান, তাকে দেখলেই চিনতে পারবেন।

বিচারক। চারজন লোক এখনি গিয়ে কেনারামকে ধরে নিয়ে এসো।

( কেনারামকে লইয়া চারজন লোকের প্রবেশ )

বেচা। ঐ! ঐ! ঐ বেটা হুজুর! ঐ কেনারাম বেটা আমার সর্বনাশ করেছে, বেটাকে আচ্ছা করে—

বিচারক। চুপ! ( কেনার প্রতি ) তুমি একে মেরে এর টাকা কেড়ে নিয়েছ?

কেনা। সে কি। হুজুর! উনি আমার বেয়ালা বাজানো শুনে আমায় এক থলি টাকা পুরস্কার দিয়েছেন—আমি যথার্থ বলছি।

বিচারক। ওর যে চেহারা দেখছি, তাতে ও যে বেহালা শুনে তোমায় এতগুলো টাকা দিয়েচে তা আমি কিছুতে বিশ্বাস কত্তে পারিনে। আর ওর গায়েও এইসব দাগ দেখছি। সুতরাং প্রমাণ হচ্ছে তুমিই ওকে মেরে টাকার থলি কেড়ে নিয়েছ। এ ডাকাতি, ডাকাতির শাস্তি ফাঁসি—তোমার ফাঁসি হবে। এখন তোমার যদি কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে তা বল।

কেনা। হুজুর, আমার আর কোন সাধ নেই। খালি জন্মের মত বেয়ালাখানা একবার বাজাতে চাই।

বেচা। সর্বনাশ! হুজুর এমন হুকুম দেবেন না।

চাপরাসী। ( বেচারামকে রুলের গুঁতা মারিয়া ) চুপ্ রও!

বিচারক। আর কোন সাধ তোমার নেই? আচ্ছা, বাজাও।

( কেনারামের উৎসাহের সঙ্গে বেহালাবাদন ও বিচারক হইতে চাপরাসী পর্যন্ত সকলের নৃত্য। )

বিচারক ( হাঁপাইতে হাঁপাইতে )। আরে বাপ্‌রে! থাম্ থাম্ ; শিগ্‌গির থাম ; তোকে বেকসুর খালাস দিচ্ছি, প্রাণ যায়—থাম্। বাপরে, এ কি রকম বেহালা বাজনা !

কেনা ( সেলাম করিয়া )। হুজুর ! বেচুবাবুকে এখন সমস্ত ঘটনা বলতে হুকুম হয়। নইলে আমি পুনরায় বেয়ালায় ছাড় দিলাম।

বিচারক। ( বেচারামের প্রতি সরোষে )। বল্ বেটা কি হয়েছিল, সত্যি করে এখনি বল্ !

বেচা। ওগো, না গো, আর বেহালা ধরো না। ও টাকা আমিই দিয়েছি—দিয়েছি।

বিচারক। তুই এত টাকা কোথায় পেলি, বল্।

বেচা। আমি—আমি—

কেনা। এই বেয়ালা ধরেছি !

বেচা। না, না—আমি, হুজুর আমি—কাল রাত্তিরে হুজুর, চুরি করেছিলাম। দোহাই হুজুর।

কেনা। ধর্মের ঢাক আপনি বাজে। দেখলেন ত বেচুবাবু ?

বিচারক। পঁচিশ ঘা বেত মারো।

## ঝানু চোর চানু

ছেলেবেলা থেকেই চানু শয়তানের একশেষ, আশপাশের লোকজন তার জ্বালায় অস্থির। চানুর বাবা বড় গরিব ছিল। চানু ভাবল, বিদেশে গিয়ে টাকা-পয়সা রোজগার করে আনবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ, একদিন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। খানিক দূর গিয়েই বনের ভিতর দিয়ে একটা নির্জন রাস্তা—চানু সেই রাস্তা ধরে চলল। সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যার সময় পথের ধারেই একটি কুঁড়েঘর ছিল, সেখানে এসে উপস্থিত।

ঘরের ভিতরে আগুনের পাশে একটি বুড়ি বসে ছিল, চানুকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই বাপু তোমার ?'

চানু বলল, 'চাইব আর কি, কিছু খাবার-দাবার চাই, আর একটি বিছানা চাই !'

বুড়ি বলল, 'সরে পড় বাপু, এখানে কিছু পাবে না। আমার ছয়টি ছেলে, সারাদিন খেটেখুটে তারা এখনই বাড়ি ফিরবে। তোমাকে এখানে দেখতে পেলে তারা তোমার গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে।'

চানু। 'সেটা আর বেশি কথা কি? এই ঠাণ্ডায় বাইরে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মরার চাইতে গায়ের চামড়া তুলবে সেইটাই বরং ভাল।'

বুড়ি দেখল সে সহজ লোকের পাল্লায় পড়ে নি; কি আর করে, তখন চানুকে পেট ভরে খেতে দিলে। শুতে যাবার সময় চানু বুড়িকে বলল, 'দেখ বুড়ি, তোমার ছেলেরা এসে যদি আমার ঘুম ভাঙায় তা হলে কিন্তু বড্ড মুশকিল হবে বলছি।'

পরের দিন ঘুম ভাঙলে পর চানু দেখল ছয় জন অতি বদ-চেহারার লোক তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে—সে তাদের দেখে গ্রাহ্যও করল না।

দলের সর্দারটি তখন চানুকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে হে বাপু? কি চাও এখানে?'

চানু। 'আমার নাম সর্দার চোর, আমার দলের জন্য লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমরা যদি চালাক চতুর হও তা হলে তোমাদের অনেক বিদ্যে শিখিয়ে দেব।'

সর্দার বলল, 'আচ্ছা বেশ, তুমি তা হলে এখন উঠে একটু খাও-দাও, তারপর দেখা যাবে এখন কে সর্দার!'

বিছানা থেকে উঠে সকলের সঙ্গে বসে চানু খেল। ঠিক তারপরই সকলে দেখল একটা সুন্দর ছাগল নিয়ে একজন কৃষক বনের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তখন চানু বলল, 'আচ্ছা, তোমাদের কেউ কোন রকম জবরদস্তি না করে শুধু ফাঁকি দিয়ে ঐ লোকটার ছাগলটা নিয়ে আসতে পার?'

একজন একজন করে সকলেই বলল, 'না ভাই, আমরা কেউ তা পারব না।'

চানু। 'ব্যস্, তা হলেই দেখ আমি তোমাদের সর্দার কিনা—আমি এখনি ছাগলটা নিয়ে আসছি।' এই বলে সে তখনই বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড়ে তার ডান পায়ের জুতোটা রেখে দিল, তারপর ছুটে গিয়ে কিছু দূরের রাস্তায় আর একটা মোড়ে বাঁ পায়ের জুতোটাও রেখে রাস্তার ধারে বনের ভিতর চুপ করে লুকিয়ে রইল।

খানিক পরেই সেই কৃষক এসে প্রথম জুতোটা দেখে মনে করল, 'খাসা জুতোটা পড়ে রয়েছে, কিন্তু এক পাটি দিয়ে কি হবে, আর এক পাটিও থাকলে ভাল হত।'

খানিক দূরে এগিয়ে গিয়ে কৃষক আর-এক পাটি জুতো দেখে ভাবল, আমি কি বোকা, ও পাটিটা যদি নিয়ে আসতাম। যাই, তাহলে ওটা নিয়ে আসি গিয়ে। এই ভেবে একটা গাছে ছাগলটা বেঁধে সে চলল জুতো আনতে। এদিকে চানু কিন্তু ছুটে গিয়ে আগেই সেটা নিয়ে এসেছে। তারপর কৃষক ছাগলটাকে বেঁধে রেখে যখন চলে গেল তখন চানু বাঁ পায়ের জুতোটা নিয়ে ছাগলটার বাঁধন খুলে সেটাকেও নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে বুড়ির কুটিরে এসে উপস্থিত।

কৃষক গিয়ে প্রথম জুতোটা পেল না, ফিরে এসে পরের জুতোটাও পেল

না, তার উপর আবার যখন দেখল যে ছাগলটিও সেখানে নেই, তখন সে ভাবল, এখন করি কি? গিন্নিকে যে বলে এসেছি বাজারে ছাগলটা বেচে তার জন্যে একখানা গায়ের চাদর কিনে নিয়ে যাব! যাই তা হলে, চুপচাপ গিয়ে আর-একটা জন্তু নিয়ে আসি, তা নইলে যে ধরা পড়ে যাব, গিন্নি ভাববে আমি বোকার একশেষ।

এদিকে চানু ছাগল নিয়ে বুড়ির বাড়িতে যখন গেল তখন সেই চোরেরা ত একেবারে অবাক! চানুকে কত করে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কিছুতেই সে বলল না কি করে সেই ছাগল আনল।

খানিক বাদেই সেই কৃষক একটি মোটাসোটা সুন্দর ভেড়া নিয়ে এসে উপস্থিত। চানু বলল, 'যাও দেখি, কে জবরদস্তি না করে ভেড়াটা আনতে পার।'

ছয় চোরের সকলেই অস্বীকার করল। তখন চানু বলল, 'আচ্ছা, দেখি, আমি পারি কি না, আমাকে একটা দড়ি দাও দেখি।' দড়ি নিয়ে চানু বনের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

এদিকে কৃষকটি তার ছাগল চুরির কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে চলেছে, মোড়ের কাছে এসে দেখে গাছের ডালে একটা মড়া ঝুলছে। মড়া দেখেই তার গায়ে কাঁটা দিল, 'রক্ষা কর বাবা! খানিক আগে ত এখানে মড়া-টড়া কিছু দেখতে পাই নি।' সামনের মোড়ে গিয়ে কৃষক দেখল, আর একটা মড়া গাছের ডালে ঝুলছে। 'রাম রাম রাম—এ হলো কি? আমার মাথাটা গুলিয়ে যায় নি ত?' কৃষক তাড়াতাড়ি চলল। কিন্তু কি সর্বনাশ! রাস্তার আর-একটা মোড়ে গিয়ে দেখে সেখানেও একটা মড়া ঝুলছে! পর পর তিন-তিনটে মড়া এতটা কাছাকাছি ঝুলছে দেখে তার মনে সন্দেহ হলো—'নাঃ, এ কখনই হতে পারে না। আমারই বোধ করি মাথা খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, দেখে আসি আগের মড়া দুটো এখনো ঝুলছে কি না।' এই বলে ভেড়াটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে কৃষক সবে মাত্র মোড়টা ফিরেছে তখন ডালের মড়া চট করে নেমে এসে ভেড়াটাকে নিয়ে বনের ভিতর দিয়ে একেবারে বুড়ির বাড়ি গিয়ে হাজির।

এদিকে কৃষক গিয়ে দেখল মড়া-টড়া কিছুই গাছে ঝুলছে না। ফিরে এসে দেখল তার ভেড়াটাও নেই, কে জানি দড়ি খুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। তখন তার মনটা কেমন হলো তা বুঝতেই পার। বেচারি মাথা খুঁড়তে লাগল—'হায়, হায়! কার মুখ দেখে আজ বেরিয়েছিলাম, এখন গিন্নি কি বলবে? সমস্ত সকালটাই মাটি হয়ে গেল; ছাগল, ভেড়া দুটোই গেল, এখন করি কি? একটা কিছু এনে বাজারে বিক্রি করে গিন্নির চাদর না কিনলেই চলবে না। আসবার সময় দেখেছিলাম ষাঁড়টা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, যাই, সেটাই নিয়ে আসি —গিন্নিও দেখতে পাবে না।'

চানু যখন চোরদের বাড়ি ভেড়া নিয়ে গিয়ে উপস্থিত, তখন চোরদের

আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। সর্দার চোরটি বলল, 'আর-একটা যদি এ রকম চালাকি খেলতে পার তাহলে তোমাকেই আমাদের সর্দার করব।'

ততক্ষণে কৃষকটিও ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত। চানু বলল, 'যাও ত, জবরদস্তি না করে ষাঁড়টা ফাঁকি দিয়ে আনো তো দেখি?' কেউ যখন ভরসা পেল না তখন সে বলল, 'আচ্ছা, দেখি, আমি পারি কি না।' বলে চানু বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কৃষকটি খানিক দূরে এগিয়ে গিয়েই বনের মধ্যে একটা ছাগলের ডাক শুনতে পেল। ঠিক তার পরেই একটা ভেড়াও ডেকে উঠল। আর তাকে রাখে কে! একটা গাছে ষাঁড়টাকে বেঁধে রেখে ছুটল বনের ভিতর। কৃষক যত যায় ততই শোনে এই একটু আগেই ডাকছে, দেখতে দেখতে প্রায় আধ মাইল দূরে চলে গেল সে। তখন হঠাৎ সব চুপচাপ, ভেড়া-ছাগলের ডাক আর শুনতে পাওয়া গেল না। এদিক-সেদিক খুঁজে খুঁজে কৃষক একেবারে হয়রান হয়ে গেল—কোথা বা ছাগল আর কোথায় বা ভেড়া! বেচারি কাহিল হয়ে আবার ফিরে এল। কিন্তু কি সর্বনাশ! এসে দেখে ষাঁড়টিও সেখানে নেই। বন উলট-পালট করে ফেলল, কিছুতেই আর ষাঁড়ের খোঁজ পেল না।

চানু যখন ষাঁড় নিয়ে এসে উপস্থিত তখন চোরেদের মুখে আর কথাটি নেই। চোরেরা চানুকে তাদের সর্দার করল। তাদের আনন্দ দেখে কে, সমস্তটা দিন আমোদ করেই কাটিয়ে দিল। লুটপাট করে চোরেরা যা-কিছু আনত একটা গহ্বরের মধ্যে সব লুকিয়ে রাখত, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তারা চানুকে নিয়ে সেই সমস্ত টাকাকড়ি দেখিয়ে দিল—চানুই যে এখন তাদের সর্দার, তাকে সব না দেখালে চলবে কেন।

দলের সর্দার হবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে চোরেরা একদিন চানুকে বাড়ির জিম্মায় রেখে চুরি করতে গেল। খালি বাড়ি, চানু সেই শয়তান বুড়িকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তুমি যে এদের ঘর-সংসার দেখ, এরা তোমাকে তার দরুণ কিছু বকশিশ-টকশিশ দেয় না?'

বুড়ি। 'বকশিশ দেয়, না ওদের মাথা দেয়!'

চানু। 'বটে, কিচ্ছু দেয় না! আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে ঢের টাকা দেব।' বুড়িকে সঙ্গে করে চানু টাকার ঘরে গেল। জন্মেও বুড়ি এত ধন কোনদিন দেখে নি—হাঁ করে বুড়ি সেই রাশি রাশি টাকা আর মোহরের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বুড়ির আহ্লাদ আর ধরে না। হাঁটু গেড়ে মাটিতে পড়ে দুই হাতে টাকাগুলো ঘাটতে লাগল। সময় বুঝে চানুও তার পকেট বোঝাই ত করলই, তারপর একটা থলে মোহর দিয়ে ভর্তি করে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের দিক থেকে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিল—বুড়ি সেই টাকার ঘরেই আটকা পড়ে রইল।

বেরিয়ে এসেই চানু সুন্দর একটা পোশাক পরলে, তারপর সেই ছাগল,

ভেড়া আর ষাঁড়টাকে নিয়ে একেবারে সেই কৃষকের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। কৃষক তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির দরজায় বসে ছিল, কৃষক সেই হারানো জন্তুগুলিকে দেখে আহ্লাদে লাফিয়ে উঠল।

চান্দু বলল, 'এ জন্তুগুলো কার বলতে পার কি ?

'এগুলো আমাদের, আপনি কোথায় পেলেন মশায় ?'

'এই বনের ভিতর চরে বেড়াচ্ছিল। আচ্ছা, ছাগলটার গলায় একটা থলে ঝুলছে, তাতে দশটা মোহর রয়েছে—ওগুলিও কি তোমাদের ?'

'না মশায়। আমরা গরিব দুঃখী লোক, মোহর কোথা পাব ?'

'আচ্ছা, মোহরগুলোও তোমরা নাও, আমার কিছু দরকার নেই।' মোহরগুলি নিয়ে দুই হাত তুলে কৃষক চান্দুকে আশীর্বাদ করল।

সমস্ত দিন পথ চলে চান্দু প্রায় সন্ধ্যার সময় তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখল তার মা-বাবা বসে আছেন। চান্দু বলল, 'ভগবান আপনাদের ভাল করুন, আজ রাতটা আপনাদের বাড়ি থাকতে পারি কি ?'

'আপনার মত ভদ্রলোক কি এখানে থাকতে পারবেন ? আমরা যে বড্ড গরীব।'

চান্দু আর চুপ করে থাকতে পারল না, বলল, 'বাবা, তুমি কি তোমার ছেলেকেও চিনতে পারছ না ?'

চান্দুর মা-বাবা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, তারপর চান্দুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এমন সুন্দর পোশাক তুমি কোথা পেলে বাবা ?'

চান্দু বলল, 'পোশাক দেখেই অবাক হয়ে গেলে, তাহলে এই টাকাগুলো দেখে কি করবে ?' এই বলে চান্দু পকেট খালি করে সব মোহর মেঝের উপর রাখল।

এতগুলো মোহর দেখে চান্দুর বাবার বড্ড ভয় হলো। চান্দু তখন সব কথা খুলে বলল। তার আশ্চর্য বুদ্ধির কথা শুনে চান্দুর মা-বাপের আনন্দ আর ধরে না।

পরের দিন সকালে চান্দু বাবাকে বলল, 'বাবা, যাও জমিদার বাড়ি। বোলো গিয়ে, আমি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

চান্দুর কথা শুনে তার বাবার চোখ বড় হয়ে গেল, 'বলিস কি রে বেটা ! তা হলে যে আমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেবে।'

'না, তুমি বোলো যে আমি সর্দার চোর, আমার মত ঝানু চোর দুনিয়ায় নেই, জবরদস্ত ওস্তাদ চোরদের ফাঁকি দিয়ে লাখ টাকা রোজগার করে এনেছি। কিন্তু দেখো বাবা, যখন দেখবে জমিদারের মেয়েও সেখানে আছে তখনই এ-সব কথা বোলো।'

'আচ্ছা, এত করে যখন বলছ যাচ্ছি, কিন্তু কিছু হবে বলে মনে হয় না।'

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে চানুর বাবা ফিরে এল। চানু বলল, 'কি করে এলে বাবা?'

'নেহাত মন্দ নয়। মেয়েটি যে খুব অনিচ্ছুক তা ত মনে হলো না, বোধ করি বাবাজি তুমি এর আগেও তার কাছে এ প্রস্তাবটি করেছ—না? যা হোক, জমিদারমশায় বললেন, আসছে রবিবারে তাঁরা নাকি একটি হাঁস ভেজে খাবেন, তুমি যদি কড়া থেকে হাঁসটা বে-মালুম চুরি করতে পার, তা হলে তিনি তোমার কথা ভেবে দেখবেন।'

'এ আর তেমন শক্ত কাজ কি? দেখা যাবে এখন।'

রবিবার দিন জমিদার এবং বাড়ির সকলে রান্নাঘরে রয়েছেন—হাঁস ভাজা হচ্ছে, এমন সময় রান্নাঘরের দরজা খুলে গেল। একটা অতি কুৎসিত বুড়ো ভিখারি, পিঠে তার একটা মস্তবড় থলে ঝুলছে, সে এসে রান্নাঘরের দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'জয় হোক বাবা! আপনাদের খেয়ে-দেয়ে কিছু থাকলে আমি বুড়ো ভিখারি কিছু খেতে পাব কি?'

জমিদারমশায় বললেন, 'অবশ্যি পাবে। রান্নাঘরের দাওয়ায় একটু বোসো।'

জানালার পাশে একজন চাকর বসেছিল। খানিক পরে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, মস্তবড় একটা খরগোশ ছুটে বাগানের দিকে যাচ্ছে, ওটাকে মারলে হয় না?'

জমিদার ধমক দিয়ে বললেন, 'খরগোশ মারবার ঢের সময় মিলবে, এখন চুপ করে বসে থাকো।'

খরগোশটা বাগানে গিয়ে ঢুকল। ভিখারি পোশাক-পরা চানু থলের ভিতর থেকে আর-একটা খরগোশ ছেড়ে দিল। একটু পরেই চাকর আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবু বাবু, খরগোশটা এখনো রয়েছে—এখনো চেষ্টা করলে মারা যায়।'

আবার জমিদার ধমক দিলেন, 'চুপ করে থাক বলছি।'

খানিক বাদে চানু আরো একটা খরগোশ থলে থেকে বের করে ছেড়ে দিল। চাকরও চেঁচিয়ে উঠল—আর যায় কোথা। একজন একজন করে সবকটি চাকর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে খরগোশের পেছনে তাড়া করল, জমিদারমশায়ও বাদ পড়লেন না।

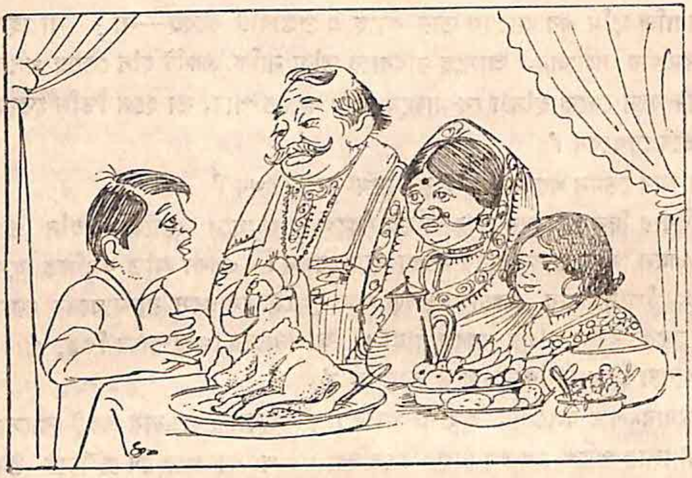
খরগোশ তাড়িয়ে সকলে ফিরে এসে দেখে ভিখারিও নেই, কড়ার মধ্যে হাঁসও নেই।

জমিদারমশাই বললেন, 'আচ্ছা ফাঁকিটা দিয়েছে চানু, সত্যি সত্যি আমাকে জব্দ করেছে।'

একটু পরেই চানুদের বাড়ি থেকে একজন চাকর এসে জমিদারমশায়কে বলল, 'আজ্ঞে, আমার মনিব বলে পাঠিয়েছেন, আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ি গিয়ে খাবেন।'

জমিদার বড় চমৎকার সাদাসিধে লোক ছিলেন, মনে একটুও অহংকার ছিল

না। স্ত্রীকে ও মেয়েকে নিয়ে চান্দুর বাড়ি গেলেন এবং সকলের সঙ্গে বসে নানা রকমের ভাল ভাল খাবার জিনিসের সঙ্গে তাঁর সেই হাঁসভাজাটিও খেলেন।



চান্দুর চালাকির কথা বলে জমিদারমশায় হাসতে হাসতে পাঁজরে ব্যথা ধরিয়ে ফেললেন। মেয়েটি ত আগে থেকেই চান্দুকে পছন্দ করত, এখন তার পোশাক দেখে এবং তার আদব-কায়দা দেখে মনে মনে আরো খুশি হলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর জমিদার বললেন, 'চান্দু, শুধু হাঁস চুরি করেই আমার মেয়ে পাবে না ; কাল রাত্রে আমার আস্তাবল থেকে আমার ছয়টি ঘোড়া যদি চুরি করতে পার তা হলে দেখা যাবে এখন। ছ'জন সহিস কিন্তু ছয়টি ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাহারা দেবে মনে রেখো।'

চান্দু বলল, 'আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব এখন।'

সোমবার রাত্রে জমিদারের আস্তাবলে ছয়জন সহিস ছয়টি ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। বেজায় ঠান্ডা, রক্ত যেন জমে যেতে চায় ; তাই প্রত্যেকের জামার পকেটে একটি করে মদের বোতল, খানিক পরে পরে একটু করে মদ খেয়ে গা গরম করে নিচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না, তাই সকলে মিলে মহা গল্প জুড়ে দিল—চান্দুর জন্য আস্তাবলের দরজা খোলাই ছিল। রাত যত বেশি হতে লাগল ঠান্ডাটাও যেন বাড়তে লাগল। মদে আর শানায় না, গায়ে কাঁপুনি ধরে গেল। এমন সময় ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে একটা কদাকার বুড়ি এসে দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'বাবা সকল, শীতে জমে গেলাম, এক মুঠো খড় দাও ত আস্তাবলের এককোণে রাতটা পড়ে থাকি, তা না হলে বুড়ো মানুষ, শীতে মরেই যাব।' বুড়ির পিঠে ছয়টা থলে, মুখে প্রায় দু আঙুল লম্বা দাড়ি—চেহারাটি কুৎসিতের একশেষ।

বুড়ি আস্তাবলের দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'লক্ষ্মী বাপ আমার, বুড়ো

মানুষ শীতে মরে গেলাম, ঐ কোণটাতে একটু জায়গা দাও, একমুঠো খড় নিয়ে পড়ে থাকব এখন।'

সহিসরা ভাবল, এলই বা বুড়ি, বেচারি শীতে জমাট বেঁধে গেল—ও ত আর কোন অনিষ্ট করবে না। আস্তাবলের কোণে খড় পেতে বুড়ি বেশ আরামে বসল। সহিসরা দেখল, বুড়ি খানিক পরেই একটা কালো বোতল বের করে একটু মদ খেল—তার মুখে আর হাসি ধরে না, যেন সে খুবই আরাম বোধ করছে। সহিসদের বুড়ি বলল, 'বাবা, তোমাদের সব মদ বোধ করি শেষ করে ফেলেছ, তা আমার কাছে ঢের আছে। তবে কিনা তোমরা পাছে কিছু মনে কর তাই তোমাদের দিতে ভরসা পাচ্ছি না।'

একে বেজায় শীত, তার উপরে সত্যি সত্যি তাদের মদ শেষ হয়ে গেছে, বুড়ির কথা শুনে সহিসরা যেন হাতে চাঁদ পেল—'সে কি বুড়িমা, তুমি যদি দাও তা হলে ত বেঁচে যাই, ঠাণ্ডায় মরে গেলাম।'

বুড়ির বোতলটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল, তবুও সহিসদের শীত গেল না। শয়তান বুড়ি তখন আর-একটি বোতল বের করে তাদের দিল। বোতলটার মদের সঙ্গে কি মেশানো ছিল, খাওয়া মাত্র সব কটা সহিস ঘোড়ার পিঠে গদির উপরে বসেই নাক ডাকিয়ে ঘুম দিল।

তখন বুড়ি উঠে সব কটা সহিসকে খড়ের উপর শুইয়ে ঘোড়াগুলোর পায়ে মোজা পরিয়ে দিল। তারপর সবগুলিকে নিয়ে একেবারে চানুদের বাইরের একটা ঘরে গিয়ে হাজির।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জমিদারমশায় প্রথমেই কি দেখলেন? তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে চানু ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে আর তার ঘোড়ার পিছনে অপর পাঁচটা ঘোড়াও চলেছে।

জমিদারমশায় অবাক হয়ে রইলেন, মনে মনে বললেন, গোল্লায় যা তুই চানু, আর যাদের চোখে ধুলো দিয়েছিস সে বেটারাও গোল্লায় যাক। আস্তাবলে গিয়ে সহিস বেটাদের জাগাতে জমিদারমশায়কে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

সকালবেলা জমিদারমশায় খেতে বসেছেন, চানুকেও ডেকে এনেছেন, খেতে খেতে চানুকে বললেন, 'কতগুলো বোকা-পাঁঠার চোখে ধুলো দিয়েছ। এতে বাহাদুরি নেই। আচ্ছা, আজ বেলা একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত আমি ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে ঘুরে বেড়াব, নিও দেখি বাপু আমার ঘোড়াটা চুরি করে। তা হলে বুঝব তুমি বাহাদুর এবং আমার জামাই হবার উপযুক্ত।'

চানু মাথা নিচু করে উত্তর করল, 'যে আজ্ঞে, একবার চেষ্টা করে দেখব এখন।'

একটার পর থেকে জমিদার ঘোড়ায় চড়ে পায়চারি করে করে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন। তিনটে বেজে গেল, চানুর টিকিটিও দেখতে পেলেন না। মনে করলেন, এবারে বাড়ি ফিরে যাবেন, এমন সময় তাঁর একটা চাকর পাগলের

মত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে হাজির—'কর্তা, শিগ্‌গির বাড়ি যান, মা-ঠাকরুনকে বুঝি বা আর দেখতে পেলেন না ; সিঁড়ির উপর থেকে তিনি পড়ে গেছেন। আমি চললাম ডাক্তারের বাড়ি।'

জমিদারের চোখ বড় হয়ে গেল, 'বলিস কি রে বেটা, কি সর্বনাশ ! ডাক্তারের বাড়ি যে ঢের দূর, তুই আমার ঘোড়াটা নিয়ে ছোট্ শিগ্‌গির।' ঘোড়ায় চড়ে চাকর তখন ডাক্তারের বাড়ি ছুটল।

জমিদারমশাই হোঁচট খেতে খেতে বাড়ি এসে উপস্থিত। বাড়ি এসে দেখলেন সাড়া-শব্দ কিছু নেই, সব চুপচাপ। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাড়ির ভেতর গেলেন, সেখানে বসবার ঘরে গিন্নি আর মেয়ে দিব্যি আরাম করে বসে আছে। এতক্ষণে জমিদারমশায়ের চৈতন্য হলো। তিনি বুঝতে পারলেন, এ-সব চানু বেটারই চালাকি—বেটা তাঁকে আচ্ছা ঘোল খাইয়েছে।

খানিক পরেই দেখলেন, চানু তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। সেই চাকর বেটার কিন্তু আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। চাকর তার জন্য একটুও কেয়ার করে না, নাইবা করল তাঁর চাকরি—চানু যে তাকে দশটা মোহর দিয়েছিল, তা দিয়ে তার অনেক দিন চলবে।

পরের দিন চানু এসে জমিদার বাড়ি উপস্থিত। জমিদার বললেন, 'তুমি বাপু এবারে নেহাত ফাঁকি দিয়েছ, ওতে তোমার উপর আমার বড্ড রাগ হয়েছে। যা হোক, আজ রাত্রিতে যদি আমাদের বিছানা থেকে চাদরখানা চুরি করতে পার তা হলে কালকেই বিয়ের আয়োজন করব।'

চানু বলল, 'আজ্ঞে আচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখব, কিন্তু এবারে যদি ফাঁকি দেন, তা হলে কিন্তু আপনার মেয়েকেই চুরি করে নিয়ে যাব।'

রাত্রে জমিদার আর তাঁর গিন্নি শুয়েছেন, দিব্যি জ্যোৎস্না, কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো ঘরে এসে পড়েছে। জমিদারমশায় দেখলেন হঠাৎ যেন একটা মাথা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে যাচ্ছিল। তাঁদের দেখতে পেয়েই আবার সরে পড়ল।

জমিদার গিন্নিকে বললেন—'দেখলে ত ? এ বেটা নিশ্চয় চানু।' তারপর বন্দুকটা হাতে নিয়ে বললেন, 'দেখ, আমি বেটাকে এখনি চমকে দিচ্ছি।'

বন্দুক দেখেই জমিদার-গিন্নি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কর কি, চানুকে গুলি করবে নাকি ?'

জমিদার বললেন, 'আরে না, তুমি কি পাগল হলে নাকি ? বন্দুকে কি আর গুলি পুরেছি—শুধু বারুদ।'

খানিক পরেই আবার জানালায় মাথা উঁকি মারল, দড়াম করে জমিদার বন্দুক ছুড়ে দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন, ধপ করে কি নীচে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লেগেছে !

জমিদার-গিন্নি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হায় ভগবান, বেচারি বোধ করি মরে গেছে, আর না-হয় জন্মের মত খোঁড়া-কাণা হয়ে গেছে।'

জমিদারমশায় কেমন জানি থতমত খেয়ে গিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন—দরজা খোলাই পড়ে রইল।

জমিদারমশায় বোধ করি তখনো বাইরের জানালার কাছে পেঁছান নি, কিন্তু গিন্নিঠাকরুন শুনলেন, কর্তা ফিরে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'শিগগির বিছানার চাদরখানা দাও, বেটা মরে নি বোধহয়, কিন্তু বেজায় রক্ত পড়ছে, একটু পরিষ্কার করে বেঁধে-টেঁধে ওকে নিয়ে আসব।'

গিন্নিঠাকরুন একটানে চাদরখানা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে দরজায় ছুঁড়ে দিলেন। চাদর নিয়ে জমিদারমশায় আবার ছুটলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই মুহূর্তেই তিনি ফিরে এসে ঘরে উপস্থিত—সে সময়ের মধ্যে বাগানে জানালার কাছে গিয়ে ফিরে আসা একেবারে অসম্ভব।

ঘরে ঢুকেই জমিদার রেগেমেগে বলতে লাগলেন—'বেটা পাজি চানু, তোকে ফাঁসি দেওয়া দরকার।'

কর্তার কথা শুনে গিন্নি অবাক হয়ে বললেন—'বেচারির বেজায় লেগেছে আর তুমি কিনা তাকে গালাগালি দিচ্ছ!'

'ওর লাগাটাই বাস্তবিক উচিত ছিল। বেটার বদমাইশি দেখেছ? খড় দিয়ে একটা মানুষ বানিয়ে সেটাকে কাপড়-চোপড় পরিয়ে এনে জানালায় ধরেছিল।'

'কি ছাই মাথামুণ্ডু বলছ, আমি বুঝতেই পারছি না। খড়ের মানুষ হলে তার রক্ত মুছবার জন্য আবার বিছানার চাদর চেয়ে নিয়ে গেলে কেন?'

'বিছানার চাদর—বলছ কি! আমি ত বিছানার চাদর-টাদর চাইতে আসিনি।'

'চাদর চাইতে আসো আর না আসো আমি সে-সব কিছু জানি না। তুমি এসে দরজায় দাঁড়িয়ে চাদর চাইলে আর আমিও তোমাকে দিয়েছি।'

গিন্নির কথা শুনে জমিদারমশায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, 'কি ভীষণ শয়তান রে বাবা চানু—ওর সঙ্গে আর পেরে উঠব না। কাল সকালেই বিয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে দেখছি।'

এরপর চানুর সঙ্গে জমিদার কন্যার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর চানু খুব ভাল হয়ে গেল, তার মত জামাই সচরাচর মেলে না। জমিদারমশায় এবং তাঁর গিন্নি শতমুখে চানুর সুখ্যাতি করেন, আর লোকের কাছে বলেন, 'আমার ঝানু চোর চানু।'

## ছোট ভাই

সাতটি ভাই ছিল, তাদের সকলের ছোটটির নাম ছিল রুরু। দেশের মধ্যে তারা সাতটি ভাই ; দেখতে আর সকল ছেলের চেয়ে সুন্দর ছিল ; তাদের মধ্যে আবার রুরু ছিল সকলের চেয়ে সুন্দর। রুরুকে সকলেই কেন এত সুন্দর বলে আর তাদের বলে না, এর জন্য রুরুর বড় ভাইয়েরা তাকে বড্ড হিংসা করত। ভাল ভাল কাপড়গুলো সব তারা ছ'জনায় পরে বেড়াত, রুরুকে পরতে দিত শুধু ছেঁড়া ন্যাকড়া। যত বিচ্ছিরি নোংরা কাজ, সব তারা রুরুকে দিয়ে করাত, আর নিজেরা বাবুগিরি করে বেড়াত। তবু সকল লোকে রুরুকেই বেশি ভালবাসত, বড় কটিকে কেউ দেখতে পারত না। তাতে তারা আরো চটে রুরুকে যখন তখন ধরে ঠ্যাঙাত। বেচারাকে একদণ্ডও সুখে থাকতে দিত না।

রুরুদের গ্রাম থেকে ঢের দূরেররঙ্গা বলে একটি মেয়ে থাকত। এমন সুন্দর মেয়ে এই পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। তার কথা শুনেই রুরুর দাদারা বলল, 'চল্, আমরা সেই মেয়েকে দেখতে যাব। আমাদের মত সুন্দর ছেলে আর কোথায় আছে ? আমাদের দেখলেই সেই মেয়ে আমাদের একজনকে বিয়ে করে ফেলবে।'

তখন ত তাদের খুবই আনন্দ আর উৎসাহ হলো। ছ'জনের প্রত্যেকে ভাবল, 'ররঙ্গা নিশ্চয়ই আমাকেই বিয়ে করবে। কত গহনা এনে যে তারা তাদের ছ'টি পুঁটলির ভিতরে পুরল, তার লেখাজোখা নেই। মস্ত বড় পানসি তাদের জন্য তয়ের হলো। ছ'ভাই মিলে আজ কত রকম করেই পোশাক পরেছে, আর চুল আঁচড়েছে ; একটু পরে পানসিতে চড়ে বউ আনতে যাবে।

তাদের মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, তোরা রুরুকে সঙ্গে নিবি না ? অমনি তারা ছ'জন একসঙ্গে বলল, 'নেব বইকি ! নইলে আমাদের রান্না কে করবে ? ররঙ্গাকে দেখতে যাবার সময় আমরা তাকে আমাদের বাসায় রেখে যাব। ও যে ছেঁড়া কাপড় পরে, ও আমাদের ভাই, এ কথা জানলে লোকে কি বলবে ?'

রুরু সবই শুনল, কিন্তু কিছু বলল না। সেও তার দাদাদের সঙ্গে সেই পানসি চড়ে ররঙ্গাদের দেশে গিয়ে উপস্থিত হলো। সেখানকার লোকেরা এর আগেই শুনতে পেয়েছিল যে, কয়েকটি খুব সুন্দর ছেলে তাদের দেশে বউ খুঁজতে যাচ্ছে। তারা সেই পানসি পেঁছিবামাত্রই এসে রুরুর

দাদাদের আদর করে তাদের গ্রামে নিয়ে গেল। সেখানে তারা বাড়ি-ঘর সাজিয়ে মস্ত ভোজের আয়োজন আগেই করে রেখেছিল।

ছ'ভাই হাসতে হাসতে দুলতে দুলতে তাদের সঙ্গে চলে গেল। রুরুকে বলে গেল, 'আমাদের জন্য একটি বাসা ঠিক করে জিনিসপত্র সব তাতে নিয়ে রাখবি।'

তারপর তাদের খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ খুবই হলো। সেখানে অনেক মেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের কোন্‌টি যে ররঙ্গা, ছ'ভাইয়ের কেউ তা বুঝতে পারল না। তাদের প্রত্যেকেই তার পাশের মেয়েটিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্‌টি ররঙ্গা ?' সেই মেয়েদের প্রত্যেকেই বলল, 'আমিই ররঙ্গা, কাউকে বোলো না।'

এ কথা শুনে ত আর ভাইদের আনন্দের সীমা রইল না। অত সহজে ররঙ্গাকে পেয়ে যাবে, তা তারা মোটেই ভাবে নি। তারা তখনই সেই মেয়ে-গুলোর সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক করে ফেলল। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। সকলেই ভাবল, ররঙ্গাকে বিয়ে করেছে। ঠকেছে যে, সে কথা কারুরই মনে হলো না।

রুরু বেচারা এত কথার কিচ্ছু জানে না, আর তার জানবার দরকারই বা কি ? প্রথম দিন বাসা ঠিকঠাক করে সে কলসী হাতে জল আনতে বেরিয়েছিল। জল কোথায় আছে তা ত সে আর জানে না, তাই সে একটি ছোট মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁগা, কোথায় জল পাব ?' মেয়েটি বলল, 'ঐ যে ররঙ্গার বাড়ি, তারই পাশে ঝরণা আছে।'

রুরু সেই দিকে জল আনতে চলল। যেতে যেতে সে ভাবল, 'ররঙ্গা ত ভোজে গিয়েছে ; এর মধ্যে আমি একটু উঁকি মেরে দেখে নিই না, তার বাড়িটি কেমন।' এই ভেবে সে আস্তে আস্তে সেই ঘরটির দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারল। উঁকি মেরে আর তার সেখান থেকে চলে আসবার কথা মনে রইল না। সে দেখল, ঘরের ভিতরে ররঙ্গা বসে আছে! নিশ্চয় সে ররঙ্গা, নইলে এত সুন্দর আর কে হবে ?

ররঙ্গা তাকে দেখেই ভারি খুশি হয়ে অমনি তাকে ডাকল, 'এসো, এসো, ঘরে এসো।' রুরু জড়সড় হয়ে ঘরে গেল। তখন ররঙ্গা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে ?' রুরু বলল, 'সেই যে ছ'জন লোক বউ খুঁজতে এসেছে, যাদের জন্য ভোজ হচ্ছে, আমি তাদের ছোট ভাই।' ররঙ্গা বলল, 'তুমি কেন তবে ভোজে যাও নি ?' রুরু বলল, 'আমাকে তারা নিয়ে যায় নি, কাজ করবার জন্য বাসায় রেখে গেছে। আমার এর চেয়ে ভাল কাপড় নেই। এগুলো কাজ করতে করতে ময়লা হয়ে ছিঁড়ে গেছে।'

রুরুকে দেখেই ররঙ্গার যার-পর-নাই ভাল লেগেছিল, তার কথা শুনে তার বড়ই দুঃখ হলো। সে বুঝতে পারল যে রুরুর দাদারা বড় দুষ্টু, তাকে কষ্ট

দেয়। তখন রুরুকে তার আরো ভাল লাগল। দুদিন পরে তাদের বিয়েও হয়ে গেল।

তার পরদিন রুরুর দাদারা বউ নিয়ে ঘরে যাবে। রুরু যে তার আগেই ররঙ্গাকে নিয়ে নৌকার তলায় লুকিয়ে রেখেছে, সে কথা তাদের কেউ টের পায় নি। তারা ভারি ধুমধাম করে দেশে এল। তারপর বউ নিয়ে বাড়িতে পা দিয়েই সকলের বড় ভাই তাদের মাকে বলল, 'এই দেখো মা, ররঙ্গাকে বিয়ে করে এনেছি!' অমনি তার ছোট ভাই তার চেয়ে বেশি জোরে চেঁচিয়ে বলল, 'না মা, ও মিছে কথা বলছে, আমি ররঙ্গাকে এনেছি।'

তখন ত ভারি মজা হলো। সবাই বলছে, 'ওদের কথা মিথ্যে, আমি ররঙ্গাকে এনেছি।'

ভয়ানক চটাচটি, মারামারি হয়-হয়। বউ কটি থতমত খেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, তারা ভাবে নি যে অত সহজে ধরা পড়ে যাবে।

তখন মা বললেন, 'বাবা, ররঙ্গা ত ছ'টি নয়, আর এদের একটিও তেমন সুন্দরী নয়। তোমরা ঠকে এসেছো।' রুরু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, মা'র কথা শুনে সে বলল, 'ঠিক বলেছ মা, ঠকে এসেছে। আমার সঙ্গে এসো, আমি ররঙ্গাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

এ কথায় রুরুর দাদারা ত হেসেই গড়াগড়ি দিতে লাগল। কিন্তু মা বললেন, 'আচ্ছা গিয়েই দেখি না।' বলেই তিনি রুরুর নৌকোয় এলেন, আর একটিবার ররঙ্গার মুখের দিকে চেয়েই তাকে কোলে নিয়ে আনন্দে নাচতে লাগলেন। সে খবর দেখতে দেখতে গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ল। তখন পাড়ার ছেলে, বুড়ো, গিন্নি বউ সকলে ছুটে এসে ররঙ্গাকে ঘিরে নাচতে লাগল।

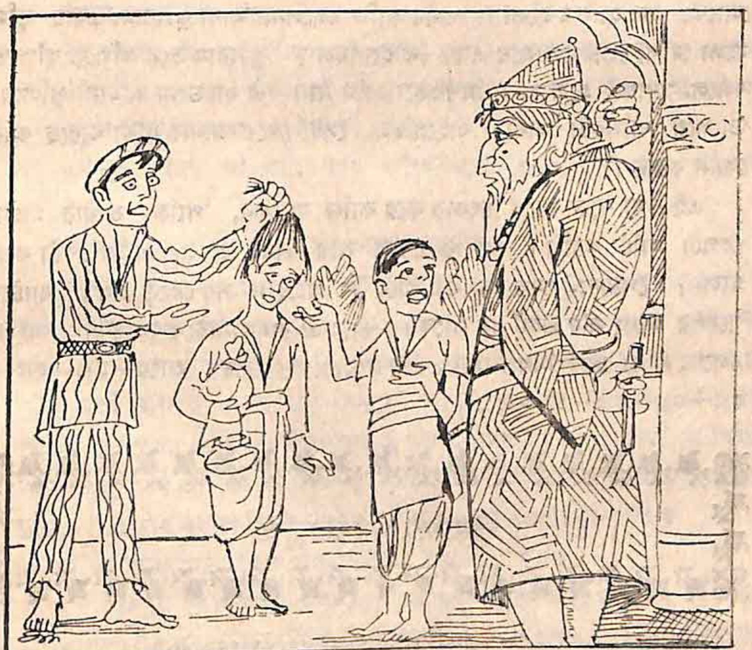
এ-সব দেখে দাদারা চোখ লাল করে, দাঁত খিঁচিয়ে তাদের স্ত্রীদের বলল, 'বটে? ফাঁকি দিয়েছিস?' শুনে সকলে হো হো করে হাসল। তাদের মা বললেন, 'আর কেন বাছা? চুপ করো! তোমরা যেমন, তোমাদের তেমনি জুটেছে।'

## কাজির বিচার

রামকানাই ভাল মানুষ—নেহাত গোবেচারা। কিন্তু ঝুটারাম লোকটি বেজায় ফন্দিবাজ। দুইজনে দেখা-শোনা আলাপ-সালাপ হলো। ঝুটারাম বললে, 'ভাই, দুজনেই বোঝা বয়ে খামকা কষ্ট পাই কেন? এই নাও, আমার পুঁটুলিটাও তোমায় দিই—এখন তুমি সব বয়ে নাও—ফিরবার সময় আমি বইব।' রামকানাই ভালমানুষের মত দুজনের বোঝা ঘাড়ে বয়ে চলল।

গ্রামের কাছে এসে তাদের খুব খিদে পেয়েছে। রামকানাই বলল, 'এখন খাওয়া যাক, কি বল?' ঝুটারাম বলল, 'বেশ ত, এক কাজ করো, খাবারের হাঁড়ি দুটোই খুলে কাজ নেই—মিছামিছি দুটোই নষ্ট হবে কেন? এখন তোমারটা থেকে খাওয়া যাক, ফিরবার সময় আমার খাবারটা খাওয়া যাবে।' রামকানাই তাই করল। ঝুটারাম বলল, 'ভাই, তোমার বাড়ি কে কে আছে?' রামকানাই তার বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, ছেলেপিলে সকলের কথা বলতে লাগল—তার মেয়ে কত বড় হয়েছে—তার ছেলে কি করে—সব কথা বলল। রামকানাই যত কথা বলে, ঝুটারাম ততই আরো প্রশ্ন করে, আর গপাগপ ভাত মুখে দেয়। রামকানাই গল্পেই মত্ত, তার যখন হুঁশ হলো, ততক্ষণে খাবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ঝুটারাম খাওয়া দাওয়া শেষ করে গম্ভীরভাবে হাতমুখ ধুয়ে বলল, 'ভাই, একটি কথা। তুমি আমায় যা খাওয়ালে সে এমন বিশ্রী রান্না যে কি বলব।



তুমি এমন খারাপ লোক তা আমি জানতাম না, নেহাত তুমি বন্ধু লোক, তোমায় আর বেশি কি বলব, কিন্তু এরপর আর তোমার সঙ্গে আমার ভাব রাখা চলে না। আমি চললাম।' এই বলে সে ভরা হাঁড়ি কাঁধে নিয়ে হন হন করে চলে গেল। রামকানাই বেচারার পেটও ভরে নি—ঝুটারামের ভাগ থেকে যে খাবার আশা ছিল তাও গেল। সন্ধ্যার সময় পেটে খিদে নিয়ে এতখানি পথ হেঁটে কি করে সে বাড়ি ফিরবে, তাই ভেবে কাঁদতে লাগল।

এমন সময় কাজির পেয়াদা সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে রামকানাইকে বলল, 'কাঁদ কেন?' রামকানাই তাকে সব কথা বলল। পেয়াদা বলল, 'এই কথা। চলো দেখি, কাজি সাহেবের কাছে। তিনি এর বিচার করবেন।' কাজির কাছে হাজির হতেই হুজুর বললেন, 'কি চাও?' রামকানাই তাঁকেও সব শোনাল। কাজি শুনে বললেন, 'হাঃ—হাঃ—হাঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ এমন মজা ত কখনো শুনি নি! আরে, তোকে দিয়ে জিনিস বইয়ে, আবার তোরই ভাত খেয়ে গেল? তোর আক্কেল ছিল কোথায়? হাঃ—হাঃ—হাঃ—বোলাও ঝুটারামকো!' পেয়াদা ছুটল, লোকলস্কর সবাই ছুটল—তিন মিনিটের মধ্যে ঝুটারামের ঝুঁটি ধরে কাজির সামনে দাঁড় করাল।

কাজি বললেন, 'আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও! গাঁয়ের মোড়লকে ডাকো, শেঠজীকে ডাকো, কোটাল বদ্যি গুরুমশাই—ঢাক পিটিয়ে সবাইকে ডাকো, এমন মজার কথাটা সবাই এসে শুনে যাক।' দেখতে দেখতে ঘর ভরিয়ে ভিড় জমিয়ে লোকের দল হাজির হলো। তখন কাজি বললেন, 'বাবা ঝুটারাম, এবার তুমি বলো দেখি, তোমাতে আর এঁতে কি হয়েছিল?' ঝুটারাম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'দোহাই হুজুর, আমি কিছু জানি না। ঐ হতভাগা আমায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে খানিকটা খাবার খাইয়েছিল, সেই থেকে আমার মাথা ঘুরছে আর কেমন করছে।'

এই কথা শুনে রেগে চিৎকার করে কাজি বললেন, 'পাজি, আমার মজার গল্পটা মাটি করলি। খাবার খেলি আর মাথা ঘুরল, এ কি একটা কথা হলো? পেয়াদা, দেখ ত ওর কাছে কি আছে। সব কেড়ে রাখ। ব্যাটার গল্পের মধ্যে যদি একটু রস থাকে। ওসব ঐ রামকানাইকে দিয়ে দে। ও যা বলছে, সত্যি হোক মিথ্যা হোক, তার মধ্যে মজা আছে। আরে—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ!

## কুঁজো আর ভূত

কানাই বলে একটি লোক ছিল, তার পিঠে ছিল ভয়ংকর একটা কুঁজ। বেচারা বড্ড ভালমানুষ ছিল, লোকের অসুখ-বিসুখে ওষুধপত্র দিয়ে তাদের কত উপকার করত। কিন্তু কুঁজো বলে তাকে কেউ ভালবাসত না।

কানাইয়ের ঝুড়ির দোকান ছিল। আর কোন ঝুড়িওয়ালা তার মত ঝুড়ি বুনতে পারত না। তারা তাকে ভারি হিংসা করত, আর তার নামে যা-তা বলে বেড়াত। তা শুনে লোকে ভাবত কানাই বড় দুষ্টু লোক; তাকে দেখতে পেলে সকলে মুখ ফিরিয়ে থাকত। বেচারার দুঃখের সীমা ছিল না।

এত বড় কুঁজ নিয়ে মাথা গুঁজে চলতে কানাইয়ের বড়ই কষ্ট হত। একদিন সে একটু দূরে এক জায়গায় ঝুড়ি বেচতে গেল, আর দিন থাকতে ঘরে ফিরতে পারল না। পথে একটা পুরানো বাড়ির কাছে এমনি অন্ধকার হলো, আর তার এতই কাহিল বোধ হলো যে, আর চলা অসম্ভব। সে জায়গাটা ভারি বিশ্রী; লোকে প্রাণান্তেও সে পথে আসতে চায় না। বলে, ওটা ভূতের বাড়ি। কিন্তু কানাইয়ের বড্ডই পরিশ্রম হয়েছে, চলবার আর সাধ্য নেই। কাজেই সে সেখানে পথের পাশে একটু না বসে আর কি করে?

কতক্ষণ সে এভাবে বসে ছিল তার কিন্তু ঠিক নেই। বসে থাকতে থাকতে তার মনে হলো যেন সেই পুরানো বাড়িটার ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে। অনেকগুলো গলা মিলে, আহা, কি সুন্দর সুরেই গাইছে! শুনে কানাইয়ের প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সে অবাক হয়ে খালি শুনতেই লাগল। গানের সুরটি অতি আশ্চর্য, কিন্তু কথা খালি এইটুকু ঃ

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইমলী হ্যায়, হিং হ্যায়!'

শুনতে শুনতে কানাই একেবারে মেতে গেল। সে ভাবল যে তার ও গানটা না গাইলেই চলছে না। কাজেই সেও খুব করে গলা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ধরল ঃ

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইমলী হ্যায়।'

এইটুকু গেয়েই ঝাঁ করে তার বুদ্ধি খুলে গেল, সে আরো উঁচু সুরে গাইল ঃ

'লসুন হ্যায়, মরীচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাঙ শুঁটকি হ্যায়।'

কানাই এই কথাগুলো খুব গলা ছেড়েই গেয়েছিল—সে গলার আওয়াজ যে সেই বাড়ির ভিতরের গাইয়েদের কানে গিয়ে পৌঁছিয়েছিল, তাতে আর কোন ভুল নেই। সে গাইয়েগুলো ছিল অবশ্য ভূত। তারা সেই নূতন কথাগুলো শুনে এতই খুশি হলো যে, তখনই ছুটে কানাইয়ের কাছে না এসে আর থাকতে পারল না। তারা এসে কানাইকে কোলে করে নাচতে নাচতে সেই বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল, আর আদরটা যা করল! মিঠাই যে তাকে কত খাওয়াল, তার অন্ত নেই। তারপর সকলে মিলে নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগল ঃ

'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইমলী হ্যায়, হিং হ্যায়।
লসুন হ্যায়, মরীচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাঙ্ শুঁটকি হ্যায়।'

কানাইকেও তাদের সঙ্গে নেচে নেচে গানটি গাইতে হলো। তখন হঠাৎ তার মনে হলো, 'কি আশ্চর্য, আমি কুঁজ নিয়ে চলতে পারি না, আমি আবার নাচলুম কি করে?' বলতে বলতেই তার হাতখানি পিঠের দিকে গেল—এ কি! তার সে কুঁজ যে আর নেই! একজন ভূত বলল, 'কি দেখছিস বাপ? ওটা আর ওখানে নেই, ঐ দেখ, তোর পাশে পড়ে আছে।'

সত্যি সত্যি সে কুঁজ আর কানাইয়ের পিঠে ছিল না, সেটা তার পাশে পড়ে ছিল। আহা! কানাইয়ের তখন কি আনন্দই হলো! আর হালকা

আর আরাম বোধ হলো এমনি যে, সে তখনই সেই স্থানে মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর পরদিন সকালে যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন সে দেখল সে সেই বাড়ির বাইরে রাস্তার ধারে শুয়ে আছে ; ভূতেরা তাকে একটি চমৎকার নতুন পোশাক পরিয়ে সেখানে এনে রেখে গিয়েছে। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠে, মনের সুখে বাড়ি চলে এল। সেখানকার লোকেরা তার মুখের পানে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, কেউ তাকে চিনতে পারে না। সে যে তাদের সেই কুঁজো কানাই, ভূতেরা তার কুঁজ ফেলে তার এমনি সুন্দর চেহারা করে দিয়েছে, এ কথা তাদের বোঝাতে তার অনেকক্ষণ লেগেছিল।

তারপর দেখতে দেখতে কানাইয়ের কুঁজের গল্প দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। যে শুনল সেই ভাবল যে, এমন আশ্চর্য কথা আর কখনো শোনে নি। এখন আর লোকে তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে থাকে না ; তারা হাসতে হাসতে ছুটে এসে তার সঙ্গে কথা কয়, আর বাড়ির লোককে তার এই আশ্চর্য খবর জানাবার জন্য তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। কত লোকে শুধু সেই গল্প শোনবার জন্যই তার ঝুড়ি কিনতে আসে। ঝুড়ি বেচে সে বড়লোক হয়ে গেল।

এমনি করে দিন যাচ্ছে। তারপর একদিন কানাই তার ঘরের দাওয়ায় বসে ঝুড়ি বুনছে, এমন সময় একটি বুড়ি সেই পথে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁগা, কেবলহাটি যাব কোন্ পথে ?' কানাই বলল, 'এই ত কেবলহাটি ; তুমি কি চাও ?' বুড়ি বলল, 'তোমাদের গ্রামে নাকি কানাই বলে কে আছে, ভূতেরা তার কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল। তার মন্তরটা তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারলে আমাদের মানিকের কুঁজটাও সারিয়ে নিতুম।'

কানাই বলল, 'আমিই ত সেই কানাই, ভূতেরা আমারই কুঁজ সারিয়ে দিয়েছিল। এর ত মন্তর-টন্তর কিছু নেই, তারা রাত জেগে গাইছিল, আমি পথের ধারে শুয়ে শুয়ে তাদের গানে কথা জুড়ে দিয়েছিলাম ; তাইতে তারা খুশি হয়ে আমার কুঁজ সারিয়ে, নতুন পোশাক পরিয়ে দিয়েছিল।' বুড়ি তখন খুঁটে খুঁটে সব কথা কানাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিয়ে তাকে অনেক আশীর্বাদ করে সেখান থেকে চলে গেল।

সেই বুড়ির ছেলে যে মানিক, তার পিঠে ছিল কানাইয়ের কুঁজের চেয়েও ঢের বড় একটা কুঁজ। লোকটা এমনি দুষ্টু আর হিংসুটে ছিল যে পাড়ার লোকে তার জ্বালায় অস্থির থাকত। সেই মানিকের কুঁজ সারাবার জন্য তার বাড়ির লোকেরা একদিন রাত্রে তাকে গাড়ি করে এনে ভূতের বাড়ির কাছে রেখে গেল। সেখানে পড়ে পড়ে মানিক ভাবছে ভূতেরা কখন গান ধরবে, আর তাতে সে কথা জুড়ে দেবে, আর তার কুঁজ সেরে যাবে। তারপর যেই ভূতেরা বলেছে ঃ 'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইমলী হ্যায়,' অমনি মানিক আর তাদের শেষ করতে না দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'গুরুচরণ ময়রার দোকানের কাঁচাগোল্লা হ্যায়।'

তখন গানের তাল ভেঙ্গে ত গেলই, কাঁচাগোল্লার নাম শুনে অনেক ভূতের বমি পর্যন্ত হতে লাগল। ভূতেরা এসব জিনিসকে বড্ড ঘৃণা করে, এর নাম অবধি শুনতে পারে না। কাজেই তারা তাতে বেজায় চটে দাঁত খিঁচুতে খিঁচুতে এসে বলল, 'কে রে তুই, অসভ্য বেতালা বেটা, আমাদের গান মাটি করে দিলি? দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি!' এই বলে তারা কানাইয়ের সেই কুঁজটা এনে মানিকের কুঁজের উপর বসিয়ে এমনি করে জুড়ে দিল যে আর কিছুতেই তাকে তুলবার জো নেই।

পরদিন মানিকের বাড়ির লোকেরা এসে তাকে দেখে অবশ্য খুবই আশ্চর্য আর দুঃখিত হলো, কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলল, 'বেটা যেমন দুষ্টু, তেমনি সাজা হয়েছে।'

## তিনটি বর

এক দেশে এক কামার ছিল, তার মত অভাগা আর কোন দেশে কখনো জন্মায় নি। তাকে এক জিনিস গড়তে দিলে তার জায়গায় আর-এক জিনিস গড়ে রাখত; একটা কিছু সারাতে দিলে তাকে ভেঙে আরো খোঁড়া করে দিত। আর লোককে ফাঁকি যে দিত, সে কি বলব! কাজেই কেউ তাকে কোন কাজ করতে দিতে চাইত না, তার দুবেলা দুটি ভাতও জুটত না; লাভের মধ্যে সে তার গিন্নীর তাড়া খেয়ে সারা হ'ত।

একদিন সে দোকানে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছে। ভয়ানক শীত, গায়ে জড়াবার কিছু নেই। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে; ঘরে খাবার নেই। এমন সময় কোত্থেকে এই লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো লাঠি ভর করে কাঁপতে কাঁপতে এসে তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'জয় হোক বাবা, দুঃখী বুড়োকে কিছু খেতে দাও।'

কামার বলল, 'বাবা, খাবার যদি থাকত, তবে নিজেই দুটি খেয়ে বাঁচতুম। দুদিন পেটে কিছু পড়ে নি, ছেলেপুলে নিয়ে উপোস করছি—তোমাকে কোত্থেকে দেব? তুমি না হয় ঘরে এসে একটু গরম হয়ে যাও, আমি হাপর ঠেলে আগুনটা উসকিয়ে দিচ্ছি।'

বুড়ো তখন কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে বলল, 'আহা, বাঁচালে বাবা; শীতে জমে গিয়েছিলুম। তুমি দেখছি তবে আমার চেয়েও দুঃখী। আমার নিজে খেতে পেলেই চলে, তোমার আবার স্ত্রী আর ছেলেপুলেও আছে।'

এই বলে বুড়ো আগুনের কাছে এসে বসল, কামার খুব করে হাপর ঠেলে

আগুন উসকিয়ে তাকে গরম করে দিল। যাবার সময় বুড়ো তাকে বলল, 'তুমি আমাকে খেতে দিতে পার নি, তবু তোমার যতদূর সাধ্য তুমি করেছ। এখন তোমার যেমন ইচ্ছা, তিনটি বর চাও, আমি নিশ্চয় দেব।'

এ কথায় কামার অনেকক্ষণ বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে মাথা চুলকোতে লাগল, কিন্তু কি বর চাইতে হবে, বুঝতে পারল না। বুড়ো বলল, 'শিগ্‌গির বল, আমার বড্ড তাড়াতাড়ি, ঢের কাজ আছে।'

তখন কামার থতমত খেয়ে বলল, 'আচ্ছা, তবে এই বর দিন যে, আমার এই হাতুড়িটি যে একবার হাতে করবে, সে আর আমার হুকুম ছাড়া সেটি রেখে দিতে পারবে না। আর যদি তা দিয়ে ঠুকতে আরম্ভ করে, তবে আমি থামতে না বললে আর থামতে পারবে না।'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা, তাই হবে। আর কি বর চাই?'

কামার বলল, 'আমার এই কেদারাখানিতে যে বসবে, সে আমার হুকুম ছাড়া তা থেকে উঠতে পারবে না।'

বুড়ো বলল, 'আচ্ছা, তাও হবে। আর কি?'

কামার বলল, 'আমার এই থলিটির ভেতরে আমি কোন টাকা রাখলে আমি ছাড়া আর কেউ তাকে তা থেকে বার করতে পারবে না।'

সেই বুড়ো ছিলেন এক দেবতা। তিনি এই শেষ বরটিও সেই কামারকে দিয়ে ভয়ানক রেগে বললেন, 'অভাগা, তুই ইচ্ছা করলে এই তিন বরে পরিবার সুদ্ধ স্বর্গে চলে যেতে পারতিস, তার মধ্যে তোর এই দুর্মতি!'

এই বলে দেবতা চলে গেলেন, কামার আবার বসে বসে ভাবতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হলো যে, তাই ত, এই তিন বরের জোরে ত আমি বেশ দু পয়সা রোজগার করে নিতে পারি।

তখন সে দেশময় এই কথা রটিয়ে দিল যে, 'আমার দোকানে এলে আমি বিনি পয়সায় কাজ করে দেব।' দেশের যত কিপটে পয়সাওয়ালা লোক, সে কথা শুনে তার দোকানে এসে উপস্থিত হতে লাগল। এক একজন আসে, আর কামার তাকে দু হাতে লম্বা লম্বা সেলাম করে তার সেই কেদারাখানায় বসতে দেয়। বিনি পয়সায় কাজ করিয়ে চলে যাবার সময় আর সে বেচারা তা থেকে উঠতে পারে না, কামারও বেশ ভালমত তার কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় না করে তাকে উঠতে দেয় না। এমনি করে দিনকতক সে খুব টাকা পেতে লাগল। কাউকে এনে চেয়ারে বসায়, কারু হাতে তার হাতুড়িখানা তুলে দেয়, তারপর টাকা না দিলে আর তাকে ছাড়ে না।

যা হোক, ক্রমে সকলেই তার দুষ্টুমি টের পেয়ে গেল; তখন আর কেউ তার কাছে আসে না, কাজেই আবার তার দুর্দশার একশেষ হতে লাগল। এই সময় কামার একদিন একটা বনের ভিতর বেড়াতে গিয়ে একটি সাদাসিদে গোছের বুড়োকে দেখতে পেল। বুড়োকে দেখে সে ভাবল, বুঝি কোন উকিল

হবে। কিন্তু তখনই আবার কোন উকিলের সেই বনের ভিতর আসা তার ভারি অসম্ভব মনে হলো। তারপর সে আবার ভাল করে চেয়ে দেখল যে সেই লোকটার পা দুখানিতে ঠিক ছাগলের পায়ের মত খুর আছে। তখন আর তার বুঝতে বাকি রইল না যে, সেই বুড়ো আর কেউ নয়, স্বয়ং শয়তান। শয়তানের পা ঠিক ছাগলের মত থাকে, এ কথা সেই কামার ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছিল।

আর কেউ হলে তখনই সেখান থেকে ছুটে পালাত। কিন্তু সেই কামার তেমন কিছু না করে জোড়হাতে শয়তানকে নমস্কার করে বলল, 'প্রণাম হই।'

শয়তান অমনি হাসতে হাসতে তার নাম ধরে বলল, 'কি হে, কেমন আছ?'

কামার বলল, 'আজ্ঞে, কেমন আর থাকব? দুবেলা দুটি ভাতও খেতে পাই নে।'

শয়তান বলল, 'বটে! তুমি এতই কষ্ট পাচ্ছ? তুমি কেন আমার চাকরি করো না, আমি তোমাকে ঢের টাকা দেব।'

ঢের টাকার নাম শুনে কামার তখনই শয়তানের কথায় রাজি হলো, যদিও সে জানত যে তার কাজে একবার ঢুকলে আর কেউ ছেড়ে আসতে পারে না। শয়তান তখন তাকে তিন থলি মোহর দিয়ে বলল, 'এখন গিয়ে এই টাকা দিয়ে খুব আরামে খাও-দাও; সাত বছর পরে আমি তোমার কাছে আসব, তখন তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।' এই বলে শয়তান চলে গেল। কামারও হাসতে হাসতে টাকার থলি নিয়ে ঘরে ফিরল।

সেই তিন থলি মোহর নিয়ে কামার যার পর নাই খুশি হয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি এল। ভাবল, এখন সাত বছর এই মোহর দিয়ে খুব ধুমধাম করে নেব। সাত বছর পরে শয়তানের তাকে নিতে আসবার কথা, তখন তার সঙ্গে যেতেই হবে।

তারপর লোকে দেখল যে কামার কেমন করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছে। এখন আর সে হাপরও ঠেলে না, লোহাও পেটে না; অথচ তার গাড়ি-ঘোড়া চাকর-বাকরের অন্ত নেই। দিন যাচ্ছে আর তার বাবুগিরি ক্রমেই বেড়ে উঠছে। সে বাবুগিরিতে সাত বছর শেষ হবার ঢের আগেই শয়তানের দেওয়া সব টাকা ফুরিয়ে গেল, আর ঘরে একটি পয়সাও নেই, একমুঠো চালও নেই। তখন তাকে আবার যে কামার সেই কামারই হতে হলো, নইলে খাবে কি?

তারপর একদিন সে তার দোকানে বসে একটা লোহা পিটছে আর ভাবছে, কখন খদ্দের আসবে, এমন সময় একজন বুড়ো-হেন লোক ধীরে ধীরে এসে তার কাছে দাঁড়াল। কামার আগে ভাবল, 'এই রে, খদ্দের! তারপর চেয়ে দেখল, ও মা! এ যে শয়তান।

শয়তান বলল, 'মনে আছে ত? সাত বছর শেষ হয়েছে, এখন আমার সঙ্গে চলো।'

কামার বলল, 'তাই ত, আমি গেলে আমার ছেলেপুলেগুলো কি খাবে? তোমার ত কতই লোক আছে, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও।'

শয়তান বলল, 'সে হবে না! আমাকে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত কাজ। চলো, এখনই চলো।'

কামার বলল, 'তুমি ছাড়বেই না যখন তখন ত যেতেই হবে, কিন্তু আমার হাতের এই কাজটি শেষ করে যেতে পারলে আমার ছেলেগুলোর পক্ষে বড় ভাল হ'ত—এর দরুন কিছু পয়সা পাওয়া যাবে। তুমি দাদা আমার এই উপকারটুকু করো না—আমি সকলের কাছে বিদায় হয়ে নিই, ততক্ষণ তুমি বসে এই হাতুড়িটা দিয়ে এই লোহাখানিকে পেটো।'

শয়তান কাজে এমন দুষ্টু হলেও কথাবার্তায় ভারি ভদ্রলোক, সে কামারের কথা শুনে তখনই তার হাত থেকে হাতুড়িটি নিয়ে লোহাটাকে পেটাতে লাগল। সে জানত না যে সেটা সেই দেবতার বর দেওয়া সর্বনেশে হাতুড়ি, তা দিয়ে একবার পিটতে আরম্ভ করলে কামারের হুকুম ছাড়া আর থামবার উপায় নেই। কামার তার হাতে সেই হাতুড়ি দিয়েই অমনি যে ঘর থেকে বেরুল, আর একমাসের ভিতরে সেই মুখোই হলো না।

একমাস পরে কামার দোকানে ফিরে এসে দেখল যে শয়তান তখনো ঠনাঠন ঠনাঠন করে বেদম হাতুড়ি পিটছে, আর তার দশা যে হয়েছে! খালি শয়তান বলে সে এতক্ষণ বেঁচে আছে, আর কেউ হলে মরেই যেত। কামারকে দেখে সে অনেক মিনতি করে বলল, 'ভাই, ঢের ত হয়েছে; আমাকে মেরে ফেলে তোমার লাভ কি? তার চেয়ে তোমাকে আরো তিন থলি মোহর দিচ্ছি, আরো সাত বছরের ছুটি দিচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দাও।'

কামার ভাবল, মন্দ কি! আর তিন থলি মোহর দিয়ে সাত বছর সুখে কাটানো যাক। কাজেই সে শয়তানকে বলল, 'আচ্ছা, তবে তাই হোক।'

তখন শয়তান কামারকে আবার তিন থলি মোহর দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল, কামারও সেই টাকা দিয়ে আবার ধুমধাম জুড়ে দিল। তারপর সে টাকা শেষ হতেও আর বেশ দেরি হলো না, তখন আর হাতুড়ি-পেটা ভিন্ন উপায় নেই। এমনি করে আবার সাত বছর কেটে গেল।

এবার শয়তান কামারকে নিতে এসে দেখে তার বাড়িতে ভারি গোলমাল। কি কথা নিয়ে কামার তার গিন্নির উপর বিষম চটেছে, আর তাকে ধরে ভয়ানক মারছে। কামারের গিন্নিও যেমন-তেমন মেয়ে নয়, পাড়ার সকলে তার জ্বালায় অস্থির থাকে। কামারকে সে ঝাঁটা দিয়ে কম নাকাল করছে না, কিন্তু কামারের হাতে কিনা হাতুড়ি, কাজেই জিত হচ্ছে তারই। শয়তান এসে এসব দেখে কামারকে ভয়ানক দুই থাপ্পড় লাগিয়ে বলল, 'বেটা পাজি, স্ত্রীকে ধরে মারিস? চল্, আমার সঙ্গে চল্।'

শয়তান ভেবেছিল, এতে কামারের স্ত্রী খুব খুশি হয়ে তার সাহায্য করবে। কিন্তু কামারের স্ত্রী তার কিছু না করে, 'বটে রে হতভাগ্য, তোর এতবড় আস্পর্ধা! আমার স্বামীর গায়ে হাত তুলছিস!' বলে, সেই ঝাঁটা দিয়ে শয়তানের নাকে মুখে এমনি সপাংসপ মারতে লাগল যে বেচারার দমই ফেলা দায়। সে তাতে বেজায় থতমত খেয়ে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ল—সেই চেয়ার, যাতে একবার বসলে আর কামারের বিনা হুকুমে ওঠবার জো নেই।

কামার দেখল যে, শয়তান এবারে বেশ ভালমতোই ধরা পড়েছে, হাজার টানাটানিতেও উঠতে পারছে না। তখন সে তার চিমটেখানি আগুনে তাতিয়ে নিয়ে তা দিয়ে আচ্ছা করে তার নাকটা টিপে ধরল। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে 'হেঁইয়ো' বলে সেই চিমটে ধরে টানতেই নাকটা রবারের মত লম্বা হতে লাগল। এক হাত, দু হাত, চার হাত, আট হাত—নাক যতই লম্বা হচ্ছে, শয়তান বেটা ততই ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে। নাকটা যখন কুড়ি হাত লম্বা হলো তখন শয়তান আর থাকতে না পেরে নাকিসুরে বলল, 'দোহাই দাদা! আর টেনো না, মরে যাব।'

কামার বলল, 'আরো তিন থলি টাকা, আর সাত বছরের ছুটি দেবে কিনা বলো।' শয়তান ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এক্ষুনি, এক্ষুনি, এই নাও।' বলতে বলতেই তিন থলি ঝকঝকে মোহর এসে কামারের কাছে হাজির হলো; কামার সেগুলো সিন্দুকে তুলে শয়তানকে বলল, 'আচ্ছা, তবে যাও!' শয়তান ছাড়া পেয়েই সেখান থেকে এমনি ছুট দিল যে, ছুট যাকে বলে।

তখন কামার আর তার স্ত্রী মেঝেয় গড়াগড়ি দিয়ে যে হাসিটা হাসল! আর সাত বছরের জন্য তাদের কোন ভাবনা রইল না। সাত বছর যখন শেষ হলো, তখন কামারের টাকাও ফুরিয়ে গেল, তাকে আবার তার ব্যবসা ধরতে হলো, ততদিনে শয়তানও আবার তাকে নেবার জন্য এসে উপস্থিত হলো।

সাত বছর পরে শয়তান আবার কামারকে নেবার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু গতবারে সে নাকে যে চিমটি খেয়ে গিয়েছিল, তার কথা ভেবে আর সে সোজাসুজি কামারের সামনে এসে দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছে না, তাই এবারে সে এক ফন্দি এঁটে এসেছে।

শয়তান জানে যে, কেউ যদি তাকে নিজে থেকে আদর করে নিয়ে যায় তা হলে আর সে কিছুতেই তার হাত ছাড়তে পারে না। তখন শয়তান করল কি, একটি ঝকঝকে মোহর হয়ে ঠিক কামারের দোকানের সামনে রাস্তায় গিয়ে পড়ে রইল। সে ভাবল যে, কামার খেতে পায় না, মোহরটি দেখলে সে পরম আদরে তাকে তুলে নিয়ে যাবে; তারপর আর সে শয়তানকে ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়?

যেই কথা সেই কাজ। কামার সেই মোহরটিকে দেখতে পাওয়া মাত্রই ছুটে গিয়ে সেটিকে তুলে এনে তার থলেয় পুরল। তখন থলের ভিতর থেকে

শয়তান হেসে তাকে বলল, 'কি বাপু, এখন কোথায় যাবে? নিজে ধরে আমাকে ঘরে এনেছ, তার মজাটা এখনই দেখতে পাবে!'

কামার বলল, 'কে রে বেটা? তুই নাকি! তোর বুঝি আর মরবার জায়গা জোটে নি, তাই আমার থলের ভেতরে এসেছিস? দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি!'

এ কথায় শয়তান এমনি রেগে গেল যে, পারলে সে তখনই কামারকে মেরে শেষ করে। কিন্তু থলের বাইরে এলে তবে ত শেষ করবে! সে যে সেই বিষম থলে—যার ভিতর ঢুকলে আর বেরোবার হুকুম নেই! শয়তান বেচারার খালি ছটফটানোই সার হলো, সে আর থলের ভিতর থেকে বেরুতে পারল না। ততক্ষণে কামার সেই থলেটি তার নেহাইয়ের উপর রেখে গিন্নীকে ডেকে দুজনে দুই প্রকাণ্ড হাতুড়ি নিয়ে, দমাদ্দম দমাদ্দম এমনি পিটুনি জুড়ল যে পিটুনি যাকে বলে! পিটুনি খেয়ে শয়তান খানিক খুব চেঁচাল। তারপর যখন আর চেঁচানো আসে না, তখন গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'ছেড়ে দাও দাদা, তোমার পায়ে পড়ি। এবার তোমাকে বিশাল বিশাল ছয় থলে ভরা মোহর দেব, আর কখনো তোমার কাছে আসব না।'

এ কথায় কামারের গিন্নী বলল, 'ওগো, সে হলে নেহাত মন্দ হবে না। দাও হতভাগাকে ছেড়ে।' তখন কামার বলল, 'কই তোর মোহরের থলে?' বলতে বলতেই এমনি বড় বড় মোহরের থলে এসে হাজির হলো যে, তারা দুজনে মিলেও তার একটাকে তুলতে পারে না। তখন কামার একগাল হেসে, তার থলের মুখ খুলে দিয়ে বলল, 'যা বেটা! ফের তোর পোড়া মুখ এখানে দেখাতে আসবি ত টের পাবি।' ততক্ষণে শয়তান থলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এমনি ব্যস্ত হয়ে ছুট দিল যে, কামারের সবকথা শুনতেও পেল না।

সেই ছ'টা থলের ভিতর এতই মোহর ছিল যে, কামার হাজার ধুমধাম করেও তা শেষ করতে পারল না। চার থলে ভাল করে ফুরুতেই সে বুড়ো হয়ে শেষে একদিন মরে গেল। মরে গিয়ে ভূত হয়ে সে ভাবল যে এখন ত হয় স্বর্গে না হয় নরকে দুটোর একটায় যেতে হবে। আগে স্বর্গের দিকে গিয়েই দেখি না, যদি কোনমতে সেখানে ঢুকতে পারি।

স্বর্গের ফটকের সামনে গিয়ে তার সেই দেবতাটির সঙ্গে দেখা হলো, যিনি তাকে সেই বর দিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে কামার ভারি খুশি হয়ে ভাবল, এই ঠাকুরটি না আমাকে সেই চমৎকার বরগুলো দিয়েছিলেন? ইনি অবশ্যই আমাকে ঢুকতেও দেবেন।

কিন্তু দেবতা তাকে দেখেই যার পর নাই রেগে বললেন, 'এখানে এসেছিস কি করতে? পালা হতভাগা, শিগগির পালা!'

কাজেই তখন বেচারা আর কি করে? সে সেখান থেকে ফিরে নরকের দিকে চলল। সেখানকার ফটকের সামনে উপস্থিত হলে শয়তানের দারোয়ানেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম?'

কামার তার নাম বলতেই পাঁচ-ছয়টা দারোয়ান ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে শয়তানকে বলল, 'মহারাজ! সেই কামার এসেছে!' তা শুনে শয়তান বিষম চমকে গিয়ে একটা লাফ যে দিল! তারপর পাগলের মত ফটকের কাছে ছুটে এসে দারোয়ানদের বলল, 'শিগ্‌গির দরজা বন্ধ কর! আঁটি হুড়কো! লাগা তালা! খবরদার! ও বেটাকে ঢুকতে দিবি না! ও এলে আর কি আমাদের রক্ষা থাকবে!'

শয়তানের গলা শুনে কামার গরাদের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে হাসতে হাসতে বলল, 'কি দাদা! কি খবর?' সে কথা শেষ না হতেই শয়তান এক লাফে এসে এমনি তার নাক মলে দিল যে কি বলব! কামার তখনই সেখান থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে পালাল, কিন্তু তার আগেই তার নাকে আগুন ধরে গিয়েছিল। সে আগুন আজও নেভে নি। কামার তার জ্বালায় অস্থির হয়ে জলায় জলায় নাক ডুবিয়ে বেড়ায়। লোকে সেই আগুন দেখতে পেলে বলে, 'ঐ আলেয়া।'

## গুপি গাইন ও বাঘা বাইন

তোমরা গান গাইতে পার? আমি একজন লোকের কথা বলব সে একটা গান গাইতে পারত। তার নাম ছিল গুপি কাইন, তার বাবার নাম ছিল কানু কাইন। তার একটা মুদীর দোকান ছিল। গুপি কিনা একটা গান গাইতে পারত, আর সে গ্রামের আর কেউ কিছু গাইতে পারত না, তাই তারা তাকে খাতির করে বলত, 'গুপি গাইন'।

গুপি যদিও একটা বই গান জানত না, কিন্তু সেই একটা গান সে খুব করেই গাইত; সেটা না গেয়ে সে তিলেকও থাকতে পারত না, তার দম আটকে আসত। যখন সে বসে গাইত, তখন তার খাবার দোকানের খদ্দের সব ছুটে পালাত। যখন সে মাঠে গিয়ে গান গাইত, তখন মাঠের যত গরু সব দাড়ি ছিঁড়ে ভাগত। শেষে তার ভয়ে তার বাবার দোকানে আর খদ্দেরই আসে না, রাখালেরাও মাঠে গরু নিয়ে যেতে পারে না। তখন একদিন কানু কাইন তাকে এই বড় বাঁশ দিয়ে তাড়া করতে সে ছুটে মাঠে চলে গেল; সেখানে রাখালের দল লাঠি নিয়ে আসতে বনের ভিতর গিয়ে খুব করে গলা ভাঁজতে লাগল।

গুপিদের গ্রামের কাছেই আরেকটা গ্রামে একজন লোক থাকত, তার নাম ছিল পাঁচু গাইন। পাঁচুর ছেলেটির বড্ড ঢোলক বাজাবার শখ ছিল। বাজাতে

বাজাতে সে বিষম দুলতে থাকত, আর পা নাড়ত, আর চোখ পাকাত, আর দাঁত খিঁচোত, আর ভ্রূকুটি করত। তার গ্রামের লোকেরা তা দেখে হাঁ করে থাকত আর বলত, 'আহা! আ-আ !! অ-অ অ-হুক্ !!!' শেষে যখন 'হাঃ, হাঃ, হা-হা!' বলে বাঘের মত খেঁকিয়ে উঠত, তখন সকলে পালাবার ফাঁক না পেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে যেত। তাই থেকে সকলে তাকে বলত 'বাঘা বাইন।' তার এই বাঘা নামই রটে গিয়েছিল; আসল নাম যে তার কি, তা কেউ জানত না।

বাঘা ঢোলক বাজাত আর রোজ একটা করে ঢোলক ভাঙত। শেষে আর পাঁচু তার ঢোলকের পয়সা দিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু বাঘার বাজনা বন্ধ হবে, তাও কি হয়? গ্রামের লোকেরা পাঁচুকে বলল, 'তুমি না পারো, না-হয় আমরাই সকলে চাঁদা করে ঢোলকের পয়সাটা দি। আমাদের গ্রামে এমন একটা ওস্তাদ রয়েছে, তার বাজনাটা বন্ধ হয়ে যাবে!' শেষে ঠিক হলো যে গ্রামের সকলে চাঁদা করে বাঘাকে ঢোলক কিনে দেবে, আর সেই ঢোলকটি আর তার ছাউনি খুব মজবুত হবে, যাতে বাঘার হাতেও সেটা আর সহজে না ছেঁড়ে।

সে যাক ঢোলক হলো। তার মুখ হলো সাড়ে-তিন হাত চওড়া, আর ছাউনি মোষের চামড়ার। বাঘা সেটা পেয়ে যার-পর-নাই খুশি হয়ে বললে, 'আমি দাঁড়িয়ে বাজাব।'

তখন থেকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঢোলক লাঠি দিয়ে বাজায়। দেড় মাস দিনরাত বাজিয়েও বাঘা সেটাকে ছিঁড়তে পারল না। ততদিনে তার বাজনা শুনে শুনে তার বাপ মা পাগল হয়ে গেল, গ্রামের লোকের মাথা ঘুরতে লাগল। আর দিন কতক এই ভাবে চললে কি হত বলা যায় না। এর মধ্যে একদিন গ্রামের সকলে মিলে মোটা মোটা লাঠি নিয়ে এসে বাঘাকে বললে, 'লক্ষ্মী, দাদা! তোমাকে দশ হাঁড়ি মিঠাই দিচ্ছি, অন্য কোথাও চলে যাও, নইলে আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব।'

বাঘা আর কি করে? কাজেই তখন তাকে অন্য একটা গ্রামে যেতে হলো। সেখানে দুদিন থাকতে না থাকতেই সেখানকার সকলে মিলে তাকে গ্রাম থেকে বার করে দিল। তারপর থেকে সে যেখানেই যায়, সেখান থেকেই তাকে তাড়িয়ে দেয়। তখন সে করল কি, সারাদিন মাঠে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষুধার সময় তার নিজের গ্রামে গিয়ে ঢোলক বাজাতে থাকে, আর গ্রামের লোক তাড়াতাড়ি তাকে কিছু খাবার দিয়ে বিদায় করে বলে, 'বাঁচলাম!' তারপর এমন হলো যে আর কেউ তাকে খেতে দেয় না। আর তার ঢোলকের আওয়াজ শুনলেই আশপাশের সকল গ্রামের লোক লাঠি নিয়ে আসে। তখন বেচারা ভাবল, আর না! মুর্খদের কাছে থাকার চেয়ে বনে চলে যাওয়াই ভাল। না-হয় বাঘে খাবে, তবুও আমার বাজনা চলবে। এই বলে বাঘা তার ঢোলকটিকে ঘাড়ে করে বনে চলে গেল।

এখন বাঘার বেশ মজাই হয়েছে। এখন আর কেউ তার বাজনা শুনে লাঠি

নিয়ে আসে না। বাঘে খাবে দূর থাক, সে বনে বাঘ-ভালুক কিছু নেই। আছে খালি একটা ভয়ানক জানোয়ার। বাঘা আজও তাকে দেখতে পায় নি, শুধু দূর থেকে তার ডাক শুনে ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপে, আর ভাবে, বাবা গো! ওটা এলেই ত ঢোলক-সুন্ধ আমাকে গিলে খাবে!

সে ভয়ানক জানোয়ার কিন্তু কেউ নয়, সে গুপি গাইন। বাঘা যে ডাক শুনে কাঁপে, সে গুপির গলা ভাঁজা। গুপিও বাঘার বাজনা শুনতে পায়, আর বাঘারই মত ভয়ে কাঁপে। শেষ একটু ভাবল, এ বনে থাকলে কখন প্রাণটা যাবে, তার চেয়ে এই বেলা এখান থেকে পালাই। এই ভেবে গুপি চুপিচুপি বন থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়েই দেখে আর-একটি লোকও বিশাল ঢোল মাথায় করে সেই বনের ভিতর থেকে আসছে। তাকে দেখেই ভারি আশ্চর্য হয়ে গুপি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে হে?'

বাঘা বললে, 'আমি বাঘা বাইন, তুমি কে?'

গুপি বললে, 'আমি গুপি গাইন, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

বাঘা বললে, 'যেখানে জায়গা জোটে, সেইখানেই যাচ্ছি। গ্রামের লোকগুলো গাধা। গানবাজনা বোঝে না, তাই ঢোলটি নিয়ে বনে চলে এসেছিলাম। তা ভাই, এখানে যে ভয়ংকর জানোয়ারের ডাক শুনেছি, তার সামনে পড়লে আর প্রাণটি থাকবে না তাই পালিয়ে যাচ্ছি।'

গুপি বললে, 'তাই ত! আমিও যে একটা জানোয়ারের ডাক শুনেই যাচ্ছিলাম। বলো ত, তুমি জানোয়ারটাকে কোথায় বসে ডাকতে শুনেছিলে?'

বাঘা বললে, 'বনের পূর্বধারে, বটগাছের তলায়।'

গুপি বললে, 'আচ্ছা, সে যে আমারই গান শুনেছ! সে কেন জানোয়ারের ডাক হবে? সেই জানোয়ারটা ডাকে বনের পশ্চিম ধারে, হরতুকীতলায় বসে।'

বাঘা বললে, সে ত আমার ঢোলকের আওয়াজ, আমি যে ঐখানে থাকতাম।

এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল যে, তারা তাদের নিজেদের গান আর বাজনা শুনেই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তখন দুজনার যে হাসি! অনেক হেসে তারপর গুপি বললে, 'ভাই, আমি যেমন গাইন, তুমি তেমনি বাইন। আমরা দুজনে জুটলে নিশ্চয় একটা কিছু করতে পারি।'

এ কথায় বাঘারও খুবই মত হলো। কাজেই তারা খানিক কথাবার্তার পর ঠিক করল যে, তারা দুজনায় মিলে রাজামশাইকে গান শোনাতে যাবে। রাজামশাই যে তাতে খুব খুশি হবেন, তাতে ত আর ভুলই নেই, চাই কি অর্ধেক রাজ্য বা মেয়ের সঙ্গে বিয়েও দিয়ে ফেলতে পারেন।

গুপি আর বাঘার মনে এখন খুবই আনন্দ, তারা রাজাকে গান শোনাতে যাবে। দুজনে হাসতে হাসতে আর নাচতে নাচতে এক প্রকাণ্ড নদীর ধারে এসে উপস্থিত হলো। সেই নদী পার হয়ে রাজবাড়ি যেতে হয়।

নদীতে খেয়া আছে, কিন্তু নেয়ে পয়সা চায়। বেচারারা বন থেকে এসেছে, পয়সা কোথায় পাবে! তারা বলল, 'ভাই, আমাদের কাছে ত পয়সা-টয়সা

নেই, আমরা না হয় তোমাদের গেয়ে বাজিয়ে শোনাব, আমাদের পার করে দাও।' তাতে খেয়ার চড়নদারেরা খুব খুশি হয়ে নেয়েকে বলল, 'আমরা চাঁদা করে এদের পয়সা দেব, তুমি এদের তুলে নাও।'

বাঘার ঢোলটি দেখেই নেয়েরও বাজনা শুনতে ভারি সাধ হয়েছিল, কাজেই সে এই কথায় আর কোন আপত্তি করল না। গুপিকে আর বাঘাকে তুলে নিয়ে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হলো। নৌকো-ভরা লোক, বসে বাজাবার জায়গা কোথায় হবে? অনেক কষ্টে সকলের মাঝখানে খানিকটা জায়গা হতে হতে নৌকোও নদীর মাঝখানে এসে পড়ল। তারপর খানিক একটু গুনগুনিয়ে গুপি গান ধরল, বাঘা তার ঢোলকে লাঠি লাগাল, আর অমনি নৌকোসুদ্ধ সকল লোক বিষম চমকে গিয়ে গড়াগড়ি আর জড়াজড়ি করে দিল নৌকোখানাকে উলটে।

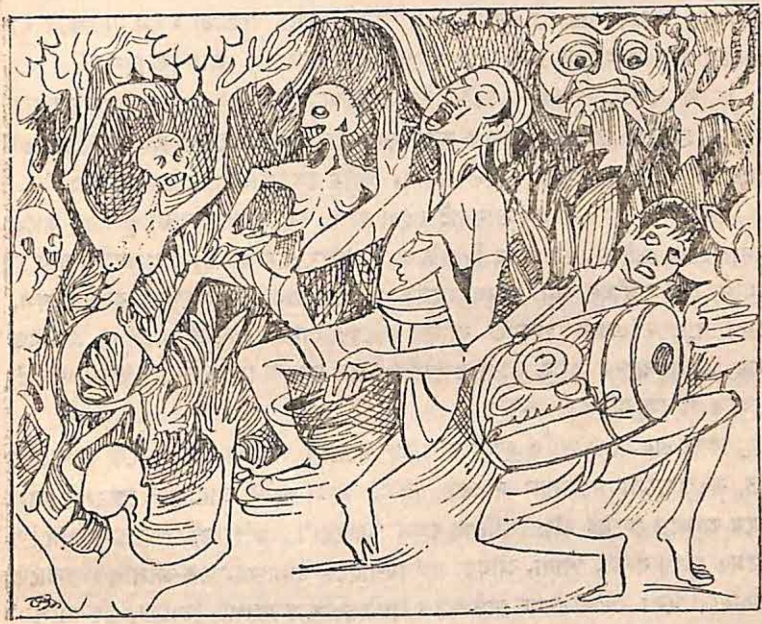
তখন ত আর বিপদের অন্ত নেই। ভাগ্যিস বাঘার ঢোলকটি এত বড় ছিল, তাই আঁকড়ে ধরে দুজনার প্রাণরক্ষা হলো। কিন্তু তাদের আর রাজবাড়ি যাওয়া ঘটল না। তারা সারাদিন সেই নদীর স্রোতে ভেসে শেষে সন্ধ্যাবেলায় এক ভীষণ বনের ভিতরে গিয়ে কুলে ঠেকল। সে বনে দিনের বেলায় গেলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়, রাত্রির ত আর কথাই নেই। তখন বাঘা বলল, 'গুপিদা, বড়ই ত বিপদ দেখছি! এখন কি করি বল ত?' গুপি বলল, 'করব আর কি? আমি গাইব, তুমি বাজাবে। নিতান্তই যখন বাঘে খাবে, তখন আমাদের বিদ্যেটা তাকে না দেখিয়ে ছাড়ি কেন?'

বাঘা বলল, 'ঠিক বলেছ দাদা। মরতে হয় ত ওস্তাদ লোকের মতন মরি, পাড়াগেঁয়ে ভুতের মত মরতে রাজি নই।'

এই বলে দুজনায় সেই ভিজা কাপড়েই প্রাণ খুলে গান-বাজনা শুরু করল। বাঘার ঢোলটি সেদিন কিনা ভিজা ছিল, তাইতে তার আওয়াজটি হয়েছিল যার-পর-নাই গম্ভীর। আর গুপিও ভাবছিল, এই তার শেষ গান, কাজেই তার গলার আওয়াজটিও খুবই গম্ভীর হয়েছিল। সে গান যে কি জমাট হয়েছিল, সে আর কি বলব? এক ঘণ্টা দুঘণ্টা করে দুপুর রাত হয়ে গেল, তবু তাদের সে গান থামছেই না।

এমন সময় তাদের দুজনারই মনে হলো, যেন চারিদিকে একটা কি কাণ্ড হচ্ছে। ঝাপসা ঝাপসা, কালো কালো, এই বড় বড় কি যেন সব গাছের উপর থেকে উঁকি মারতে লেগেছে; তাদের চোখগুলো জ্বলছে যেন আগুনের ভাঁটা, দাঁতগুলো বেরুচ্ছে যেন মুলোর সার। তা দেখে তখনই আপনা হতে বাঘার বাজনা থেমে গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে দুজনার হাত-পা গুটিয়ে, পিঠ বেঁকে, ঘাড় বসে, চোখ বেরিয়ে মুখ হাঁ করে এল। তাদের গায়ে এমনি কাঁপুনি আর দাঁতে এমনি ঠকঠাক ধরে গেল যে, আর তাদের ছুটে পালাবারও জো রইল না।

ভূতগুলি কিন্তু তাদের কিছু করল না, তারা তাদের গানবাজনা শুনে ভারি খুশি হয়ে এসেছে, তাদের রাজার ছেলের বিয়েতে গুপি আর বাঘার বায়না করতে। গান থামতে দেখে তারা নাকিসুরে বলল, 'থামলি কেন বাপ? বাজা, বাজা, বাজা!'



এ কথায় গুপি আর বাঘার একটু সাহস হলো; তারা ভাবল, এ ত মন্দ মজা নয়, তবে একটু গেয়েই দেখি না। এই ভেবে যেই তারা আবার গান ধরেছে, অমনি ভূতেরা একজন দুজন করে গাছ থেকে নেমে এসে তাদের ঘিরে নাচতে লাগল।

সে যে কি কাণ্ডকারখানা হয়েছিল, সে না দেখলে কি বোঝবার জো আছে। গুপি আর বাঘা তাদের জীবনে আর কখনো এমন সমঝদারের দেখা পায় নি। সে রাত এমনি ভাবেই কেটে গেল। ভোর হলে ত আর ভূতেদের বাইরে থাকবার জো নেই, কাজেই তার একটু আগেই তারা বলল, 'চল বাবা, মোদের গোদার বেটার বেঁতে। তোদের খুশি করে দিব।'

গুপি বলল, 'আমরা যে রাজবাড়ি যাব!' ভূতেরা বলল, 'সে যাবি এখন, আগে মোদের বাড়ি একটু গানবাজনা শুনিয়ে যা। তোদের খুশি করে দিব!'

কাজেই তখন তারা দুজনে ঢোল নিয়ে ভূতেদের বাড়ি চলল। সেখানে গানবাজনা যা হল, সে আর বলে কাজ নেই। তারপর বিদায় করবার সময় ভূতেরা বলল, 'তোরা কি চাস?'

গুপি বলল, 'আমরা এই চাই যে, আমরা যেন গেয়ে বাজিয়ে সকলকে খুশি করতে পারি।' ভূতেরা বলল, 'তাই হবে, তোদের গানবাজনা শুনলে আর সে গান শেষ হওয়ার আগে কেউ সেখান থেকে উঠে যেতে পারবে না। আর কি চাস?'

গুপি বলল, 'আর এই চাই যে, আমাদের যেন খাওয়া-পরার কষ্ট না হয়।' এ কথায় ভূতেরা তাদের একটি থলে দিয়ে বলল, 'তোরা যখন যা খেতে বা পরতে চাস, এই থলের ভেতরে হাত দিলেই তা পাবি। আর কি চাস?'

গুপি বলল, 'আর কি চাইব, তা ত বুঝতে পারছি না।' তখন ভূতেরা হাসতে হাসতে তাদের দুজনকে দুজোড়া জুতো এনে দিয়ে বলল, 'এই জুতো পায়ে দিয়ে তোরা যেখানে যেতে চাইবি, অমনি সেখানে গিয়ে হাজির হবি।'

তখন ত আর কোন ভাবনাই রইল না। গুপি আর বাঘা ভূতদের কাছে বিদায় হয়ে, সেই জুতো পায়ে দিয়েই বলল, 'তবে আমরা এখন রাজবাড়ি যাব।' অমনি সেই ভীষণ বন কোথায় যেন মিলিয়ে গেল; গুপি আর বাঘা দেখল, তারা দুজনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় আর এমন সুন্দর বাড়ি তারা তাদের জীবনে কখনো দেখে নি। তারা তখনই বুঝতে পারল যে, এ রাজবাড়ি।

কিন্তু এর মধ্যে ভারি একটা মুশকিল হলো। রাজবাড়ির ফটকে যমদূতের মত কতকগুলো দরোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল, তারা গুপি আর বাঘাকে সেই ঢোল নিয়ে আসতে দেখেই দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'এইয়ো। কাঁহা যাতা হ্যায়?' গুপি থতমত খেয়ে বলল, 'বাবা, আমরা রাজামশাইকে গান শোনাতে এসেছি। তাতে দরোয়ানগুলো আরো বিষম চটে গিয়ে লাঠি দেখিয়ে বলল, 'ভাগো, হিঁয়াসে।' গুপিও তখন নাক সিঁটকিয়ে বলল, 'ঈস্। আমরা ত রাজার কাছে যাবই।' বলতেই অমনি সেই জুতোর গুণে, তারা তৎক্ষণাৎ রাজামশায়ের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো।

রাজবাড়ির অন্দরমহলে রাজামহাশয় ঘুমিয়ে আছেন, রানী তাঁর মাথার কাছে বসে তাঁকে হাওয়া করছেন, এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, গুপি আর বাঘা সেই সর্বনেশে ঢোল নিয়ে হঠাৎ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো। জুতোর এমনি গুণ, দরজা জানালা সব বন্ধ রয়েছে, তাতে তাদের একটুও আটকায় নি। কিন্তু আসবার বেলা আটকাক, আর নাই আটকাক, আসবার পরে খুবই আটকাল। রানী তাদের দেখে বিষম ভয় পেয়ে, এক চিৎকার দিয়ে তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। রাজামশায় লাফিয়ে উঠে পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগলেন; রাজবাড়িময় হুলুস্থুল পড়ে গেল। সিপাহী সান্ত্রী সব খাঁড়া ঢাল নিয়ে ছুটে এল।

বেগতিক দেখে গুপি আর বাঘার মাথায় গোল লেগে গেল। তারা যদি তখন শুধু বলে, 'আমরা এখান থেকে অমুক জায়গায় চলে যাব', তবেই তাদের

জুতোর গুণে সকল ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু সেকথা তাদের মনেই হলো না। তারা গেল ছুটে পালাতে, আর দু-পা যেতে না যেতেই বেচারারা যে মারটা খেল! জুতো, লাঠি, চাবুক, কিল, চড়, কানমলা কিছুই তাদের বাকি রইল না। শেষে রাজামশাই হুকুম দিলেন, 'বেটাদের নিয়ে তিনদিন হাজতে ফেলে রাখো। তারপর বিচার করে, হয় এদের মাথা কাটব, না হয় কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।'

হায় গুপি! হায় বাঘা! বেচারারা এসেছিল রাজাকে গান শুনিয়ে কতই বকশিশ পাবে ভেবে, তার মধ্যে এ কি বিপদ? পেয়াদারা তাদের হাত বেঁধে মারতে মারতে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে ফেলে রাখল। সেখানে পড়ে বেচারারা গায়ের ব্যথায় একদিন আর নড়তে চড়তে পারল না। তাতে তেমন দুঃখ ছিল না, কিন্তু বাঘার ঢোলটি যে গেল, সেই হলো সর্বনাশের কথা! বাঘা বুক মাথা চাপড়িয়ে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদছে, আর বলছে, 'ও গুপিদা!—ওঃ-ওঃ-হ-হ-হ-হ-অ-অ। আরে ও গুপিদা। মার খেলাম, প্রাণ যাবে তাতে দুঃখ নেই—কিন্তু দাদা, আমার ঢোলটি যে গেল।'

গুপির কিন্তু ততক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। সে বাঘার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'ভয় কি দাদা? ঢোল গিয়েছে, জুতো আর থলে ত আছে। আমরা নিতান্ত বেকুব, তাই এতগুলো মার খেলাম। যা হোক, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন এর ভিতর থেকে একটা মজা করে নিতে হবে।' বাঘা এ কথায় একটু শান্ত হয়ে বলল, 'আগে ত খাবার মজাটা করে নিই, তারপর অন্য মজার কথা ভেবে দেখব এখন।'

এই বলে সেই ভুতের দেওয়া থলির ভিতর হাত দিয়ে বলল, 'দাও ত দেখি, এক হাঁড়ি পোলাও।' অমনি একটা সুগন্ধ যে বেরুল, তেমন পোলাও রাজারাও সচরাচর খেতে পান না। আর সে কি বিশাল হাঁড়ি! গুপি কি সেটা থলির ভিতর থেকে তুলে আনতে পারে? যা হোক, কোনমতে সেটাকে বার করে এনে তারপর থলিকে বলল, 'ভাজা, ব্যাঞ্জন, চাটনি, মিঠাই, দই, রাবড়ি, শরবত।—শিগগির শিগগির দাও।' দেখতে দেখতে খাবার জিনিসে আর সোনা-রুপোর বাসনে ঘর ভরে গেল। দুজন লোকে আর কত খাবে? সে অপূর্ব খাবার খেয়ে তাদের গায়ের ব্যথা কোথায় চলে গেল তার আর ঠিক নেই।

তখন বাঘা বলল, 'দাদা চল এই বেলা এখান থেকে পালাই, নইলে শেষে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে।' গুপি বলল, 'পাগল হয়েছ নাকি? আমাদের এমন জুতো থাকতে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে? দেখাই যাক না।' এ কথায় বাঘা খুশি হলো; সে বুঝতে পারল যে গুপিদা একটা কিছু মজা করবে।

দুদিন চলে গেল, আর একদিন পরেই রাজা তাদের বিচার করবেন। বিচারের দিন রাত থাকতে উঠে গুপি থলের ভিতর হাত দিয়ে বলল, 'আমাদের দুজনের রাজপোশাক চাই।' বলতেই তার ভিতর থেকে এমন সুন্দর পোশাক বেরুল যে

তেমন পোশাক কেউ তয়েরই করতে পারে না। তারা দুজন সেই পোশাক পরে, তাদের পুরনো কাপড় বাসন কখানি পুঁটলি বেঁধে নিয়ে, জুতো পায়ে দিয়ে তারা বলল, 'এখন আমরা মাঠে হাওয়া খেতে যাব।' অমনি দেখে, রাজবাড়ির বাইরের প্রকাণ্ড মাঠে চলে এসেছে। সে মাঠের এক জায়গায় তাদের পুঁটুলিটি লুকিয়ে রেখে, তারা বেড়াতে বেড়াতে রাজবাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলো।

দূর থেকে তাদের আসতে দেখেই রাজার লোক ছুটে গিয়ে তাকে খবর দিয়েছিল যে, "মহারাজ, দুজন রাজা আসছেন।' রাজাও তা শুনে তার ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাঘা আর গুপি আসতেই তিনি তাদের যার-পর নাই আদর দেখিয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন। চমৎকার একটি ঘরে তাদের বসতে দেওয়া হলো। কত চাকর, বামন, পেয়াদা, পাইক তাদের সেবাতে লেগে গেল তার অন্ত নেই।

তারপর গুপি আর বাঘা হাত-পা ধুয়ে জলযোগ করে একটু ঠাণ্ডা হলেই রাজামশাই আবার তাদের খবর নিতে এলেন। তাদের পোশাক দেখে অবধিই তিনি ভেবে নিয়েছেন যে, 'না-জানি এরা কত বড় রাজাই হবেন।' তারপর শেষে যখন তিনি গুপিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কোন্ দেশের রাজা?' তখন গুপি হাত জোড় করে তাকে বলল, 'মহারাজা, আমরা কি রাজা হতে পারি? আমরা আপনার চাকর।'

গুপি সত্য কথাই বলেছিল, কিন্তু রাজার তাতে বিশ্বাস হলো না। তিনি ভাবলেন, কি ভাল মানুষ, কেমন নরম হয়ে কথা বলে। যেমন বড় রাজা তেমনি ভদ্রলোকও দেখছি। তিনি তখন আর বিশেষ কিছু না বলে তাদের দুজনকে তার সভায় নিয়ে এলেন। সেখানে সেদিন দুটো লোকের বিচার হবে— তিনদিন আগে যারা তার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। বিচারের সময় উপস্থিত, আসামী দুটোকে আনতে পেয়াদা গিয়েছে, কিন্তু তাদের আর কোথায় পাবে? এ তিনদিন তাদের ঘরে তালা বন্ধ ছিল, সেই তালা খুলে দেখা হলো, সেখান কেউ নেই, খালি ঘর পড়ে আছে।

তখন ত ভারি একটা ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি পড়ে গেল। দারোগামশাই বিষম ক্ষেপে গিয়ে পেয়াদাগুলোকে বকতে লাগলেন। পেয়াদারা হাত জোড় করে বলল, 'হুজুর। আমাদের কোন কসুর নেই; আমরা তালা দিয়ে রেখেছিলাম, তার উপর আবার আগাগোড়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ও দুটো তো মানুষ ছিল না, ও দুটো ছিল ভুত, নইলে এর ভিতর থেকে কি করে পালাল?'

এ কথা সকলেরই বিশ্বাস হলো। রাজামশাইও প্রথমে দারোগার উপর রেগে তাকে কেটেই ফেলতে গিয়েছিলেন, শেষে ঐ কথা শুনে বললেন, 'ঠিক, ও দুটো নিশ্চয় ভুত। আমার ঘরও ত বন্ধ ছিল, তার ভিতরে এত বড় ঢোল নিয়ে কি করে ঢুকেছিল?'

তা শুনে সকলেই বলল, 'হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, ও দুটো ভূত।' বলতে বলতেই তাদের শরীর শিউরে উঠল, গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল। তখন তারা বাঘার সেই ঢোলকটির কথা মনে করে বলল, 'মহারাজ, ভূতের ঢোল বড় সর্বনেশে জিনিস। ওটাকে কখনো আপনার ঘরে রাখবেন না। ওটাকে এখনি পুড়িয়ে ফেলুন।'

রাজামশাইও বললেন, 'বাপ রে! ভূতের ঢোল ঘরে রাখব? এক্ষুনি ওটাকে এনে পোড়াও।'

যেই এ কথা বলা, অমনি বাঘা দু হাতে চোখ ঢেকে 'হাউ-হাউ-হাউ' করে কেঁদে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

সেদিন বাঘাকে নিয়ে গুপির কি মুশকিলই হয়েছিল। ঢোল পোড়াবার নাম শুনেই বাঘা কাঁদতে আরম্ভ করেছে, ঢোল এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে না জানি সে কি করবে। তখন, সেটা যে তারই ঢোল, সে কথা কি আর বাঘা সামলে রাখতে পারবে? কি সর্বনাশ! এখন বুঝি ধরা পড়ে প্রাণটাই হারাতে হয়।

গুপির বড় ইচ্ছা হচ্ছিল যেন বাঘাকে নিয়ে পালায়। কিন্তু তার ত আর জো নেই; সভায় বসবার জায়গায় সেই জুতোগুলো পা থেকে খুলে রাখা হয়েছে।

এদিকে কিন্তু বাঘার কাণ্ড দেখে সভাময় এক হুলুস্থুল পড়ে গেছে। সবাই ভাবছে, বাঘার নিশ্চয় একটা ভারি অসুখ হয়েছে, আর সে বাঁচবে না। রাজবাড়ির বদ্যিঠাকুর এসে বাঘার নাড়ী দেখে যার-পর-নাই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। বাঘাকে খুব করে জোলাপের ওষুধ খাইয়ে তার পেটে বেলেস্তারা লাগিয়ে দেওয়া হলো। তারপর বদ্যিঠাকুর বললেন, 'এতে যদি বেদনা না সারে, তবে পিঠে আর-একটা, তাতেও না সারলে দুপাশে আর দুটো বেলেস্তারা লাগাতে হবে।'

এ কথা শুনেই বাঘার কান্না তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। তখন সকলে ভাবল যে বদ্যিঠাকুর কি চমৎকার ওষুধ দিয়েছেন, দিতে দিতেই বেদনা সেরে গেছে।

যা হোক, বাঘা যখন দেখল যে তার কান্নাতে ঢোলে পোড়াবার কথাটা চাপা পড়ে গেছে, তখন সেই বেলেস্তারার বেদনার ভিতরেই তার মনটা কতক ঠাণ্ডা হলো। রাজামশাই তখন তাকে খুব যত্নের সঙ্গে তার ঘরে শুইয়ে রেখে এলেন; গুপি তার কাছে বসে বেলেস্তারায় হাওয়া করতে লাগল।

তারপরে সকলে ঘর থেকে চলে গেলে গুপি বাঘাকে বলল, 'ছি ভাই, যেখানে সেখানে কি এমন করে কাঁদতে আছে। দেখ দেখি, এখন কি মুশকিলটা হলো।' বাঘা বলল, 'আমি যদি না কাঁদতুম, তা হলে ত এতক্ষণে আমার ঢোলকটিকে পুড়িয়ে শেষ করে দিত। এখন না হয় একটু জ্বলুনি সইতে হচ্ছে, আমার ঢোলকটা ত বেঁচে গেছে।'

বাঘা আর গুপি এমনি কথাবার্তা বলছে, এদিকে রাজামশাই সভায় ফিরে এলে দারোগামশাই তার কানে কানে বললেন, 'মহারাজ, একটা কথা আছে, অনুমতি হয় ত বলি। রাজা বললেন, 'কি কথা?' দারোগা বললেন, 'মহারাজ, ঐ যে লোকটা গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল, সে আর তার সঙ্গের ঐ লোকটা, সেই দুটো ভুত; আমি তাদের চিনতে পেরেছি।' রাজা বললেন, 'তাই ত হে, আমারও একটু যেন সেই রকম ঠেকছিল। তা হলে ত বড় মুশকিল দেখছি। বলো ত এখন কি করা যায়?'

তখন এ কথা নিয়ে সভার মধ্যে ভারি একটা কানাকানি শুরু হলো। কেউ বলল, 'রোজা ডাকো, ও দুটোকে তাড়িয়ে দিক।' আর একজন বলল, 'রোজা যদি তাড়াতে না পারে, তখন ত সে দুটো ক্ষেপে গিয়ে একটা বিষম কিছু করতে পারে। তার চেয়ে কেন রাত্রে ঘুমের ভিতরে ও দুটোকে পুড়িয়ে মারুন না।' এ কথাটা সকলেরই খুব পছন্দ হলো, কিন্তু এর মধ্যে একটু মুশকিল এই দেখা গেল যে ভূতেদের পোড়াতে গেলে রাজবাড়িতেও আগুন ধরে যেতে পারে। শেষে অনেক যুক্তির পর এই স্থির হলো যে, একটা বাগানবাড়িতে তাদের বাসা দেওয়া হবে; বাগানবাড়ি পুড়ে গেলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। রাজামশাই বললেন, 'সেই ঢোলকটাও তা হলে সেই বাগানবাড়িতে নিয়ে রাখা যাক; বাগানবাড়ি পোড়াবার সময় একসঙ্গে সকল আপদ চুকে যাবে।'

বাগানবাড়ি যাবার কথা শুনে গুপি আর বাঘা খুব খুশি হলো। তারা ত জানে যে এর ভিতর ভয়ানক ফন্দি রয়েছে; তারা খালি ভাবল যে বেশ আরামে নিরিবিলি থাকা যাবে, সংগীতচর্চারও সুবিধা হতে পারে। জায়গাটি খুবই নিরিবিলি আর সুন্দর। বাড়িটি কাঠের, কিন্তু দেখতে চমৎকার। সেখানে গিয়ে দেখতে দেখতে বাঘা ভাল হয়ে গেল। তখন গুপি তাকে বলল, 'ভাই, আর এখানে থেকে কাজ কি? চলো, আমরা এখান থেকে চলে যাই।' বাঘা বলল, 'দাদা, এমন সুন্দর জায়গায় ত আর থাকতে পাব না, দুদিন এখানে রইলাম বা। আহা, আমার ঢোলকটি যদি থাকত!'

সেদিন বাঘা বাড়ির এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুপি বাগানের এক জায়গায় বসে গুনগুন করছে, এমন সময় হঠাৎ বাঘা ভয়ানক চেঁচামেচি করে উঠল। তার সকল কথা বোঝা গেল না, 'খালি ও গুপিদা! ও গুপিদা!' ডাকটা খুবই শোনা যেতে লাগল। গুপি তখন ছুটে এসে দেখল যে, বাঘা তার সেই ঢোলকটা মাথায় করে পাগলের মত নাচছে, আর যা-তা আবোল-তাবোল বলতে বলতে 'গুপিদা গুপিদা' বলে চেঁচাচ্ছে। ঢোলক পেয়ে তার এত আনন্দ হয়েছে যে, সে আর কিছুতেই স্থির হতে পারছে না, গুছিয়ে কথাও বলতে পারছে না। এমনি করে প্রায় আধঘণ্টা চলে গেলে পর বাঘা একটু শান্ত হয়ে বলল, 'গুপিদা, দেখছ কি, এই ঘরে আমার ঢোলকটি—আর কি মজা—হাঃ হাঃ হাঃ বলে আবার সে মিনিট দশেক খুব নেচে নিল। তারপর সে

বলল, দাদা, এত দুঃখের পর ঢোলকটি পেয়েছি, একটা গান গাও, একটু বাজিয়ে নিই।' গুপি বলল, 'এখন নয় ভাই, এখন বড্ড খিদে পেয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রে বারান্দায় খুব করে গান-বাজনা করা যাবে।'

রাজামশাই কিন্তু ঠিক করেছেন, সেই রাত্রেই তাদের পুড়িয়ে মারবেন। দারোগার উপর হুকুম হয়েছে যে, সেদিন সন্ধ্যার সময় সেই বাগানবাড়িতে মস্ত ভোজের আয়োজন করতে হবে। দারোগামশাই পঞ্চাশ-ষাটজন লোক নিয়ে সেই ভোজে উপস্থিত থাকবেন, খাওয়া-দাওয়ার পর গুপি আর বাঘা ঘুমিয়ে পড়লে, তারা সকলে মিলে একসঙ্গে সেই কাঠের বাড়ির চারদিকে আগুন দিয়ে তাদের পালাবার পথ বন্ধ করবেন।

সেদিনকার খাওয়া বেশ ভালমতই হলো। গুপি আর বাঘা ভাবল যে লোকজন চলে গেলেই তারা গান-বাজনা আরম্ভ করবে; দারোগামশাই ভাবলেন যে গুপি আর বাঘা ঘুমোলেই ঘরে আগুন দেবেন। তিনি তাদের ঘুম পাড়াবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তার ভাব দেখে যখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে, তারা না ঘুমোলে তিনি সেখান থেকে যাবেন না, তখন গুপি বাঘাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় পড়ে নাক ডাকতে লাগল।

একটু পরেই গুপি আর বাঘা দেখল যে লোকজন সব চলে গেছে, আর কারু সাড়াশব্দ নেই। তারপর আর-একটু দেখে যখন মনে হলো যে বাগান একেবারে খালি হয়ে গেছে, তখন তারা দুজনে বারান্দায় এসে ঢোল বাজিয়ে গান জুড়ে দিল।

এদিকে দারোগামশাই তার লোকদের বলে দিয়েছেন, 'তোরা প্রত্যেক দরজায় বেশ ভাল করে আগুন ধরাবি; খবরদার আগুন ভাল করে না ধরলে চলে যাস নি যেন!' তিনি নিজে গিয়েছেন সিঁড়িতে আগুন ধরাতে। আগুন বেশ ভালমতই ধরেছে, দারোগামশাই ভাবছেন, 'এই বেলা ছুটে পালাই' এমন সময় বাঘার ঢোল বেজে উঠল, গুপিও গান ধরে দিল। তখন আর দারোগা-মশাই বা লোকদের কারু সেখান থেকে নড়বার জো রইল না, সকলকেই পুড়ে মরতো হলো। ততক্ষণে গুপি আর বাঘাও আগুন দেখতে পেয়ে, তাদের জুতোর জোরে, তাদের ঢোল আর থলেটি নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল।

সেদিনকার আগুনে দারোগামশাই ত পুড়ে মারা গিয়েছিলেনই, তার দলের অতি অল্প লোকই বেঁচেছিল। সেই লোকগুলো গিয়ে রাজামশাইকে এই ঘটনার খবর দিতে তার মনে বড়ই ভয় হলো। পরদিন আর দু-চার জন লোক রাজসভায় এসে বলল যে, তারা সেই আগুনের তামাশা দেখতে সেখানে গিয়েছিল; তারা তখন ভারি আশ্চর্য রকমের গান-বাজনা শুনেছে, আর ভূত দুটোকে স্বচক্ষে শূন্যে উড়ে পালাতে দেখেছে। তখন যা রাজামশায়ের কাঁপুনি! সেদিন তার সভা করা হলো না। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে এসে ভূতের

ভয়ে দরজা এঁটে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন, এক মাসের ভিতরে আর বাইরে এলেন না।

এদিকে গুপি আর বাঘা সেই আগুনের ভিতর থেকে পালিয়ে একেবারে তাদের বাড়ির কাছের সেই বনে এসে উপস্থিত হয়েছে, যেখানে প্রথমে তাদের দেখা হয়েছিল। তাদের বড় ইচ্ছা যে এত ঘটনার পর একবার তাদের মা-বাপকে দেখে যায়। বনে এসেই বাঘা বলল, 'গুপিদা, এইখানে না তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল?' গুপি বলল, 'হ্যাঁ, তবে এমন জায়গায় এসে কি একটু গান-বাজনা না করে চলে যেতে আছে?' গুপি বলল, 'ঠিক বলেছ ভাই, তবে আর দেরি কেন? এই বেলা আরম্ভ করে দাও।' এই বলে তারা প্রাণ খুলে গান-বাজনা করতে লাগল।

এর মধ্যে এক আশ্চর্য ঘটনা হয়েছে। একদল ডাকাত হাল্লার রাজার ভাণ্ডার লুটে, তার ছোট ছেলে দুটিকে সুদ্ধ চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। রাজা অনেক সৈন্য নিয়ে তাদের পিছু পিছু প্রাণপণে ছুটেও ধরতে পারছিলেন না। গুপি আর বাঘা যখন গান ধরেছে ঠিক সেই সময়ে সেই ডাকাতগুলো সেই বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে গান একবার শুনলে ত আর তার শেষ অবধি না শুনে চলে যাবার জো নেই; কাজেই ডাকাতদের তখনি সেখানে দাঁড়াতে হলো। সারা রাত্রের ভিতরে আর সে গান-বাজনাও থামল না, ডাকাতদেরও সেখান থেকে যাওয়া ঘটল না। সকালে হাল্লার রাজা এসে অতি সহজেই তাদের ধরে ফেললেন। তারপর যখন তিনি জানলেন যে, গুপি আর বাঘার গানের গুণেই তিনি ডাকাত ধরতে পেরেছেন, তখন আর তাদের আদর দেখে কে? রাজকুমারেরাও বললেন, 'বাবা, এমন আশ্চর্য গান আর কখখনো শুনি নি; এদের সঙ্গে নিয়ে চল।' কাজেই রাজা গুপি আর বাঘাকে বললেন, 'তোমরা আমার সঙ্গে চল। তোমাদের পাঁচশো টাকা করে মাইনে হলো।'

এ কথায় গুপি জোড়হাতে রাজামশাইকে নমস্কার করে বলল, 'মহারাজ, দয়া করে আমাদের দুদিনের ছুটি দিতে আজ্ঞা হোক। আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে দেখে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আপনার রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হব।'

রাজা বললেন, 'আচ্ছা, এ দুদিন আমরা এই বনেই বিশ্রাম করছি; তোমরা তোমাদের মা-বাপকে দেখে দুদিন পরে এসে এইখানেই আমাদের পাবে।'

গুপিকে তাড়িয়ে অবধি তার বাবা তার জন্য বড়ই দুঃখিত ছিল, কাজেই তাকে ফিরে আসতে দেখে তার বড় আনন্দ হলো। কিন্তু বাঘা বেচারার ভাগ্যে সে সুখ মেলে নি। তার মা-বাপ এর কয়েকদিন আগেই মারা গিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা তাকে ঢোল মাথায় করে আসতে দেখেই বলল, 'ঐ রে! সেই বাঘা বেটা আবার আমাদের হাড় জ্বালিয়ে মারবে; মার বেটাকে!' বাঘা

বিনয় করে বলল, 'আমি খালি আমার মা-বাবাকে দেখতে এসেছি ; দুদিন থেকেই চলে যাব, বাজাব-টাজাব না।' সে কথা কি তারা শোনে ? তারা দাঁত খিঁচিয়ে তার মা-বাপের মৃত্যুর কথা বলে এই বড় লাঠি নিয়ে তাকে মারতে এল ; সে প্রাণপণে ছুটে পালাতে পালাতে ইঁট মেরে তারা তার পা ভেঙ্গেমাথা ফাটিয়ে রক্তারক্তি করে দিল।

গুপি তাদের ঘরের দাওয়ায় বসে তার বাপের সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সে দেখল যে বাঘা পাগলের মত খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে ; তার কাপড় ছিঁড়ে ফালি ফালি আর রক্তে লাল হয়ে গেছে। অমনি সে তাড়াতাড়ি বাঘার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ? তোমার এ দশা কেন ?' গুপিকে দেখেই বাঘা একগাল হেসে ফেলেছে। তারপর সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দাদা, বড্ড বেঁচে এসেছি ! মূর্খগুলো আর একটু হলেই আমার ঢোলটি ভেঙ্গে দিয়েছিল !' গুপিদের বাড়ি এসে গুপির যত্নে আর তার মা-বাপের আদরে বাঘার দুদিন যতটা সম্ভব সুখেই কাটল। দুদিন পরে গুপি তার মা-বাপের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বলে গেল, 'তোমরা তয়ের হয়ে থাকবে ; আমি আবার ছুটি পেলেই এসে তোমাদের নিয়ে যাব।'

তারপর কয়েক মাস চলে গিয়েছে। গুপি আর বাঘা এখন হাল্লার রাজার বাড়িতে পরম সুখে বাস করে। দেশ বিদেশে তাদের নাম রটে গিয়েছে, 'এমন ওস্তাদ আর কখনো হয় নি হবেও না।' রাজামশাই তাদের ভারি ভালবাসেন ; তাদের গান না শুনে একদিনও থাকতে পারেন না। নিজের দুঃখ-সুখের কথা সব গুপির কাছে বলেন। একদিন গুপি দেখল রাজামশায়ের মুখখানি বড়ই মলিন। তিনি ক্রমাগতই যেন কি ভাবছেন, যেন তার কোন বিপদ হয়েছে। শেষে তিনি গুপিকে বললেন, 'গুপি, বড় মুশকিলে পড়েছি, কি হবে জানি না। শুণ্ডীর রাজা আমার রাজ্য কেড়ে নিতে আসছে।'

শুণ্ডীর রাজা হচ্ছেন সেই তিনি, যিনি গুপি আর বাঘাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তার নাম শুনেই গুপির মনে একটা চমৎকার মতলব এল। সে তখন রাজামশাইকে বলল, 'মহারাজ ! এর জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আপনার এই চাকরকে হুকুম দিন আমি এ থেকে হাসির কাণ্ড করে দেব।' রাজা হেসে বললেন, 'গুপি, তুমি গাইয়ে বাজিয়ে মানুষ, যুদ্ধের ধারও ধার না, তার কিছু বোঝও না। শুণ্ডীর রাজার বড় ভারি ফৌজ, আমি কি তার কিছু করতে পারি ?' গুপি বলল, 'মহারাজ, হুকুম পেলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। ক্ষতি ত কিছু হবে না।' রাজা বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পারো।' এ কথায় গুপি যার-পর-নাই খুশি হয়ে বাঘাকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগল।

গুপি আর বাঘা সেদিন অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করছ। বাঘার তখন কতই উৎসাহ ! সে বলল, 'দাদা এবারে আমরা দুজনে মিলে একটা কিছু

করবই করব। আমার শুধু একটা কথায় একটু ভয় হচ্ছে ; হঠাৎ যদি প্রাণ নিয়ে পালাবার দরকার হয়, তবে হয়ত আমি জুতোর কথা ভুলে গিয়ে সাধারণ লোকের মত কষে ছুট দিতে যাব, আর মার খেয়ে সারা হব। এমনি করে দেখ না, সেবারে আমাদের গাঁয়ের মুর্খগুলোর হাতে আমার কি দশা হলো !'

যা হোক, গুপির কথায় বাঘার সে ভয় কেটে গেল, আর পরদিন থেকেই তারা কাজে লাগল। দিনকতক ধরে রোজ রাত্রে তারা শুণ্ডী চলে যায়, আর রাজবাড়ির আশেপাশে ঘুরে সেখানকার খবর নেয়। যুদ্ধের আয়োজন যা যা দেখতে পেল সে বড়ই ভয়ঙ্কর। এ আয়োজন নিয়ে এরা হাল্লায় গিয়ে উপস্থিত হলে আর রক্ষা নেই। রাজার ঠাকুরবাড়িতে রোজ মহাধুমধামে পুজো হচ্ছে। দশ দিন এমনিতর পুজো দিয়ে, ঠাকুরকে খুশি করে তারা হাল্লায় রওনা হবে।

গুপি আর বাঘা এর সবই দেখল, তারপর একদিন তাদের ঘরে বসে দরজা এঁটে, সেই ভূতের দেওয়া থলিটিকে বলল, 'নতুন ধরনের মিঠাই চাই, খুব সরেস।' সে কথায় থলির ভিতর থেকে মিঠাই যা বেরুল, সে আর বলবার নয় ; তেমনি মিঠাই কেউ খায়নি, চোখেও দেখেনি ! সেই মিঠাই নিয়ে বাঘা আর গুপি শুণ্ডির রাজার ঠাকুরবাড়ির বিশাল মন্দিরের চুড়োয় গিয়ে বসল। নীচে খুব পুজোর ধুম—ধুপ-ধুনো শংখঘণ্টা কোলাহলের সীমা নেই, আঙিনায় লোকে লোকারণ্য। সেই সব লোকের মাথার উপরে ঝড়াৎ করে মিঠাইগুলো ঢেলে দিয়ে বাঘা আর গুপি মন্দিরের চুড়ো আঁকড়ে বসে তামাশা দেখতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে সেই ধুপ-ধুনো আর আলোর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কেউ তাদের দেখতে পেল না।

মিঠাইগুলো আঙিনায় পড়তে অমনি কোলাহল থেমে গেল। অনেকেই লাফিয়ে কেউ কেউ চেঁচিয়ে ছুটও দিল। তারপর দু-চারজন সাহসী লোক কয়েকটা মিঠাই তুলে, আলোর কাছে নিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। শেষে তাদের একজন চোখ বুঁজে তার একটু মুখে পুরে দিল ; দিয়েই আর কথাবার্তা নেই—সে দু হাতে আঙিনা থেকে মিঠাই তুলে খালি মুখে দিচ্ছে আর আহ্লাদে চেঁচাচ্ছে। তখন সেই আঙিনাসুদ্ধ লোক মিঠাই খাবার জন্য পাগলের মত কাড়াকাড়ি আর কিচিরমিচির করতে লাগল।

এদিকে কয়েকজন ছুটে গিয়ে রাজামশাইকে বলেছে, 'মহারাজ ! ঠাকুর আজ পুজোয় তুষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে যে কি অপূর্ব প্রসাদ, সে কথা আমরা বলতেই পারছি না।' সে কথা শুনবামাত্র রাজামশাই প্রাণপণে কাছা গুঁজতে গুঁজতে উর্ধ্বশ্বাসে এসে ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু হায় ! ততক্ষণে সব প্রসাদ শেষ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত উঠোন ঝাঁট দিয়েও রাজামশাইয়ের জন্য একটু প্রসাদের গুঁড়ো পাওয়া গেল না। তখন তিনি ভারি চটে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের কি অন্যায়। পুজো করি আমি,

আর প্রসাদ খেয়ে শেষ কর তোমরা ! আমার জন্যে একটু গুঁড়োও রাখ না। তোমাদের সকলকে ধরে শূলে চড়াব !' এ কথায় সকলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জোড়হাতে বলল, 'দোহাই মহারাজ ! আপনার প্রসাদ কি আমরা খেয়ে শেষ করতে পারি ? বাপ রে ! আমরা খেতেই ঝাঁ করে কোনখান দিয়ে প্রসাদগুলো ফুরিয়ে গেল ! আজ আমাদের আপনি মাপ করুন, কালকের যত প্রসাদ সব মহারাজ একাই খাবেন !' রাজা তাতে বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। খবরদার ! মনে থাকে যেন।'

পরদিন রাজামশাই প্রসাদ খাবেন, তাই একপ্রহর বেলা থাকতেই তিনি ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় এসে আকাশের পানে তাকিয়ে বসে আছেন। আর সকলে ভয়ে ভয়ে একটু দূরে বসে তাকে ঘিরে তামাশা দেখছে। আজ পূজোর ঘটা অন্যদিনের চেয়ে শতগুণ ; সবাই ভাবছে, দেবতা তাতে খুশি হয়ে রাজামশাইকে আরো ভাল প্রসাদ দেবেন।

রাত-দুপুরের সময় গুপি আর বাঘা আরো আশ্চর্য রকমের মিঠাই নিয়ে এসে মন্দিরের চূড়োয় বসল। আজ তাদের পরনে খুব জমকালো পোশাক, মাথায় মুকুট, গলায় হার, হাতে বালা, কানে কুণ্ডল ; তারা দেবতা সেজে এসেছে। ধোঁয়ার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু রাজামশাই আকাশের পানে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় গুপি আর বাঘা হাসতে হাসতে তার উপরে সেই মিঠাইগুলো ফেলে দিল। তাতে রাজামশাই প্রথমে একটা চিৎকার দিয়ে তিন হাত লাফিয়ে উঠলেন, তারপর তাড়াতাড়ি সামলিয়ে নিয়ে, দুহাতে মিঠাই তুলে মুখে দিতে লাগলেন, আর ধেই ধেই করে নাচনটা যে নাচলেন !

এমন সময় গুপি আর বাঘা হঠাৎ মন্দিরের চূড়ো থেকে নেমে এসে রাজার সামনে দাঁড়াল। তাদের দেখে সকলে 'ঠাকুর এসেছেন, ঠাকুর এসেছেন', বলে কে আগে গড় করবে ভেবে ঠিক পায় না ; রাজামশাই ত লম্বা হয়ে মাটিতে পড়েই রয়েছেন, আর খালি মাথা ঠুকছেন। গুপি তাকে বলল, 'মহারাজ ! তোমার নাচ দেখে আমরা বড়ই তুষ্ট হয়েছি, এসো তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি।' রাজা তা শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন ; দেবতার সঙ্গে কোলাকুলি, সে কি কম সৌভাগ্যের কথা !

কোলাকুলি আরম্ভ হলো। সকলে 'জয় জয়' বলে চেঁচাতে লাগল। সেই অবসরে গুপি আর বাঘা রাজামশাইকে খুব করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এখন তবে আমরা ঘরে যাব !' বলতে বলতেই তারা তাকে সুদ্ধ একেবারে তাদের নিজের ঘরে এসে উপস্থিত। ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় সেই লোকগুলো অনেকক্ষণ ধরে হাঁ করে আকাশের পানে চেয়ে রইল। তারপর যখন রাজামশাই আর ফিরলেন না, তখন তারা যে যার ঘরে এসে বলল, 'কি আশ্চর্যই দেখলাম। রাজামশাই সশরীরে স্বর্গে গেলেন। দেবতারা নিজে তাকে নিতে এসেছিলেন।'

এদিকে রাজামশাই গুপি আর বাঘার কোলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন,

তাদের ঘরে এসেও অনেকক্ষণ তার জ্ঞান হয় নি। ভোরের বেলায় তিনি চোখ মেলে দেখলেন যে, সেই দুটো ভূত তার মাথার কাছে বসে আছে। অমনি তিনি তাদের পায়ে পড়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'দোহাই বাবা। আমাকে খেয়ো না। আমি দুশো মোষ মেরে তোমাদের পুজো করব।'

গুপি বলল, 'মহারাজ, আপনার কোন ভয় নেই। আমরা ভূতও নই, আপনাকে খেতেও যাচ্ছি না।' রাজামশাইয়ের কিন্তু তাতে একটুও ভরসা হলো না। তিনি আর কোন কথা না বলে মাথা গুঁজে বসে কাঁপতে লাগলেন।

এদিকে বাঘা এসে হাল্লার রাজাকে বলল, 'কাল রাত্রে আমরা শুণ্ডীর রাজাকে ধরে এনেছি; এখন কি আজ্ঞা হয়?' হাল্লার রাজা বললেন, 'তাঁকে নিয়ে এসো।'

দুই রাজায় যখন দেখা হলো, তখন শুণ্ডীর রাজা বুঝতে পারলেন যে তাঁকে ধরে এনেছে। হাল্লা জয় করা ত তাঁর ভাগ্যে ঘটলই না, এখন প্রাণটিও যাবে। কিন্তু হাল্লার রাজা তাকে প্রাণে না মেরে শুধু তার রাজ্যই কেড়ে নিলেন। তারপর তিনি গুপি আর বাঘাকে বললেন, 'তোমরাই আমাকে বাঁচিয়েছ, নইলে হয়ত আমার রাজ্যও যেত, প্রাণও যেত। আমি আর তোমাদের কি উপকার করতে পারি? শুণ্ডীরাজ্যের অর্ধেক আর আমার দুটি কন্যা তোমাদের দুজনকে দান করলাম।'

তখন খুবই একটা ধুমধাম হলো। গুপি আর বাঘা হাল্লার রাজার জামাই হয়ে আর শুণ্ডীর অর্ধেক রাজ্য পেয়ে পরম আনন্দে সংগীতের চর্চা করতে লাগল। গুপির মা-বাপের মান্য আর সুখ তখন দেখে কে?

## লাল সুতো আর নীল সুতো

এক জোলা একদিন তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'আমি পায়েস খাব, পায়েস রেঁধে দাও।' জোলার স্ত্রী বলিল, 'ঘরে কাঠ নেই, কাঠ এনে দাও, পায়েস রেঁধে দিচ্ছি।' জোলা কাঠ আনিতে গেল।

পথের ধারে একটা বড় আম গাছ, তাহার একটা শুকনো ডালের আগায় বসিয়া জোলা তাহারই গোড়ার দিকটা কাটিতেছে। তাহা দেখিয়া পথের একজন লোক ডাকিয়া বলিল, 'ওহে, ও ডাল কেটো না, কাটলে পড়ে যাবে।' জোলা বিরক্ত হইয়া বলিল, 'তুমি গুণতে জান নাকি? ও ডাল কাটলে পড়ে যাব, তা তুমি কি করে জানলে? আমি পায়েস খাব না বুঝি!' পথের

লোক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। আর, খানিক পরে জোলাও ডালসুদ্ধ পড়িয়া গেল।

গাছ হইতে পড়িয়াই জোলা ভাবিল, তাই তা! আমি যে পড়ে যাব, তা ও জানলে কি করে? ও নিশ্চয় একটা কেউ হবে। এই ভাবিয়া জোলা ছুটিয়া গিয়া সেই পথিকের পা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রভু, আপনি কে? আমি কবে মরব, সেটি আমাকে বলে দিন।' পথিক ভারি মুশকিলেই পড়িল। জোলার খুব বিশ্বাস হইয়াছে যে, পথিক সামান্য পথিক নয়; সুতরাং তাহার প্রশ্নের উত্তর না পাইলে তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতেছে না। শেষটা পথিক যখন দেখিল যে, একটা কিছু না বলিলে তাহার আর ঘরে যাওয়া হইতেছে না, তখন সে রাগিয়া বলিল, 'তোর পেটের ভিতর থেকে লাল সুতো আর নীল সুতো যখন বেরুবে, তখন তুই মরবি।' এই কথায় জোলা সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ি ফিরিল।

এখন হইতে জোলা ঠিক হইয়া বসিয়া আছে যে, লাল সুতা আর নীল সুতা বাহির হইলেই তাহার মৃত্যু। সুতরাং সে রোজ পরীক্ষা করিয়া দেখে, তাহা বাহির হইল কি না। এইরূপ পরীক্ষা করিতে গিয়া একদিন সত্য সত্যই কাপড়ে একখণ্ড লাল সুতা আর একখণ্ড নীল সুতা পাইল। আর অমনি সে চিৎকার করিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'ওগো শিগ্‌গির এস, আমি মরে গিয়েছি—আমার লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছে।' তাহার স্ত্রী আসিয়া দেখিল, সত্যই লাল সুতা আর নীল সুতা। তখন সে বেচারা কি করে, জোলাকে বিছানায় শোয়াইয়া কাপড় চাপা দিয়া কাঁদিতে বসিল। এর মধ্যে আর দু-চারজন জোলা বেড়াইতে আসিয়া দেখে যে, জোলার স্ত্রী কাঁদিতেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিল যে, লাল সুতা নীল সুতা পাওয়া গিয়াছে তখন সকলে স্থির করিল যে, জোলা নিশ্চয় মরিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার সৎকারের চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

কিন্তু ইহার মধ্যে ভারি মুশকিল দেখা দিল। পোড়ানোতে জোলা কিছুতেই রাজি নয়। পোড়ানোর কথা তুলিতেই সে বলে, 'ও মা! পুড়ে যাব যে!' মরিয়া গেলে তাহাকে পোড়ানো ছাড়া আর কি করা যায়?—গোর দেওয়া। কিন্তু জোলা তাহাতেও অসম্মত। বলে, 'ও মা! দম আটকে যাবে যে!' শেষে অনেক যুক্তির পর স্থির হইল যে, জোলাকে গোর দেওয়াই হইবে, কিন্তু মুখখানা জাগাইয়া রাখা যাইবে। জোলা তাহাতে রাজি হইল, কিন্তু সে বলিল, 'খিদে পেলে চারটি ভাত দিয়ো।' এইরূপ পরামর্শের পর জোলাকে গোর দেওয়া হইল, অর্থাৎ তাহার মুখ জাগিয়া রহিল, আর সব মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিল।

এইরূপে সমস্ত দিন চলিয়া গেল। রাত্রিতে চারটি ভাত খাইয়া জোলা একটু নিদ্রার চেষ্টা দেখিল।

সেই রাত্রিতে সাত চোর রাজার বাড়িতে চুরি করিতে চলিয়াছে। চোরেরা ত আর বাবুদের মতন সদর রাস্তা দিয়া চলে না—তাহারা প্রায়ই ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলে, আর সে-সব জায়গা অনেক সময়ই নোংরা থাকে। চলিতে চলিতে একজন চোর কাদার মতন একটা কি জিনিস মাড়াইল, সে জিনিসটার বিশ্রী গন্ধ। সে পা মুছিবার জন্য একটা জায়গা খুঁজিতে লাগিল। উহার নিকটেই জোলাকে গোর দিয়াছে, সে চোর পা মুছিব ত মোছ, সেই জোলার মুখে গিয়া মুছিতে লাগিল! ঘষার আর গন্ধের চোটে জোলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; সে রাগিয়া বলিল, 'উঁঃ—হুঁঃ—হুঁ—! তোমার কি চোখ নাই না কি?'

চোর আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই কে রে?'

জোলা বলিল, 'আমি জোলা।'

'এখানে কি করছিস?'

'আমি যে মরে গিয়েছি; আমার লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছে—তাই আমাকে গোর দিয়েছে।'

এই কথা শুনিয়া চোরেরা খুব হাসিতে লাগিল তারপর তাহাদের একজন বলিল, 'একে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল।'

চোরেরা জোলাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহার মৃত্যু হয় নাই, আর তাহাদের সঙ্গে গেলে পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে। জোলা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি খাওয়াবে? পায়েস?' চোরেরা বলিল, 'হাঁ, পায়েস—চল্!' পায়েসের কথা শুনিয়া জোলা কোন আপত্তি করিল না। চোরেরা তাহাকে উঠাইয়া লইয়া চলিল।

রাজার বাড়িতে গিয়া চোরেরা রাজার ঘরে প্রকাণ্ড সিঁদ কাটিল। তারপর জোলাকে ঐ সিঁদের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া বলিল, 'রাজার মাথার মুকুটটা নিয়ে আয়।' রাজার খাটে মশারি খাটানো ছিল, তাহা দেখিয়া জোলা ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল। সে মশারির চারিদিক ঘুরিয়া কোথাও তাহার দরজা দেখিতে পাইল না; সুতরাং চোরেদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'হলো না; ওর ভিতরে আর একটা ঘর আছে, তার দরজা নেই।'

চোরেরা বলিল, 'দূর বোকা! ওটা ঘর নয়, মশারি। ওটাকে তুলে দেখলি না কেন?' জোলা আবার ঘরের ভিতরে গেল।

এবার জোলা মশারি তুলিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু সেটাকে নাড়িতেও পারিল না—কারণ সে খাটসুদ্ধ ধরিয়া টানাটানি করিয়াছিল। সে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'না ভাই, ওটা বড্ড ভারি।'

'আরে, এমন গাধাও আর দেখিনি! তুই বুঝি খাটসুদ্ধ তুলতে গিয়েছিলি? শুধু ওর কাপড়টা টানতে হয়।'

এবারে জোলা আর কোন ভুল করিল না। মশারির কাপড় ধরিয়া টানিতেই

সেটা উঠিয়া আসিল। ভিতরে খুব উঁচু গদির উপরে রাজা শুইয়া আছেন, তাঁহার গায় ঝালর-দেওয়া অতিশয় পুরু লেপ। দেখিয়া জোলার মনে ভারি দুঃখ হইল। সে ভাবিল, বুঝি রাজাকে গোর দিয়াছে। তারপর দেখিল, মুখখানি জাগিতেছে! তখন সে ভাবিল যে, 'ঠিক ত আমারই মতন করেছে দেখছি! এরও লাল সুতো বেরিয়েছিল নাকি? জোলা যত ভাবে, ততই আশ্চর্য হয়, আর ততই তাহার জানিতে ইচ্ছা করে রাজা মহাশয়েরও লাল সুতা নীল সুতা বাহির হইয়াছিল কি না। শেষটা এমন হইল যে, এই খবরটা তাহার না জানিলেই নয়। সুতরাং সে রাজাকে ঠেলিয়া জাগাইল। আর, তিনি চোখ মেলিবামাত্রই, জোলা জিজ্ঞাসা করিল, 'লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছিল?'

ইহার পর একটা মস্ত গোলমাল হইল। রাজবাড়ির সকলে জাগিয়া গেল, সাত চোর ধরা পড়িল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জোলাও ধরা পড়িল।

পরদিন বিচার। জোলা আগাগোড়া সকল কথা খুলিয়া বলিল। লাল সুতো নীল সুতোর কথা, গোর দিবার কথা, চোরের পা মুছিবার কথা, পায়েসের কথা—কিছুই বাকি রাখিল না।

বিচারে সাত চোরের উচিত সাজা হইল। আর জোলাকে পেট ভরিয়া উত্তম উত্তম পায়েস খাওয়াইয়া বিদায় দেওয়া হইল।

## দুষ্ট দানব

এক দানব আর এক চাষা, দুজনে পাশা খেলছিল। খেলায় চাষার হার হলো।

পাশায় হেরে চাষা হায় হায় করতে লাগল। খেলবার আগে সে বাজি রেখেছিল যে, সে হারলে দানব তার ছেলেটিকে নিয়ে যাবে। এখন উপায় কি হবে? দানব কিছুতেই ছাড়বে না; সে বলছে, 'কালই এসে আমি ছেলে নিয়ে যাব। যদি তাকে রাখতে চাও, তবে এমন করে তাকে লুকিয়ে রেখে দাও যাতে আমি খুঁজে বার করতে না পারি। খুঁজে পেলে কিন্তু আর তাকে ফেলে যাব না।'

হায়, কি বিপদ! ছেলেটিকে কোথায় লুকোবে? যেখানেই রাখুক, দানব নিশ্চয় তাকে খুঁজে বার করবে। চাষা ভেবে কিছু করতে না পেরে শেষে দেবতার রাজাকে ডাকতে লাগল। দেবতার রাজা তার দুঃখ দেখে দয়া করে বললেন, 'তোমার কোন চিন্তা নেই; আমি তোমার ছেলেটিকে এমন করে লুকিয়ে রাখব যে দানবের বাবাও তাকে খুঁজে বার করতে পারবে না।'

এই বলে তিনি ছেলেটিকে গমের ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে তাকে একটা ছোট গমের

ভিতরে লুকিয়ে রাখলেন। তার পরদিন দানব এসে চাষার ঘরে, বাগানে, পুকুরে, বাক্সে, উনুনে, হাঁড়িতে, হুঁকোর ভিতরে—কতই খুঁজল, কোথাও ছেলেটিকে দেখতে পেল না। কিন্তু সে এমনি দুষ্ট দানব ছিল, সে তখনি বুঝে নিল যে, তবে নিশ্চয় গমের ক্ষেতে গমের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছে। অমনি সে কাস্তে নিয়ে গিয়ে ঘ্যাঁশ ঘ্যাঁশ করে গম কাটতে লাগল। সব গম কেটে, তারপর তার এক-একটি করে দানা হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখে সে দু-দণ্ডের মধ্যেই ধরে ফেলল যে, কোন্ গমটার ভিতর চাষার ছেলে বসে আছে।

আর একটু হলেই সে গমটার ভিতর থেকে চাষার ছেলেটিকে বার করে নিয়ে যেত। এর মধ্যে দেবতার রাজা এসে তার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি চাষার হাতে দিয়ে বললে, 'আমার যা সাধ্য আমি তা করেছি; এর বেশি আর পারব না।' দানব ছেলেটিকে নিতে না পেরে ভারি চটে বলল, 'বটে, আমাকে ফাঁকি দিলে? সে হবে নাঃ আমি কাল আবার আসব।'

দেবতার রাজা যখন পারলেন না, তখন চাষা আলোর দেবতার কাছে গেল। আলোর দেবতা এসে তার ছেলেটিকে একটি রাজহাঁসের গলার পালক বানিয়ে রেখে দিলেন। কিন্তু তাতেও কি সে দানবকে ঠকাবার জো আছে? সে এসেই হাঁসের গলা ছিঁড়ে পালকটি সুদ্ধ তাকে মুখে দিতে গিয়েছে। ভাগ্যিস পালকটি তখন তার ঠোঁটে লেগে রইল, নইলে আর উপায়ই ছিল না। দানবের ঠোঁটে লাগতে দেখেই আলোর দেবতা সেটিকে উঠিয়ে নিয়ে চাষার কাছে পেঁছে দিলেন, আর বললেন, 'কিছু করতে পারব না।' দানব সেদিনও ঠকে গেল, কিন্তু যাবার সময় বলে গেল, 'কাল আবার আসব।'

দেবতার রাজা হেরে গেলেন, আলোর দেবতা হেরে গেলেন। চাষা তখন আগুনের দেবতাকে ডেকে বলল, 'ঠাকুর! আপনি আমার ছেলেটিকে বাঁচান।' আগুনের দেবতা তখন ছেলেটিকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে একটা মাছের পেটের মধ্যে তার একটি ডিমের ভিতরে লুকিয়ে রাখলেন।

দানব কিন্তু এর সব টের পেয়েছে, আর তাই এবারে সে ছিপ নিয়ে তয়ের হয়ে এসেছে। সমুদ্রে কত কোটি কোটি মাছ, তার ভিতর থেকে সেই মাছটাকে দেখতে দেখতে ধরে ফেলল। সেই মাছটার পেটে কত কোটি কোটি ডিম, তার ভিতর থেকে সে সেই ডিমটাকে দেখতে দেখতে খুঁজে বার করল।

তখন আগুনের দেবতা সেই ডিমটি তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চুপি-চুপি ছেলেটিকে বললেন, 'শিগগির ঘরে পালিয়ে যা; ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিস।' এ কথা তখন দানব শুনতে পায় নি। তারপর ছেলেটি পালিয়ে অনেক অনেক দূরে গেলে সে তাকে দেখতে পেল। অমনি ঘোঁত করে লাফিয়ে উঠে সে তার পিছু পিছু ছুটল। কিন্তু ছেলেটি ততক্ষণে ঘরে ঢুকে গিয়েছে। দানবটাও তাকে ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি গেল সেই ঘরে ঢুকতে, সে

জানত না যে আগুনের দেবতা এর আগেই কখন সেই ঘরের দরজায় তিন হাত লম্বা এক লোহার খোঁচ বসিয়ে রেখেছেন। দানব রাগে ভূত হয়ে ঘরে ঢুকবার সময় সেই খোঁচ আগাগোড়া গেল তার মাথায় ঢুকে। তখন সে ভয়ানক চেঁচিয়ে চিতপাত হয়ে পড়ে যেতেই আগুনের দেবতা ছুটে এসে তার একটা পা কেটে ফেললেন।

কিন্তু পা কাটলে কি হবে? দুষ্টু দানব তাকে কি জাদুই করে রেখেছে—সেই কাটা পা তখনি এসে আবার জোড়া লেগে গেল! যা হোক, আগুনের দেবতা সেই দানবের থেকে বড় জাদুকর ছিলেন। তিনি জানতেন যে কাটা জায়গায় লোহা আর পাথর ফেলে দিলে আর জোড়া লাগতে পারে না। কাজেই তিনি তাড়াতাড়ি দানবের আর একটা পা কেটেই লোহা আর পাথর দিয়ে কাটা জায়গা চাপা দিয়ে ফেললেন। তখন আর দানবের জাদু খাটল না, দেখতে দেখতে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

তখন ত চাষার খুবই আনন্দ হলো। সে আগুনের দেবতাকে কত প্রণাম যে করল তা গুণে শেষ করা যায় না। তারপর থেকে সে সকলকে বলত যে, এই দেবতাটির মত দেবতা নেই।

## গল্প নয় সত্য ঘটনা

জন্তুওয়ালা অনেক জন্তু লইয়া শহরে একটি ঘর ভাড়া করিয়াছে। মনে করিয়াছে, আজ হাটের দিন বিস্তর লোক হাটে আসিবে, আর তামাশা দেখিয়া পয়সা দিবে। হাটে লোকের কম নাই, কিন্তু জন্তুওয়ালার ঘরের আধখানাও ভরিল না। জন্তুগুলোরও যেন ফুর্তি নাই। লোক কম দেখিয়া তাহারাও কেমন হাল ছাড়িয়া দিয়াছে; ভাল তামাশা হইতেছে না দেখিয়া যে দু-চার জন দর্শক উপস্থিত, তাহারাও হাসি-ঠাট্টা করিতেছে।

এমন সময়ে বাঘটার যেন কি হইল। সে এতক্ষণ খাঁচার এক কোণে শুইয়া ঝিমাইতেছিল। কথা নাই, বার্তা নাই, হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া, খাঁচার শিক ধরিয়া দাঁড়াইয়া ভয়ানক গর্জন! সেই গর্জন শুনিয়া দর্শকেরা হাসি ঠাট্টা ফেলিয়া, দুই লাফে দূরে সরিয়া গেল।

ব্যাপারখানা কি? এত রাগের ত কোন কারণই দেখা যায় না—তবে ঐ যে গাঁট্টাগোট্টা, লাল-গোঁফওয়ালা জাহাজের মাল্লাটা, নীল কোট পরিয়া থেঁতলো টুপি মাথায় দিয়া, এইমাত্র তামাশা দেখিবার জন্য ঘরের ভিতরে আসিয়াছে তাহাকে দেখিয়া যদি বাঘ মশায়ের ক্রোধ হইয়া থাকে।

মাল্লা বাঘের খাঁচার দিকে চাহিল, বাঘটাকেও খানিকক্ষণ ধরিয়া মনোযোগ করিয়া দেখিল, তারপর অমনি একেবারে বাঘের কাছে উপস্থিত। বাঘ তাহাকে কাছে পাইয়া আরো গর্জন করিয়া উঠিল। দর্শকেরা ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল, আর তাহাদের বড় ভয়ও হইল। মাল্লা কিন্তু ততক্ষণে খাঁচার ভিতর হাত ঢুকাইয়া দিয়া, দিব্যি বাঘের মাথা চাপড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে—সেটাকে যেন সে বিড়ালছানা পাইয়াছে। মাল্লা বলিল—'কি রে বিল্লি, কেমন আছিস ভাই?' লোকগুলি ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। যে-ভয়ংকর দাঁত, এক কামড়েই ত মাল্লার হাতখানাকে একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিবে। বাঘ কিন্তু তেমন কিছুই করিল না। সে তাহার প্রকাণ্ড মাথাটা আনিয়া, আদর করিয়া জ্যাকের (মাল্লার নাম) হাতে ঘষিতে লাগিল, আর আদর পাইলে বিড়ালের গলায় যেমন গুড়গুড় শব্দ হয়, তেমনি শব্দ করিতে লাগিল।

মুহূর্তের মধ্যে বাহিরের লোকে ইহার খবর পাইয়া দৌড়িয়া ঘরে আসিতে লাগিল, ঘরে আর লোক ধরে না। কত লোক দরজায় এক পয়সার জায়গায় সিকি দুআনি ফেলিয়া দিয়া আর বাকি পয়সার জন্য দাঁড়ায় নাই, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিতে পারিলেই ঢের মনে করিয়াছে। জন্তুওয়ালার এখন আর দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। তাহার বাক্স বোঝাই হইয়া গিয়াছে।

মাল্লা ততক্ষণে জন্তুদের একজন প্রহরীর হাত ধরিয়া বলিল, 'বিল্লীকে একবার খোল না ভাই। ও আমার পুরনো বন্ধু; একবার ভেতরে গিয়ে ওর সঙ্গে পুরনো কালের দুটো গল্প করে নিই।'

প্রহরী বেচারা একটু মুশকিলে পড়িল, আর তা হওয়ারই কথা। বাঘকে বিশ্বাস কি? চোখের সামনে একটা লোককে চিবাইয়া খাইবে, এরূপ দেখিতে তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। আর খাঁচা খুলিলে জ্যাক ঘরে যাইবেন, অথচ বাঘ বাহিরে আসিবে না, এরূপ চিন্তা করাও ত সহজ ব্যাপার নয়। বাঘ যদি একবার বাহিরে আসিয়া হাই তোলে তবে তামাশাটা কি রকমের হইবে! প্রহরী আমতা আমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি সত্যি বলছ নাকি?' জ্যাক একটু চটিয়া বলিল, 'সত্যি বলছি না ত কি? এ কোথাকার বোকা! দেখতে পাচ্ছ না, ও আমাকে চিনতে পেরেছ?'

বাঘ সেই সময় আর-এক হাঁক দিয়াছে, যেন বলিতেছে—'হ্যাঁ হে হ্যাঁ।'

প্রহরী অনেক ইতস্তত করিয়া এক হাতে দরজা খুলিল, আর-এক হাতে একখানা লোহার রুল বাগাইয়া ধরিল। জন্তুগুলি কথা না শুনিলে ঐ রুল দিয়া সে তাহাদের শাসন করে।

যেই দরজা খুলিল, অমনি দর্শকেরা তাড়াতাড়ি সরিয়া দাঁড়াইল—পাছে বাঘমহাশয়ের হঠাৎ জলযোগের খেয়াল হয়, আর বাহিরে আসিয়া দু একটিকে ধরিয়া মুখে দেন! কিন্তু বিল্লি তাহার বন্ধুকে লইয়া ব্যস্ত ছিল, অন্য লোকের কোন খবর নেয় নাই।

বাঘ অনেকবার মাল্লার চারিদিকে ঘুরিয়া অত্যন্ত স্নেহের সহিত তাহার গায়ে মাথা ঘষিতে লাগিল; তারপর দুই পায়ে দাঁড়াইয়া, হাত দুখানি জ্যাকের কাঁধে তুলিয়া দিল। জ্যাকও তাহার টুপিটা বাঘের মাথায় পরাইয়া দিল।

টুপি পরিয়া বাঘকে নেহাত মন্দ দেখিতে হইল না—দর্শকেরা খুবই হাসিয়াছিল; কিন্তু তারপর আরো মজা হইল।

টুপিটি ফিরাইয়া লইয়া মাল্লা বলিল, 'বিল্লি, যা শিখিয়েছিলাম, মনে আছে ত? দেখি—লাফা।' মাল্লা হাত খুব বাড়ায়াই ধরিল. আর বাঘ তাহার ঐ প্রকাণ্ড শরীরটা লইয়া পরিষ্কার তাহার উপর দিয়া লাফাইয়া গেল।

'আচ্ছা, ফিরে এসো।' বাঘ অমনি আবার লাফাইয়া আসিল। ভারি বাধ্য ছাত্র।

প্রহরী ভারী আশ্চর্য হইয়া গেল। সে কত চেষ্টা করিয়াও সেই বাঘকে দিয়া এত কাজ করাইতে পারে নাই। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই, এত কথা ওকে কি করে শেখালে?'

জ্যাক হাসিয়া বলিল, 'জাহাজে থাকতে ওকে খাওয়ানোর ভারটা আমার হাতেই ছিল। সেটা দেখছি আজও সে ভোলে নি,—'কেমন রে বিল্লি?' বাঘ একটু ঘোঁত করিল যেন বলিল, 'আরে, না।'

মাল্লা বলিল, 'আচ্ছা বিল্লি, বোসো ত'—অমনি বাঘ মাটিতে বিড়ালের মতন করিয়া বসিয়া পড়িল। মাল্লা তাহার গায়ে ঠেসান দিয়া বসিয়া এক হাতে তাহার থাবা চুলকাইয়া দিতে লাগিল। তারপর গান ধরিল।

বাঘ গানের সঙ্গে সঙ্গে ধুপধাপ করিয়া খাঁচার মেঝে চাপড়াইতে লাগিল। খাঁচাখানা কাঁপিতে লাগিল। মাল্লা যখন খুব জোরে গাহিতে লাগিল, তখন বাঘ 'এঁয়াও' করিয়া তাহার সঙ্গে তান ধরিল। সেই তানের চোটে ঘরের জানালাগুলি খট খট করিয়া উঠিল।

আরো তামাশা হইত, কিন্তু জ্যাক এই সময়ে জানালার ভিতর দিয়া গির্জার ঘাড় দেখিতে পাইল। তাহাকে রেলে অনেক দূর যাইতে হইবে, আর দেরি করিলে চলিতেছে না। সুতরাং সে বিল্লির কাছে বিদায় লইল। বিল্লি কিন্তু তাহাকে অত তাড়াতাড়ি ছাড়িতে রাজি নহে। জ্যাকের সঙ্গে সঙ্গে সেও খাঁচার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল—প্রহরী দরজা খুলিলে সেও জ্যাকের সঙ্গে যাইবে। প্রহরী দরজা খুলিতেছিল, বাঘের কাণ্ড দেখিয়া আর খুলিল না। জ্যাক তিনবার চুপচাপ সরিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল, বাঘ তাহার কোটের কোণ কামড়াইয়া ধরিয়া তিনবার ফিরাইল। জ্যাক মুশকিলে পড়িয়া বলিল, 'এ ত বড় মুশকিল রে বাবু। আমি ত থাকতে আসি নি, আমি শুধু দেখতে এসেছিলাম।'

কিন্তু প্রহরীর মুখ ততক্ষণে গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। মাল্লা যতই যাইতে চাহিতেছে বাঘ ততই বিরক্ত হইতেছে; শেষে চটিয়া গিয়া এক থাপ্পড়

বসাইয়া দিলেই ত মাল্লার দফা নিকাশ হইয়া যায়। এই সময়ে এক বুদ্ধি জুটিল। খাঁচাটাতে দুই কামরা। বাহিরটাতে বাঘ সকল লোকের সামনে তামাশা দেখায় ভিতরেরটাতে বসিয়া সে আহার করে। মাঝখানে দরজা আছে, বাহির হইতেই তাহা খোলা ও বন্ধ করা যায়। এই ভিতরের কামরায় বড় একটুকরো মাংস ঢুকাইয়া দেওয়া হইল, আর বাঘ অমনি বন্ধুকে ভুলিয়া খাইবার ঘরে ঢুকিল। চতুর প্রহরী তৎক্ষণাৎ মাঝখানের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। জ্যাকও সুযোগ বুঝিয়া তাহার পথ ধরিল।

## জোলা আর সাত ভূত

এক জোলা ছিল, সে পিঠে খেতে বড় ভালবাসত।

একদিন সে তার মাকে বলল, 'মা, আমার বড্ড পিঠে খেতে ইচ্ছে করছে, অমাকে পিঠে করে দাও।'

সেইদিন তার মা তাকে লাল-লাল, গোল-গোল চ্যাপটা-চ্যাপটা সাতখানি, চমৎকার পিঠে করে দিল। জোলা সেই পিঠে পেয়ে ভারি খুসি হয়ে নাচতে লাগল আর বলতে লাগল ঃ

'একটা খাব দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব।'

জোলার মা বলল, 'খালিই নাচবি যদি, তবে খাবি কখন ?'

জোলা বলল ,'খাব কি এখানে ? সবাই যেখানে দেখতে পাবে, সেখানে গিয়ে খাব।' বলে জোলা পিঠেগুলি নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, আর বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাবেই চিবিয়ে খাব !'

নাচতে নাচতে জোলা একেবারে সেই বটগাছতলায় চলে এল, যেখানে হাট হয়। সেই গাছের তলায় এসে সে খালি নাচছে আর বলছে,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব !'

এখন হয়েছে কি—সেই গাছে সাতটা ভূত থাকত। জোলা 'সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব' বলছে, আর তা শুনে তাদের তো বড্ড ভয় লেগেছে। তারা সাতজনে গুটিশুটি হয়ে কাঁপছে আর বলছে, 'ওরে সর্বনাশ হয়েছে ! ঐ দেখ, কোথেকে এক বিটকেল ব্যাটা এসেছে, আর বলছে, আমাদের সাতজনকেই চিবিয়ে খাবে ! এখন কি করি বলতে ?'

অনেক ভেবে তারা একটা হাঁড়ি নিয়ে জোলার কাছে এল। এসে জোড়হাত করে তাকে বলল, 'দোহাই কর্তা! আমাদের চিবিয়ে খাবেন না। আপনাকে এই হাঁড়িটি দিচ্ছি, এইটি নিয়ে আমাদের ছেড়ে দিন।'

সাতটা মিশমিশে কালো তালগাছপানা ভূত, তাদের কুলোর মত কান, মুলোর মত দাঁত, চুলোর মত চোখ—তারা জোলার সামনে এসে কাঁইমাই করে কথা বলছে দেখেই ত জোলা এমনি চমকে গেল যে, সেখান থেকে ছুটে পালাবার কথা তার মনেই এল না। সে বলল, 'হাঁড়ি নিয়ে আমি কি করব?'

ভূতেরা বলল, 'আজ্ঞে, আপনার যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে, তাই এই হাঁড়ির ভিতর পাবেন।'

জোলা বলল, 'বটে! আচ্ছা আমি পায়েস খাব।'

বলতে বলতেই সেই হাঁড়ির ভিতর থেকে চমৎকার পায়েসের গন্ধ বেরুতে লাগল। তেমনি পায়েস জোলা কখনো খায় নি, তার মাও খায় নি, তার বাপও খায় নি। কাজেই জোলা যার-পর-নাই খুশি হয়ে হাঁড়ি নিয়ে সেখান থেকে চলে এল। আর ভূতেরা ভাবল, 'বাবা! বড্ড বেঁচে গিয়েছি!'

তখন বেলা অনেক হয়েছে, আর জোলার বাড়ি সেখান থেকে ঢের দূরে। তাই জোলা ভাবল, 'এখন এই রোদে কি করে বাড়ি যাব? বন্ধুর বাড়ি কাছে আছে, এবেলা সেইখানেই যাই; তারপর বিকালে বাড়ি যাব এখন।'

বলে সে ত তার বন্ধুর বাড়ি এসেছে। সে হতভাগা কিন্তু ছিল দুষ্টু। সে জোলার হাঁড়িটি দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'হাঁড়ি কোত্থেকে আনলি রে?'

জোলা বলল, 'বন্ধু, এ যে-সে হাঁড়ি নয়, এর ভারি গুণ।'

বন্ধু বলল, বটে? আচ্ছা দেখি ত কেমন গুণ।'

জোলা বলল, 'তুমি যা খেতে চাও, তাই আমি এর ভিতর থেকে বার করে দিতে পারি।'

বন্ধু বলল, 'আমি রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, সরভাজা, মালপুয়া, পান্তুয়া কাঁচাগোল্লা, ক্ষীরমোহন, গজা, মতিচুর জিলিপি, অমৃতি, বরফি; চমচম—এই সব খাব।'

জোলার বন্ধু যা বলছে, জোলা হাঁড়ির ভিতর হাত দিয়ে তাই বার করে আনছে। এ-সব দেখে তার বন্ধু ভাবল যে, এ জিনিসটি চুরি না করলে হচ্ছে না।

তখন সে জোলাকে কতই আদর করতে লাগল। পাখা এনে তাকে হাওয়া করল, গামছা দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিল, আর বলল, 'আহা ভাই, তোমার কি কষ্টই হয়েছে। গা দিয়ে ঘাম বয়ে পড়েছে। একটু ঘুমোবে ভাই? বিছানা করে দেব?'

সত্যি সত্যিই জোলার তখন ঘুম পেয়েছিল, কাজেই সে বলল, 'আচ্ছা বিছানা করে দাও।'

তখন তার বন্ধু বিছানা করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে, তার হাঁড়িটি বদলে তার জায়গায় ঠিক তেমনি ধরনের আর-একটা হাঁড়ি রেখে দিল। জোলা তার কিছুই জানে না, সে বিকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ি চলে এসেছে আর তার মাকে বলছে, 'দেখ মা, কি চমৎকার একটা হাঁড়ি এনেছি। তুমি কি খাবে মা? সন্দেশ খাবে? পিঠে খাবে? দেখ আমি এর ভিতর থেকে সে-সব বার করে দিচ্ছি।'

কিন্তু এ ত আর সে হাঁড়ি নয়, এর ভিতর থেকে সে-সব জিনিস বেরুবে কেন? মাঝখান থেকে জোলা বোকা বনে গেল, তার মা তাকে বকতে লাগল।

তখন ত জোলার বড্ড রাগ হয়েছে, আর সে ভাবছে 'সেই ভুত ব্যাটাদেরই এ কাজ।' তার বন্ধু যে তাকে ঠকিয়েছে, এ কথা তার মনেই হলো না।

কাজেই পরদিন সে আবার সেই বটগাছতলায় গিয়ে বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

তা শুনে আবার ভুতগুলো কাঁপতে কাঁপতে একটা ছাগল নিয়ে এসে তাকে হাত জোড় করে বলল, 'মশাই গো! আপনার পায়ে পড়ি, এই ছাগলটা নিয়ে যান। আমাদের ধরে খাবেন না।'

জোলা বলল, 'ছাগলের কি গুণ?'

ভুতরা বলল, 'ওকে সুড়সুড়ি দিলে ও হাসে, আর ওর মুখ দিয়ে খালি মোহর পড়ে।'

অমনি জোলা ছাগলের গায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। আর ছাগলটাও 'হিহি হিহি' করে হাসতে লাগল, আর তার মুখ দিয়ে ঝর ঝর করে খালি মোহর পড়তে লাগল। তা দেখে জোলার মুখে ত আর হাসি ধরে না। সে ছাগল নিয়ে ভাবল যে, এ জিনিসটি বন্ধুকে না দেখালেই নয়।

সেদিন তার বন্ধু তাকে আরো ভাল বিছানা করে দিয়ে দুহাতে দুই পাখা নিয়ে হাওয়া করল। জোলার ঘুমও হল তেমনি। সেদিন আর সন্ধ্যার আগে তার ঘুম ভাঙল না। তার বন্ধু ত এর মধ্যে কখন ছাগল চুরি করে তার জায়গায় আর-একটা ছাগল রেখে দিয়েছে।

সন্ধ্যার পর জোলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে তার বন্ধুর সেই ছাগলটা নিয়ে বাড়ি এল; এসে দেখল যে, তার মা তার দেরি দেখে ভারি চটে আছে। তা দেখে সে বলল, 'রাগ আর করতে হবে না মা; আমার ছাগলের গুণ দেখলে খুশি হয়ে নাচবে!' বলেই সে ছাগলের বগলে আঙুল দিয়ে বলল, 'কাতু কুতু কুতু কুতু কুতু!!!'

ছাগল কিন্তু তাতে হাসল না, তার মুখ দিয়ে মোহরও বেরুল না। জোলা আবার তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে বলল, 'কাতু কুতু কুতু কুতু, কুতু কুতু কুতু কুতু!!'

তখন সেই ছাগল রেগে গিয়ে শিং বাগিয়ে তার নাকে এমনি বিষম গুঁতো মারল যে সে চিত হয়ে পড়ে চেচাঁতে লাগল। আর তার নাক দিয়ে রক্তও পড়ল

প্রায় আধ সের তিন পোয়া। তার উপর আবার তার মা তাকে এমনি বক্‌নি দিল যে, তেমন বক্‌নি সে আর খায় নি।

তাতে জোলার যে রাগ হল, সে আর কি বলব! সে আবার সেই বটগাছ-তলায় গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল,

'একটা খাব, দুটো খাব,
সাত বেটাকেই চিবিয়ে খাব!'

'বেটারা আমাকে দু-দুবার ফাঁকি দিয়েছিস, ছাগল দিয়ে আমার নাক থেঁতলা করে দিয়েছিস—আজ আর তোদের ছাড়ছি নে!'

ভূতেরা তাতে ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে কি মশাই, আমরা কি করে আপনাকে ফাঁকি দিলুম, আর ছাগল দিয়েই বা কি করে আপনার নাক থেঁতলা করলুম?'

জোলা তার নাক দেখিয়ে বলল, 'এই দেখ না, গুঁতো মেরে সে আমার কি দশা করেছে। তোদের সব কটাকে চিবিয়ে খাব!'

ভূতেরা বলল, সে কখনো আমাদের ছাগল নয়। আপনি কি এখান থেকে সোজাসুজি বাড়ি গিয়েছিলেন?'

জোলা বলল, 'না, আগে বন্ধুর ওখানে গিয়েছিলুম। সেখানে খানিক ঘুমিয়ে তারপর বাড়ি গিয়েছিলুম।'

ভূতেরা বলল, 'তবেই ত হয়েছে। আপনি যখন ঘুমাচ্ছিলেন, সেই সময় আপনার বন্ধু আপনার ছাগল চুরি করেছে।' এ কথা শুনেই জোলা সব বুঝতে পারল। সে বলল, 'ঠিক ঠিক। সে বেটাই আমার হাঁড়িও চুরি করেছে, ছাগলও চুরি করেছে। এখন কি হবে?'

ভূতেরা তাকে একগাছি লাঠি দিয়ে বলল, 'এই লাঠি আপনার হাঁড়িও এনে দেবে, ছাগলও এনে দেবে। ওকে শুধু একটিবার আপনার বন্ধুর কাছে নিয়ে বলবেন, 'লাঠি লাগ ত! তা হলে দেখবেন, কি মজা হবে! লাখ লোক ছুটে এলেও এ লাঠির সঙ্গে পারবে না, লাঠি তাদের সকলকে পিটে ঠিক করে দেবে।'

জোলা তখন সেই লাঠিটি বগলে করে তার বন্ধুকে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, একটা মজা দেখবে?'

বন্ধু ত ভেবেছে না জানি কি মজা হবে। তারপর যখন জোলা বলল, 'লাঠি, লাগ ত!' তখন সে এমনি মজা দেখল, যেমন তার জন্মে আর কখনও দেখে নি। লাঠি তাকে পিটে পিটে তার মাথা থেকে পা অবধি চামড়া তুলে ফেলল। সে ছুটে পালাল, লাঠি তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাকে পিটাতে পিটাতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বলল, 'তোর পায়ে পড়ি ভাই, তোর হাঁড়ি নে, তোর ছাগল নে, আমাকে ছেড়ে দে।'

জোলা বলল, 'আগে ছাগল আর হাঁড়ি আন; তবে তোকে ছাড়ব।'

কাজেই বন্ধুমশাই আর কি করেন? সেই পিটুনি খেতে খেতেই হাঁড়ি আর ছাগল এনে হাজির করলেন। জোলা হাঁড়ি হাতে নিয়ে বলল, 'সন্দেশ আসুক ত!' অমনি হাঁড়ি সন্দেশে ভরে গেল। ছাগলকে সুড়সুড়ি দিতে না দিতেই সে হো হো করে হেসে ফেলল, আর তার মুখ দিয়ে চারশোটা মোহর বেরিয়ে পড়ল। তখন সে লাঠি, হাঁড়ি আর ছাগল নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

এখন আর জোলা গরিব নেই, সে বড়মানুষ হয়ে গেছে। তার বাড়ি, তার গাড়ি, হাতি-ঘোড়া—খাওয়া-পরা, চাল-চলন, লোকজন, সব রাজার মতন। দেশের রাজা তাকে যার-পর-নাই খাতির করেন, তাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন ভারি কাজে হাত দেন না।

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি, আর কোন দেশের এক রাজা হাজার হাজার লোকজন নিয়ে এসে সেই দেশ লুঠতে লাগল। রাজার সিপাইদের মেরে খোঁড়া করে দিয়েছে, এখন রাজার বাড়ি লুঠে কখন তাকে ধরে নিয়ে যাবে, তার ঠিক নেই।

রাজামশাই তাড়াতাড়ি জোলাকে ডাকিয়ে বললেন, 'ভাই, এখন কি করি বল্ ত? বেঁধেই ও নেবে দেখছি।'

জোলা বলল, 'আপনার কোন ভয় নেই। আপনি চুপ করে ঘরে বসে থাকুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

বলে সে তার লাঠিটা বগলে করে রাজার সিংহদরজার বাইরে গিয়ে চুপ করে বসে রইল। বিদেশী রাজা লুঠতে লুঠতে সেই দিকেই আসছে, তার সিপাই আর হাতি ঘোড়ার গোলমালে কানে তালা লাগছে, ধুলোয় আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। জোলা খালি চেয়ে দেখছে, কিছু বলে না।

বিদেশী রাজা পাহাড়ের মতন এক হাতি চড়ে সকলের আগে আগে আসছে, আর ভাবছে, সব লুঠে নেবে। আর, জোলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আর ভাবছে, আর একটু কাছে এলেই হয়।

তারপর তারা যেই কাছে এসেছে, অমনি জোলা তার লাঠিকে বলল, 'লাঠি, লাগ ত!' আর যাবে কেথায়? তখনি এক লাঠি লাখ লাখ হয়ে রাজা আর তার হাতি-ঘোড়া সকলের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। আর পিটুনি যে কেমন দিল সে যারা সে পিটুনি খেয়েছিল তারাই বলতে পারে।

পিটুনি খেয়ে বিদেশী রাজা চেঁচাতে চেঁচাতে বলল, 'আর না বাবা, আমাদের ঘাট হয়েছে, এখন ছেড়ে দাও, আমরা দেশে চলে যাই।'

জোলা কিছু বলে না, খালি চুপ করে চেয়ে দেখছে আর একটু একটু হাসছে।

শেষে বিদেশী রাজা বলল, 'তোমাদের যা লুঠেছি, সব ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমার রাজ্য দিচ্ছি, দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও।'

তখন জোলা গিয়ে তার রাজাকে বলল, 'রাজামশাই, সব ফিরিয়ে দেবে

বলছে আর তাদের রাজ্যও আপনাকে দেবে বলছে, আর বলছে দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও। এখন কি হুকুম হয়?'

রাজামশায়ের কথায় জোলা তার লাঠি থামিয়ে দিলে। তারপর বিদেশী রাজা কাঁদতে কাঁদতে এসে রাজামশাইয়ের পায়ে পড়ে মাফ চাইল।

রাজামশাই জোলাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার এই লোকটিকে যদি তোমার অর্ধেক রাজ্য দাও, আর তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও, তা হলে তোমাকে মাফ করব।'

সে তো তার সব রাজ্যই দিতে চেয়েছিল। কাজেই জোলাকে তার অর্ধেক রাজ্য আর মেয়ে দিতে তখনি রাজি হল।

তারপর জোলা সেই অর্ধেক রাজ্যের রাজা হল, আর রাজার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হল। আর ভোজের কি যেমন তেমন ঘটা হল। সে ভাত খেয়ে যদি তারা শেষ করতে না পেরে থাকে, তবে হয়ত এখনও খাচ্ছে। সেখানে একবার যেতে পারলে হত।

## বুদ্ধিমান চাকর

এক কাজি সাহেবের এক চাকর ছিল তার নাম বুদ্ধু। চাকরটা একে বিদেশী, তাতে বুদ্ধি-সুদ্ধির ধার ধারে না—কাজেই কাজি সাহেবের মহা মুস্কিল। চাকরটা কায়দা কানুন কিছুই জানে না—বাড়িতে লোক আসলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। একদিন কাজি সাহেব তাকে দুই ধমক দিয়ে বললেন, 'ফের যদি এ রকম বেয়াদবী করিস—কাকেও সেলাম না করিস তবে তোকে আমি দেখাব। সকলকে খাতির করবি আর 'সেলাম' বলবি।'

সেই থেকে রাস্তায় বেরিয়ে যাকে দেখে সকলকেই বুদ্ধু সেলাম করে। ছেলে বুড়ো মানুষ গরু কাউকে বাদ দেয় না। এক গাধাওয়ালা তার গাধা নিয়ে চলেছে—চাকরটা তাকে সেলাম করল আর গাধাগুলোকেও খুব খাতির করে বলল, 'সেলাম'। তা শুনে গাধাওয়ালা খুব হাসতে লাগল, আর বলল, 'দূর আহাম্মক, ওদের বুঝি সেলাম বলতে হয়; ওদের 'হেই হেই' করে চালাতে হয়।' বুদ্ধু বেচারা কিছু দূর গিয়ে দেখল একজন শিকারী ফাঁদ পেতে বসে আছে, আর অনেকগুলো পাখি সেই ফাঁদের কাছে ঘুরছে। তাই দেখে সে 'হেই হেই' করে এমনি চেঁচিয়ে উঠল যে পাখি-টাখি সব উড়ে পালাল। শিকারী ত চটে লাল!

আর একদিন এক বড়লোকের বাড়িতে কাজি সাহেবের নেমন্তন্ন। বুদ্ধুও সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। তারা নবাব বংশের লোক—আশ্চর্য তাদের আদব-কায়দা। খেতে খেতে নিমন্ত্রণকর্তার দাড়িতে একটা ভাত পড়ল—অমনি একজন চাকর যেন গান করছে এমনি ভাবে গুণ গুণ করে বলতে লাগল—

ফুলের তলে বুলবুল ছানা
তারে উড়িয়ে দে না—উড়িয়ে দে না—

অমনি তার মনিব ইশারা বুঝতে পেরে দাড়ি ঝেড়ে ভাত ফেলে দিল। কাজি সাহেব বাড়ি এসে বুদ্ধুকে বললেন, 'দেখলি ত কেমন কায়দা! আমার দাড়িতে যদি খাবার সময় ভাত লাগে তুইও ঠিক তেমনি করে বলবি।' তারপর একদিন কাজি সাহেবের বাড়িতে খুব ভোজ হচ্ছে, কাজি সাহেব চাকরের কেরামতি দেখবার জন্য ইচ্ছা করে তার দাড়িতে একটা ভাত ফেলে দিলেন আর বুদ্ধুকে চোখ টিপে ইশারা করলেন। বুদ্ধু অমনি চেঁচিয়ে বলল, 'সেই যে সেদিন অমুকদের বাড়িতে না কিসের কথা হয়েছিল? আপনার দাড়িতে তাই হয়েছে—তানানা তানা।' শুনে সব লোক হো হো করে হেসে উঠল।

একদিন মনিব বললেন, 'দেখ, তুই বড় বিশ্রী ভাত রাঁধিস। তুই এখনো ফেন গালাতেই শিখিসনি। আজ যখন ভাত বানাবি, ভাত সিদ্ধ হলেই আমাকে ডাকিস আমি দেখিয়ে দেব। আমাকে না দেখিয়ে কিছু করিসনি।'

সেদিন ভাত সিদ্ধ হতেই ত চাকর মনিবকে ডাকতে গিয়েছে। দরজার বাইরে থেকে উঁকি মেরে একটা আঙুল দিয়ে ইশারা করে সে মনিবকে ডাকতে লাগল। কাজি সাহেব তখন দরজার দিকে পিছন ফিরে কি যেন লিখছিলেন তিনি এ-সব কিছুই জানেন না। চাকরটা ঘণ্টাখানেক এই রকম ডেকে শেষটায় হয়রান হয়ে পড়ল। তখন সে রেগে চিৎকার করে বলল, 'আর কতক্ষণ ডাকব? এদিকে ভাত-টাত সব ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল।' তখন কাজি সাহেব ফিরে দেখেন চাকর তাকে একটা আঙুল দিয়ে ইশারা করছে—ওদিকে সত্যি সত্যিই ভাত পুড়ে ছাই।

একদিন রাত্রে কাজি সাহেবের বাড়ি চোর ঢুকেছে। বুদ্ধু খচ্‌মচ্‌ শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করল, 'কে রে?' চোরটা গম্ভীরভাবে বলল, 'কেউ নই বাবা, কেউ নই।' তা শুনে বুদ্ধু আবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে লাগল। সকালে উঠে কাজি সাহেব দেখেন তার সব চুরি হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধুকে জিজ্ঞাসা করে যখন রাত্রের সব শুনলেন তিনি খুব রেগে গালাগালি করতে লাগলেন। কিন্তু বুদ্ধু তাতে মুখ ভারি বেজার করে বলল, 'তা কি করব—সে আমায় বারবার করে বললে, 'কেউ নই, কেউ নই' লোকটা ত দেখছি শুধু চোর নয়—ব্যাটা বেজায় মিথ্যাবাদী।'

একদিন কাজি সাহেব শহরের বাইরে কোথায় যাবেন। যাবার সময় বুদ্ধুকে বলে গেলেন, 'দেখিস, দরজাটার উপর ভাল করে চোখ রাখিস—দরজা ছেড়ে

কোথাও যাস নে, তা হলে চোরে আমার সব নিয়ে যাবে।' কাজি সাহেব চলে গেলেন—চাকর বেচারা একটা লাঠি নিয়ে দরজায় পাহারা দিতে লাগল। একদিন গেল, দুদিন গেল। তার পর দিন বুদ্ধু শুনল এক জায়গায় ভারি তামাশা দেখান হচ্ছে। তাই ত, বেচারা কি করে? অনেক ভেবে সে করল কি বাড়ির দরজাখানা খুলে সেটাকে ঘাড়ে নিয়ে তামাশা দেখতে গেল। এদিকে বাড়িতে চোর ঢুকে যা কাণ্ড করে গেল সে আর কি বলব! কাজি সাহেব বাড়িতে এসে দেখেন—সর্বনাশ, বাড়ির সিন্ধুক আলমারি সব খালি। ওদিকে বুদ্ধু বসে তামাশা দেখছে আর খুব সাবধানে দরজা পাহারা দিচ্ছে।

## ফিঙে আর কুঁকড়ো

একটা দানব ছিল, তার নাম ছিল ফিঙে; সে দেড়শো হাত লম্বা শালগাছের ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়াত। আর-একটা দানব ছিল, তার নাম কুঁকড়ো। সে ঘুঁষো মেরে লোহার মুগুর থেঁতলা করে দিত।

আর যত দানব ছিল তাদের সকলকেই কুঁকড়ো ঠেঙিয়ে ঠিক করে দিয়েছে, এখন সে ফিঙের সন্ধানে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। এ কথা শুনে অবধি ফিঙের আর ঘুম হয় না, কাজেই সেও কুঁকড়োকে এড়াবার জন্য খালি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। ফিঙে সমুদ্রের ধারে গেলে, তা শুনে কুঁকড়ো সেই দিক পানে রওনা হল। সে খবর পেয়েই ফিঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে তার নিজের ঘরে চলে এল।

ঘরখানি ছিল একটা উঁচু পর্বতের উপর; সেখান থেকে দশ দিনের পথ অবধি দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই ফিঙে ভাবল যে, ওখানে গেলে কুঁকড়ো নিতান্ত আচমকা এসে তাকে মারতে পারবে না। ফিঙেকে অমন ব্যস্ত হয়ে ফিরে আসতে দেখে তার স্ত্রী ঊনা বলল, 'কি হয়েছে?' ফিঙে আঙুল দিয়ে সমুদ্রের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ঐ কুঁকড়ো আসছে! বেটা ঘুঁষো মেরে লোহার মুগুর থেঁতলা করে দেয়। এবারে দেখছি ভারি বেগতিক।'

ঊনা সেদিকে দেখল, সত্যি সত্যিই কুঁকড়ো আসছে, কিন্তু এখনও সে ঢের দূরে, তিন-চার দিনের কমে এসে পেঁছবে না। তখন সে ফিঙেকে বলল, 'তোমার কোন ভয় নেই। তুমি পায়ের উপর পা তুলে বসে থাক, আমি কুঁকড়োকে ঠিক করে দিচ্ছি।' কিন্তু ফিঙের মনের ভয় তাতে গেল না। সে মাথা হেঁট করে বসে নানা কথা ভাবতে লাগল।

ঊনা কিন্তু ততক্ষণে চুপ করে ছিল না। সে গ্রামের লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যার ঘরে যত ভাঙা দা, কুড়ুল, কাস্তে, খন্তা, কোদাল, হুড়কো, ছিটকিনি

আর হাতুড়ি আর পেরেক ছিল, সব চেয়ে ঝুড়ি ভরে নিয়ে এল। তারপর সেইগুলো ভিতরে পুরে পুরে সে দুদিন ধরে খালি পাটিসাপটাই তয়ের করল। ফিঙে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, আর বলে, 'ও কি করছ?' উনা বলে, 'যাই করি না কেন—তুমি চুপ করে থাক।'

পিঠে হয়ে গেলে উনা তিন গামলা ছানাও তয়ের করল। তারপর ফিঙেকে অনেক পরামর্শ দিয়ে, অনেক সন্ধান শিখিয়ে রেখে, সে সব ঠিকঠাক করে রাখল। এখন কুঁকড়ো এলেই হয়।

পরদিন দুপুরবেলা কুকঁড়ো এসে উপস্থিত হয়েছে। এসেই ভয়ংকর গর্জনে আকাশপাতাল কাঁপিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ফিঙে কোথায়?' উনা বলল, 'সে ত বাড়ি নেই। কুঁকড়ো বলে নাকি একটা ছোকরা তাকে খুঁজতে সমুদ্রের ধারে ভারি বড়াই করছিল, তাই শুনে ফিঙে বিষম রেগে লাঠি হাতে তাকে মারতে বেরিয়েছে। যদি তাকে দেখতে পায় তবে আর বেচারাকে আস্ত রাখবে না।'

তা শুনে কুঁকড়ো ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আমিই ত কুঁকড়ো, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি।' এ কথায় উনা হো হো করে হেসেই কুটিপাটি। তারপর অনেকক্ষণ নাক সিঁটকিয়ে কুঁকড়োর পানে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এই টিকটিকির মত জোয়ানটি হয়ে তুমি ফিঙের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? অমন কাজও করতে নেই বাছা। কেন ফিঙের হাতে প্রাণ দেবে? আমার কথা শুনে চল, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। ততক্ষণ একটা কাজ কর দেখি; বড্ড হাওয়া আসছে, ফিঙে বাড়ি নেই, কে ঘরখানিকে ঘুরিয়ে দেবে? দেবে? দেখ ত তুমি পার কি না।'

কুঁকড়ো ভাবল, বাবা! হাওয়া থামাতে হলে ফিঙে এই ঘরটাকে ঘুরিয়ে দেয় নাকি? এখন আমি যদি 'না' বলি তবে ত দেখছি আমার বড্ড নিন্দে হবে। তখন সে আগে খুব করে তার ডান হাতের মাঝের আঙুলটা মটকে নিল। আঙুলটাতেই তার যত জোর ছিল, ওটি না হলে সে কিছুই করতে পারত না। আঙুল মটকানো হয়ে গেলে সে দুহাতে ঘরখানিকে জড়িয়ে ধরে তাতে এমনি পাক দিল যে দেখতে দেখতে পাহাড়ের চূড়া সুদ্ধ ঘরখানি ঘুরে গেল।

এতক্ষণ ফিঙে কি করছে? সে উনার পরামর্শে তার নিজের খোকা সেজে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, আর কুঁকড়োর কাণ্ড দেখে সেই কাঁথার ভিতরে ভয়ে ঘেমে আর কেঁপে অস্থির হচ্ছে।

এদিকে উনা আবার কুঁকড়োকে বলল, 'বেশ বাপু! লক্ষ্মী ছেলে তুমি। আহা! ঘরে এক ফোঁটা জল নেই, তোমাকে কি দিয়ে একটু মেঠাই খেতে দিই। পাহাড়টার নীচে জল আছে, ফিঙে পাহাড় সরিয়ে তাই তুলে আনে। আজ ত সে বাড়ি নেই, এখন উপায় কি হবে? দেখ ত বাপু তুমি পাহাড়টা ঠেলে, একটু জল আনতে পারো কি না!'

কুঁকড়ো আবার খুব করে তার আঙুল মটকে নিয়ে, সেই পাহাড়ের নীচে গিয়ে এমনি গুঁতো মারল যে তাতে দশহাত গভীর এক প্রকাণ্ড দীঘি হয়ে গেল, আর তাতে জলও হল তেমনি। তা দেখে উনা আর একটু হলেই 'মাগো!' বলে চেঁচিয়ে ফেলছিল, কিন্তু সে ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে, তাই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, 'চল, এখন তোমাকে কিছু পিঠে খেতে দিই গে।'

এই বলে উনা কুঁকড়োকে ঘরে এনে দিয়েছে সেই পিঠে খেতে। সে বেটাও এমনি লোভী—একেবারে তার দশটা তুলে নিয়ে মুখে দিয়েছে। দিয়েই সে 'উঃ—হুঃ' বলে এমনি ভয়ংকর চেঁচিয়ে উঠল যে, আর একটু হলেই তাতে ঘরের ছাত উড়ে যেত! বেজায় ব্যস্ত হয়ে সেই পিঠে চিবোতে গিয়ে তার চারটে দাঁত ভেঙে রক্তারক্তি হয়ে গিয়েছে, কাজেই না চেঁচাবে কেন?

উনা তখন বলল, 'আরে, অত চেঁচিও না, খোকার ঘুম ভেঙে যাবে। আমি ভাবছিলাম তুমি জোয়ান লোক, ঐ পিঠে খেতে তোমার ভাল লাগবে। ফিঙে আর খোকাও পিঠে খুব খায়।'

বলতে বলতে সেই খোকাটা কাঁথার ভিতর থেকে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে বলল, 'অঁ-য়্যা-! বন্দ খিদে পেয়েছে! পিতে খাব।' খোকার গলার সে আওয়াজ শুনেই ত কুঁকড়োর পিলে চমকে উঠেছে। উনা অবশ্য খোকার জন্য ভাল পিঠে করে রেখেছিল। তাই থেকে কয়েকটা খেতে দিল। কুঁকড়ো ত আর তা জানে না, সে দেখল, যাতে তার নিজের দাঁত ভেঙে গেছে, 'খোকা' তাই কপাকপ খাচ্ছে! কাজেই সে ভাবল, বাবা গো, খোকাই যদি অমনি পিঠে খেতে পারে তবে তার বাবা না জানি কি করতে পারে! ভাগ্যিস সে বেটা বাড়ি নেই।

এমন সময় 'খোকা' আবার বলল, 'পাথল দে। দল বা'ল কব্ব!' উনা তাকে একতাল ছানা আর কুঁকড়োকে একটা সাদা পাথর দিয়ে বলল, 'খোকার ঐ এক খেলা—পাথর চিপে জল বার করে। তুমিও একখানা পাথর টিপে দেখ ত।' কুঁকড়ো সেই পাথর প্রাণপণে টিপেও তা থেকে জল বার করতে পারল না। খোকার ছানা থেকে অবশ্য জল বার হতে লাগল। তা দেখে কুঁকড়ো ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'বাবা গো! আমি এই বেলা পালাই। এই খোকার বাবা এলে আমাকে আস্ত রাখবে না। আমার খালি দেখতে ইচ্ছা করছে যে এই খোকার দাঁতগুলো কেমন যা দিয়ে সে ঐ পিঠেগুলো খায়।'

এই বলে সে তাড়াতাড়ি গিয়ে যেই 'খোকা'র মুখে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে অমনি খোকাও কটাস করে তার সব-কটি আঙুল গোড়াসুদ্ধ কামড়িয়ে দিয়েছে। সেই আঙুলেই নাকি ছিল কুঁকড়োর জোর, কাজেই সে আঙুল কাটা যেতে 'হায় হায়' করে মাটিতে পড়ে গেল। 'খোকাও' তখন লাফিয়ে উঠে তার সেই দেড়শো হাত লম্বা শালের ছড়িগাছি দিয়ে তার হাড় ভাঙতে আর কিছুমাত্র দেরি করল না।

# পণ্ডিতের কথা

সেই যে হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী ছিল, সেই হবুচন্দ্র রাজার একটা ভারি জবর পণ্ডিতও ছিল। তার এতই বুদ্ধি ছিল যে, তার পেটে অত বুদ্ধি ধরত না; তাই তাকে দিন রাত নাকে কানে তুলোর টিপুলি গুঁজে বসে থাকতে হত, নইলে বুদ্ধি বেরিয়ে যেত। তুলোর টিপুলী গুঁজত বলে নাম হয়েছিল 'টিপাই' পণ্ডিত।

একদিন হয়েছে কি, হবুচন্দ্রের দেশের জেলেরা একটা এঁদো পুকুরে জাল ফেলতে গিয়েছে। সেই পুকুরে কোত্থেকে একটা শুয়র এসে ঝাঁঝি পাটার ভিতরে গা ঢাকা দিয়ে ছিল; জেলেরা জাল ফেলতেই সে গিয়েছে তার মধ্যে আটকে, তারপর জাল টেনেতুলে সেই শুয়রকে দেখতে পেয়েই ত জেলেরা ভারি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। তাদের দেশে আর কেউ কখনও এমন জানোয়ার দেখে নি। তারা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারল না, এটা কি জানোয়ার। তারা জাল দিয়ে কত বড় বড় শোল, বোয়াল, কচ্ছপ ধরেছে, কিন্তু এমন জানোয়ারের কথা ত কখনও শোনেনি। যা হোক তারা ঠিক করল যে রাজা হবুচন্দ্রের সভায় নিয়ে এটাকে দেখাতে হবে! এই বলে সেই শুয়রটাকে খুব করে জাল দিয়ে জড়িয়ে তারা রাজার সভায় নিয়ে এল। রাজা তার ছটফটি দেখে আর চ্যাঁচানি শুনে বললেন, 'বাপ রে। এটা-আবার কি জন্তু?' সভার লোকেরা কেউ সে কথার উত্তর দিতে পারল না। যে-সব পণ্ডিত সেখানে ছিল তারা দু দল হয়ে গেল। কয়েকজন বললে, 'গজক্ষয়', অর্থাৎ হাতি ছোট হয়ে গিয়ে এমন হয়েছে। কেউ বললে, 'মুষা বৃদ্ধি', অর্থাৎ ইঁদুর বড় হয়ে এমনি হয়েছে। এখন এ কথার বিচার টিপাই ছাড়া আর কে করবে? কাজেই রাজা তাকে ডেকে পাঠালেন। টিপাই এসে অনেকক্ষণ ধরে সেই শুয়রটাকে দেখে বলল, 'আরে তোমরা কেউ কিছু বোঝ না। এটাকে নিয়ে জলে ছেড়ে দাও' যদি ডুবে যায়, তবে এটা মাছ, যদি উড়ে পালায় তবে পানকৌড়ি আর যদি সাঁতরে ডাঙ্গায় ওঠে তা হলে কচ্ছপ, না হয় কুমির।' তখন সভার লোকেরা ভারি খুশি হয়ে বলল, 'ভাগ্যিস টিপাই মশাই ছিলেন, নইলে এমন কথা আর কে বলতে পারত।'

আমরা ছেলেবেলায় এই টিপাইয়ের গল্প শুনতাম। এইরূপ এক-একটা পণ্ডিত বা পাড়াগেঁয়ে বুদ্ধিমানের গল্প অনেক দেশেই আছে, তার দু-একটি নমুনা শোন।

টিপাইয়ের যে ছেলে, সেও বড় হয়ে তার বাপেরই মতন বড় পণ্ডিত হয়ে-

ছিল ; তার গ্রামের লোকেরা একটা কিছু জানতে হলেই তার কাছে আসত। এর মধ্যে একদিন রাত্রে তাদের গ্রামের ভিতর দিয়ে একটা হাতি গিয়েছে। তখন সকলে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ হাতিটাকে দেখতে পায় নি ; সকালে উঠে তার পায়ের দাগ দেখে তাদের ভারি ভাবনা হল। না জানি এ-সব কিসের দাগ, আর না জানি তাতে কি হবে। তারা এর কিছুই বুঝতে না পেরে শেষে ঢিপাইয়ের ছেলেকে নিয়ে এল। সে এসে অনেক ভেবে বললে, 'ওহ ! বুঝেছি রাত্রে চোর এসে উঘুলি নিয়ে গেছে। সে বেটা বারবার বসে ছিল, তাইতে উঘুলির তলায় দাগ পড়েছে।'

কাশীর ওদিকে এমনি এক পন্ডিতের গল্প আছে, সেই পন্ডিতের নাম ছিল 'লাল বুঝগুগের।' সে এমনি হাতির পায়ের দাগ দেখে বলেছিল—

'লাল বুঝগুগের সব সমুঝো আউর না সমঝে কোই,
চার পয়ের মে চক্কর্ বাঁধকে হরণা কুদে হোই,

অর্থাৎ লাল বুঝগুগের সব বুঝতে পারে, আর কেউ বুঝতে পারে না ; চার পায়ে জাঁতা বেঁধে হরিণ ছুটে গিয়েছে।

তুরস্ক দেশেও এমনি একটি বেজায় বুদ্ধিমান লোক ছিল, একবার একটা উট দেখে একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মশায়, এটা কি জন্তু ?' বুদ্ধিমান বললে, 'তাও—জান না ? খরেগোশ হাজার বছরের বুড়ো হয়েছে, তাইতে তার এমনি চেহারা হয়ে গিয়েছে।' কথাটা কিন্তু নিতান্ত মন্দ বলে নি, খরগোশ যদি হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারত, আর সেই হিসাবে তার নাক তুবড়ে গাল বসে মুখ লম্বা হয়ে আসত, তবে তার চেহারা অনেকটা উটের মত হত বইকি।

পাঞ্জাবে এক বুদ্ধিমান বুড়োর কথা আছে, সে বেশ মজার। গ্রামের মধ্যে সেই লোকটি সকলের চেয়ে বুড়ো আর বুদ্ধিমান, আর সব বড্ড বোকা। একদিন রাত্রে সেই গ্রামের ভিতর দিয়ে একটা উট গিয়েছিল ; সকালে উঠে তার পায়ের দাগ দেখে কেউ বুঝতে পারছে না যে, কিসের দাগ। শেষে তারা সেই বুড়োর কাছে গিয়ে বলল, 'দেখ ত এসে বুড়ো দাদা, এ-সব কিসের দাগ ?' বুড়ো দাদা সঙ্গে এসে সেই উটের পায়ের দাগগুলো দেখে খানিক হাউ হাউ করে কাঁদল, তারপর হিহি হিহি করে হেসে ফেলল। তাতে সকলে ভারি আশ্চর্য হয়ে বললে, 'তুমি কাঁদলে কেন দাদা ?' বুড়ো বললে, 'কাঁদব না ? হায় হায়। আমি মরে গেলে তোরা কার ঠেঞে এ-সব কথা জিজ্ঞেস করবি ?' তাতে সকলে ভারি দুঃখিত হয়ে বললে, 'আহা, ঠিক বলেছ দাদা। তুমি না থাকলে আর কাকে জিজ্ঞাসা করব ? তুমি আবার হাসলে কেন ?' বুড়ো বলল, 'হাসব না ? হাঃ হাঃ হা-হাআ-আ, আরে আমিও যে বুঝতে পারলুম না, এ ছাই কিসের দাগ। হাঃ হাঃ হা-হা-আ-আ-আ-আ।'

আর দু ভাইয়ের কথা বলে শেষ করি। এক গ্রামে চাষা-ভুষো থাকে,

তাদের সকলের কিছু কিছু টাকাকড়ি আছে, কিন্তু তাদের কেউ কখনও লেখাপড়া শেখে নি। সেজন্য তারা বড়ই দুঃখিত। একদিন তারা সবাই মিলে যুক্তি করল, 'চল, আমরা দুটি ছেলেকে শহরে পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে আনি। আমাদের গ্রামে একটাও পণ্ডিত নেই, কেমন কথা?' এই বলে তারা তাদের গ্রামের মোড়লের দুটি ছেলেকে শহরে পাঠিয়ে দিল; তাদের বলে দিল, 'তোরা বিদ্যে শিখে পণ্ডিত হয়ে আসবি।'

তারা দু ভাই শহরে চলেছে, পথের পাশে যা কিছু দেখছে, কোনটারই খবর নিতে ছাড়ছে না। এক জায়গায় গাছতলায় একটা হাতি বাঁধা ছিল, তাকে দেখে তারা ভারি আশ্চর্য হয়ে পথের লোককে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি ভাই?' তারা বলল, 'এটা হাতি।' তা শুনে দু ভাই ভারি খুশি হয়ে বলল, 'বাঃ, এরই মধ্যে এক বিদ্যা শিখে ফেললুম—হাতি, হাতি, হাতি, হাতি।'

তারপর শহরের কাছে এসে মন্দির দেখতে পেয়ে তারা একজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি ভাই?' সে বলল, 'এটা মন্দির।' তাতে দু ভাই বলল, 'মন্দির, মন্দির, মন্দির, মন্দির। বাঃ, আরেক বিদ্যে শেখা হল।'

বলতে বলতে তারা বাজারের ভিতর দিয়ে চলেছে। বাজারে মাছ, তরকারি, ডাল, চাল সবই আছে, আর সবই তারা চেনে, খালি আলু আর কখনও দেখে নি। সেই জিনিসটার দিকে তারা অনেকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল, তারপর আলু-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এগুলো কি ভাই?' সে তাতে রেগে বলল, 'কোথা-কার বোকা? এ যে আলু তাও জান না?' তারা দু ভাই সে কথায় কোন উত্তর না দিয়ে খালি বলতে লাগল, 'আলু, আলু, আলু, আলু।' তখন তাদের মনে হল, 'ইস আমরা কত বড় পণ্ডিত হয়ে গেছি, একটা বিদ্যে শিখলেই তাকে পণ্ডিত বলে। আর আমরা দেখতে দেখতে তিনটে বিদ্যে শিখে ফেললুম। আর কি; এখন দেশে ফিরে যাই।

কাজেই তারা গ্রামে ফিরে এল। তারপর থেকে তারা পালকি ছাড়া চলে না, গ্রামের লোক তাদের দেখলেই দণ্ডবৎ করে আর বড় বড় চোখ করে বলে, 'বাপ রে, তিন মুখো পণ্ডিত হয়ে এসেছে।' এমনি করে কয়েক বছর চলে গেল। তারপর একদিন হয়েছে কি, সেই গ্রামে কোত্থেকে এসেছে এক হাতি। গ্রামের লোক তাকে দেখেই ত আগে ছুটে পালাল। তারপর অনেক দূর থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে তাকে দেখতে লাগল, কিন্তু কেউ বলতে পারল না এটা কি, শেষে একজন বলল, 'শিগগির পণ্ডিত-মশাইয়ের ডাক।' তখনি পালকি ছুটল পণ্ডিতদের আনতে। তারা এসে চোখে চশমা এঁটে অনেকক্ষণ ধরে হাতিটাকে দেখল, তারপর বড় ভাই বলল, 'এটা মন্দির।' তা শুনে ছোট ভাই বলল, 'দাদার যে কথা! এত টাকা দিয়ে বিদ্যে শিখে এসে শেষে কিনা বলছে এটা মন্দির। আরে না না, এ মন্দির নয়, এটা আলু। আলু।'

## গল্প-সল্প

১

যদু যেমন ষণ্ডা ছিল ; সে খেতেও পারত তেমনি। যখন সে খুব ছোট ছিল, তখন একদিন সে গেল এক বড়লোকের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে। ভারি ভারি খাইয়ে সব সেখানে খেতে বসেছে, লুচি কোরমার ধুম লেগে গেছে। খাইয়েরা খুব খেতে পারাটাকে বড়ই বাহাদুরি মনে করে। তাই খাওয়া শেষ হবার সময় তারা বললে, 'আচ্ছা, আজ কে সকলের চেয়ে বেশি খেয়েছে ?' এ কথায় কেউ বলছে, 'আমি !' আর কেউ বলছে, 'না আমি !' তা শুনে যারা পরিবেশন করছিল তাদের একজন বলল, 'আজ্ঞে না ; সকলের চেয়ে বেশি খেয়েছে এ ছেলেটি (মানে যদু)। সে 'এতগুলো' লুচি আর 'এত টুকরো' কোরমা খেয়েছে।'

সকলে তাতে ভারি আশ্চর্য হয়ে যদুকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁ রে, সত্যি নাকি তুই এত খেয়েছিস ?' যদু বলল, 'খেয়েছি বৈকি। আরো খেতে পারি।' তা শুনে সবাই বলল, 'বটে ? আচ্ছা, আন্ দেখি লুচি—কোরমা, দেখি ও আর কত খেতে পারে।' শুনেছি তখন নাকি যদু আরো এক দিস্তা (চব্বিশখানা) লুচি আর আঠার টুকরো কোরমা খেয়েছিল। সত্যি মিথ্যা ভগবান জানেন, আমার তখন জন্ম হয় নি। এত খেয়েও যে যদুর পেট ভার হয়েছিল তা মনে কোর না। সে তখনি সুপারির ডালের ঘোড়া হাঁকিয়ে বাড়ি এল; এসে কালোজাম গাছে উঠে আরো অনেকগুলো কালোজাম খেল।

২

এ হল বহুকালের কথা। তখন 'খাইয়ে' বললে ভারি একটা গৌরবের কথা হত। সে সময় এক ব্রাহ্মণ এই বাহাদুরির লোভে মারাই গিয়েছিলেন। কোন বড়লোকের বাড়িতে তাঁকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে, তার যা ইচ্ছা, যত খুশি খেতে দেওয়া হত। একদিন সেখানে খেতে বসে তিনি বললেন, 'আজ আমি শুধু ছানা আর চিনি খাব।' তাই তাকে এনে দেওয়া হল। তিনি তখন সাত সের ছানা চেঁছেপুছে শেষ করে বিস্তর বাহাদুরি পেয়ে, বাড়ি এসে সেই রাত্রেই পেট ফেঁপে মারা গেলেন।

আর একটি ভটচাজ্জি মশায়ের এ বিষয়ে খুব নাম ছিল। সকলে যখন তার খাওয়া দেখে আশ্চর্য হত, তখন তিনি নিজের কপালে টোকা দিয়ে বলতেন, 'দেখছ কি ? এইটুকু শুধু নিরেট, আর সব পেট।'

৩

একটি ছেলের মনটি বড় ভাল, কিন্তু স্বভাবটি একটু পাগলাটে গোছের। সে একদিন রাত্রে এক জায়গায় গিয়েছিল পুজো দেখতে। ঢুকবার সময় তার বুট জোড়াটি খুলে বাইরে রেখে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে, কে তা নিয়ে গেছে। ছেলেটি ত তাতে হেসেই অস্থির, সে বলল, 'বেটা ভারি ঠকেছে পুরনো জুতো চুরি করেছে, দু মাসও পায়ে দিতে পারবে না।' যা হোক এখন বাড়ি ফিরে ত যেতে হবে ; কাজেই শুধু পায়ে হেঁটে, ট্রাম ধরবার জন্য হেদোর ধারে এসে উপস্থিত হল ; সেখান থেকে তার বাড়ি পঁচিশ মিনিটের পথ —পটলডাঙ্গায়। সে হেদোয় এসেই একখানা ট্রাম পেয়েছিল, কিন্তু তখন সে ভাবল, এখান থেকে উঠে কেন নাহক ঠকি ! সেই ছ পয়সাই ত দিতে হবে,— আমি শ্যামবাজারে গিয়ে ট্রাম ধরে পয়সা আদায় করে নেব। বলে সে ত সেই শুধু পায়ে হেঁটে হেঁটে শ্যামবাজারের আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সেখানে গিয়ে সে শুনল যে সেদিন আর ট্রাম পাওয়া যাবে না ; হেদোর ধারে যেখানা সে পেয়েছিল, সেই ছিল শেষ গাড়ি ! সেদিন সে বাড়ি ফিরে এলে পর তার হাসির চোটে বাড়িসুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

৪

বাংলা অক্ষরে যেমন অন্য-সব ভাষায় সকল কথা লেখা যায়—যেমন 'আই গো আপ,' কিংবা কোন নাম যেমন 'লর্ড কারমাইকেল', 'জেমস ওয়াট', সে রকম কিন্তু সব ভাষায় চলে না। চীনা ভাষায় একটি অক্ষরের এক একটি কথা। একজন বাঙালি বাবু একজন চীনা ভদ্রলোককে বললেন, 'আপনি আপনাদের ভাষার অক্ষরে আমার নাম লিখুন ত। আমার নাম 'ধ্রুব'।' চীনা ভদ্রলোকটি অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে কতকগুলি হিজিবিজি কি যেন লিখলেন। সেই লেখা অন্য একজন চীনা ভদ্রলোককে পড়তে দেওয়া হল। সে বলল, 'এতে লেখা রয়েছে দু-লু-ফা।' একজন জাপানি ভদ্রলোক ট্রাফালগার সম্বন্ধে জপানি ভাষায় কি যেন লিখছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে যেখানে ট্রাফালগার কথাটা আছে, সেটা তিনি ইংরাজীতেই লিখছিলেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ও কথাটা ইংরাজীতে লিখলেন যে ?' জাপানি ভদ্রলোক বললেন, 'আমাদের ভাষার অক্ষর দিয়ে ট্রাফালগার লেখা যায় না, সবচেয়ে কাছাকাছি যা লেখা যায়, তার উচ্চারণ হচ্ছে—'ত্রা-ফারু-গারু'।

৫

এক সাহেবের বড় বাংলা শেখবার শখ হল। তিনি এক পণ্ডিত রেখে খুব উৎসাহের সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করলেন। গোড়ায় কয়েকদিন বেশ উৎসাহের সঙ্গে পড়া চলল; কিন্তু যখন যুক্ত অক্ষর পড়া আরম্ভ হল তখনই ত সাহেবের

যত গোল বাধল। তিনি যুক্ত অক্ষর দেখে ত চটেই অস্থির, 'কি ! একটা অক্ষরের ঘাড়ে আর একটা অক্ষর ! এমন আজগুবি ভাষাও ত দেখি নি। এমন ভাষাও আবার ভদ্রলোকে পড়ে। মনুষের ঘাড়ে মানুষ, আর অক্ষরের ঘাড়ে অক্ষর, এ কেবল তোমাদের দেশেই সম্ভব।'

৬

এক চাষার বুদ্ধি একটু কম ছিল। চাষা মাঠে যাবে কাজ করতে, সারাদিন ত সেখানে থাকতে হবে, তাই তার স্ত্রী বিকালে জলখাবার জন্য তার কাপড়ে দশখানা চাপাটি বেঁধে দিল। চাষা ভারি পেটুক ছিল। সে মাঠে যেতে না যেতেই ভাবল, উঃ ! আমার দেখছি এক্ষুনি বড্ড খিদে পেয়েছে, চাপাটি খাব নাকি ! না, খাব না, তা হলে বিকালে খাব কি ?

খানিক বাদে সে ভাবল, উঃ ! বড্ড যে খিদে পেয়েছে, একখানা চাপাটি খাই, বাকি বিকেলে খাব।

এই ভেবে সে একখানা চাপাটি খেয়েছে, অমনি তার খিদে আরো বেড়ে গিয়েছে ; তখন সে ভাবল, আর-একখানা খাই। যত খায়, ততই তার খিদে যেন বেড়ে যায়। একখানা দুখানা করে সে আটখানা খেয়ে ফেলল তবুও তার পেট ভরল না। শেষে বাকি দুখানাও বার করে খেতে হল, আর তাতে তার পেটও ভরে গেল।

তখন চাষা ভাবল, আটটা খেলাম, তাতে কিছু হল না, আর এ দুটো খেতে না খেতেই পেট ভরে গেল ! আহা ! এ দুখানা কেন আগে খেলুম না, তা হলে ত গোড়াতেই পেট ভরত, আর আমার কোঁচড়ে আটখানা চাপাটি থেকে যেত। তাইত, আমি কি বোকা !

৭

এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ভোজ হচ্ছে, একদল গুলিখোর তাই শুনে সেখানে নিমন্ত্রণ খেতে চলল। যেতে যেতে তাদের একজন বলল, 'আরে, তোরা যে যাবি, ওদের ফটক শুনেছি বড্ড নিচু—ঢুকবি কি করে ?'

তা শুনে আরেকজন বলল, 'কেন ? এমনি করে ঢুকব।' বলেই সে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করল। তা দেখে আর সবকটাও তেমনি করে হামাগুড়ি দিতে লাগল।

এইভাবে ত তারা গিয়ে ভোজের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে, আর অমনি যমদূতের মত চারটে দরোয়ান এসে তাদের ঘাড়ে চেপে ধরেছে। তখন সেই প্রথম গুলিখোরটা ভারি গম্ভীর হয়ে মোটা গলায় বলল, 'এখন দেখ্ দেখিনি, আমি বলেই ছিলাম যে ফটক নিচু, আটকাবে।'

৮

একটি মাসে দশটি টাকার কমে একটি স্কুলের ছেলের খাওয়া চলে না। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা চাকরকে দু'পয়সা করে দিয়েছি। তাতেই সে আমাদের দুবেলা খেতে দিয়েছে। আমি কিন্তু হিসাব-কিতাবের কথা বলতে যাচ্ছি না, আমি সেই চাকরটির কথা বলছি। তার নাম আমরা তার সাক্ষাতে বলতাম 'কালি,' অসাক্ষাতে বলতাম—'কেলে৽ দু'পয়সায় দুবেলা মাছ, তরকারি, ডাল ভাত পেট ভরে খেতে দিতে হবে। কেলে তা ত দিতই, আবার তার উপরে ঢের লাভ করে নিতেও ছাড়ত না। তার লাভের চোটে আমাদের পেট চোঁ চোঁ করত।

বাজারে যত রকমেরই মাছ উঠুক, কেলে আনে শুধু বাটা। ছ-আঙুল লম্বা একটি মাছ, তাকেই দুভাগ করে একজনকে দেয় ল্যাজা, আর-একজনকে দেয় মুড়ো। যে ল্যাজা পায়, তার তবু দু গ্রাস খাওয়া চলে, কিন্তু যে মুড়ো পায় সে বেচারার খালি চোষাই সার।

মাছ পাতে পড়তেই ছেলেরা একজন আর-একজনকে ডেকে খবর নেয়, কার ভাগে কি জুটেছে, কিন্তু সে কথা কেউ বাংলাতে বলতে ভরসা পায় না। কেলের মেজাজটা বেজায় বেয়াড়া আর মুখটা অতি অসভ্য। ছেলেরা তাই ইংরেজিতে বলে 'কি হে 'হেড' না 'টেইল'?' একদিন একজনের পাতে পড়েছে 'ল্যাজা', সে ভুলে বলে ফেলেছে 'হেড'। অমনি কেলে বিষম দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'কি? তোমাকে দিলাম 'টেইল', আর তুমি যে বললে 'হেড'?'

সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর ছেলেরা ঘরে এসে বলতে লাগল, 'নাঃ, বেটাকে জব্দ করতে না পারলে আর চলছে না। ইংরাজিতে কথা বলব, তাও দুদিন শুনেই বুঝে নেবে, এ কি সহ্য হয়?' তখন এই যুক্তি হল যে, তরকারি যতই কম হোক, সবাই মিলে কষে ভাত খেয়ে কেলেকে নাকাল করবে।

বারজনের রান্না হয়, সেদিন রাত্রে পাঁচজনেই তার সব চেঁচেপুছে খেয়ে বসে আছে, আবার বলছে 'আরো দাও'! হাঁড়ি পানে চেয়ে কেলের মুখ শুকিয়ে গেছে, কিন্তু আর উপায় কি? পেট ভরে খেতে দিতেই হবে। সে বেলার কাজ শেষে দই চিড়ে এনে চালাতে হয়েছিল; কাজেই লাভ যা হয়েছিল, তা উলটা বাগে।

তার পরদিন কেলে আগে ভাগেই সাবধান হয়ে ঢের বেশি ভাত রেঁধেছিল; কিন্তু সবাই বললে, 'আজ আমাদের খিদে নেই।' কাজেই কেলের অনেক ভাত লোকসান হল। এমনি ভাবে দিন তিনেক যেতেই কেলে বেশ বুঝতে পারল যে ছেলেদের খুশি না রাখতে পারলে লাভের অংশ খুবই কম; তারপর থেকেই দেখা গেল যে কেলের মেজাজটিও একটু নরম, কথাবার্তাও কতকটা ভাল।

## তারপর ?

এক যে রাজা ; তার ভারি গল্প শোনার শখ। কিন্তু তা থাকলে কি হয়, রাজামশাইকে কেউ গল্প শুনিয়ে খুশি করতে পারে না।

রাজামশাই বলেন, 'যে আমাকে গল্প শুনিয়ে খুশি করতে পারবে, তাকে অর্ধেক রাজ্য দিব, না পারলে কান কেটে নিব।' তা শুনে দেশবিদেশের কত ভারি ভারি নামজাদা গল্পওয়ালা কোমর বেঁধে গোঁফে তা দিয়ে গল্পের ঝুড়ি নিয়ে আসে, কিন্তু কেউ রাজামশাইকে খুশি করতে পারে না। যাবার সময় সকলেই কাটা কান নিয়ে দেশে ফিরে যায়।

গল্প বলতে গেলেই রাজামশাই খালি বলেন, 'তারপর ?' 'তারপর' ? 'তারপর' করে গল্পওয়ালার দফা শেষ করে তবে তিনি ছাড়েন। 'রাক্ষস মরে গেল'—'তারপর ?' রাজপুত্র বেঁচে গেলেন—'তারপর ?' 'বৌ নিয়ে দেশে এলেন'—'তারপর ?' 'ভারি আনন্দ হল'—'তারপর ?' 'আমার কথা ফুরল।' 'তারপর ?' 'নটেগাছটি মুড়ল'—'তারপর ?' এমনি করে আর কত বলবে ? কাজেই শেষে একবার তাকে বলতে হয়, 'আর আমি জানি না, বা 'আর বলতে পারছি না।' তা হলেই রাজা বলেন, 'তবে গল্প বলতে এসেছিলে কেন ? কাট তবে বেটার কান।'

এই ত ব্যাপার। রাজামশাইয়ের তারপরের শেষও কেউ করে উঠতে পারে না, অর্ধেক রাজ্যও পায় না, লাভের মধ্যে কানটি যায়।

সেই দেশে থাকে এক নাপিত ; সে বড্ড কুড়ে কিন্তু ভারি সেয়ানা। সে ভাবল অর্ধেক রাজ্য যদি পাই, তবে নেহাৎ মন্দ হবে না ; একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি ? না-হয় কানটা যাবে।

এই ভেবে সে জামা জোড়া পরে, মস্ত পাগড়ি বেঁধে, লম্বা ফোঁটা কেটে, রাজার সভায় গিয়ে লম্বা সেলাম ঠুকে জোড়হাতে বলল, 'মহারাজের জয় হোক। হুকুম হয়ত কিছু গল্প শোনাই।'

রাজা বললেন, 'ভাল, ভাল, কিন্তু আমার শর্ত জান ত, খুশি করতে পারলে অর্ধেক রাজ্য দেব, না পারলে কানটি কেটে নেব।'

নাপিত বলল, 'আমার গল্পের আগাগোড়া শুনতে হবে, মাঝখানে থামতে বলতে পারবেন না।'

রাজা বললেন, 'তাই সই, আমিও ত তাই চাই।'

তখন নাপিত চাকর মহলে গিয়ে আচ্ছা করে ছিলিম আট দশ তামাক টেনে

এসে খুব গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল, 'মহারাজা, এখান থেকে অনেক দূরে এক আজব দেশ আছে।' অমনি মহারাজ বললেন, 'তারপর ?'

সেইখানে অনেক দিন আগে ভারি নামজাদা এক রাজা ছিলেন।—তারপর ?

তার রাজ্যের একধার থেকে আরেক ধার যেতে ছ'মাস লাগত।—তারপর ?

আর সে রাজ্যের মাটি যে কি সরেস ছিল, কি বলব। —তারপর ?

তাতে একসের ধান বুনলে, দশমন ধান পাওয়া যেত।—তারপর ?

তাই দেখে রাজামশাই তাঁর রাজ্যের সকল জমিতে ধান চাষ করালেন।—তারপর ?

আর তাতে ধান যা হল ! সে ধান রাখবার জন্য যে গোলা তয়ের হয়েছিল, তার একধারে দাঁড়ালে আর-একধার দেখা যেত না।—তারপর ?

লাখে লাখে মোষের গাড়ি লেগেছিল, সে ধান গোলায় আনতে। এত বড় গোলা তাতে একেবারে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল, আর একটু হলেই ফেটে যেত। —তারপর ?

তারপর সেই ধানের খবর পেয়ে পঙ্গপাল যা এল ! পঙ্গপালে দশদিক ছেয়ে গেল, আকাশ অন্ধকার, হাওয়া চলবার জো নেই, শ্বাস টানলে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল নাকে ঢোকে। —তারপর ? তারপর ?

বেটারা এসেছে ধান খেতে। কিন্তু রাজামশায়ের গোলা কি যেমন তেমন করে গড়া ? পঙ্গপালের সাধ্যি কি, তাতে ঢুকবে ? দশদিন বেটারা বন্‌ বন্‌ করে গোলার চারধারে ঘুরে বেড়াল, বেড়ার কোনখানে একটা বিঁধ বার করতে পারল না।—তারপর ? তারপর ?

তারপর এগার দিনের দিন কয়েকটা ডানপিটে ছোকরা পঙ্গপাল খুঁজে খুঁজে কোত্থেকে গিয়ে একটা বিঁধ বার করেছে, অনেক ঠেলাঠেলি করলে তা দিয়ে ভিতরে ঢোকা যায়।—তারপর ? তারপর ?

তখন তাদের পালের গোদাটা এসে সেই বিঁধের মুখে বসে বলল, 'ঠ্যাল্‌ তো রে বাপু—সকলে তোরা সবাই মিলে, দেখি, ভিতরে ঢুকতে পারি কি না—' তারপর ?

তারপর, ওঃ, সে কি বিষম ঠেলাঠেলি, গোদা বেটা চ্যাপ্টা হয়ে গেল, তবু বলল, 'ঠ্যাল ঠ্যাল।'—তারপর ?

শেষে অনেক কষ্টে, অর্ধেক ছাল বাইরে রেখে তবে গিয়ে ভিতরে ঢুকল—তারপর ?

ঢুকে একটি ধান মুখে করে নিয়ে, বিঁধের কাছে এসে বলল, 'এবারে আমাকে টেনে বার কর।'—তারপর ? ওঃহ ! সে কি টানাটানি ! আর একটু হলেই বেটা ছিঁড়ে যেত। যা হোক অনেক কষ্টে সে ধানটি নিয়ে বাইরে এল। —তারপর ?

তারপর আর এক বেটা গিয়ে বসেছে সে বিঁধের মুখে, আর তেমনি

ঠেলাঠেলির পর ভিতরে ঢুকেছে, আর একটি ধান নিয়ে তেমনি টানাটানির পর বাইরে এসেছে।—তারপর?

তারপর আরেক বেটা।—তারপর? আরেক বেটা!—তারপর আরেক বেটা। তারপর? আরেক বেটা।

রাজামশাই যতই বলেন, 'তারপর'? নাপিত ততই খালি বলে, 'আরেক বেটা।

দণ্ডের পর দণ্ড এইভাবে গেল, রাজামশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু না শুনে উপায় নেই—বলেছেন আগা-গোড়া শুনবেন, থামিয়ে দিতে পারবেন না। সন্ধ্যার সময় রাজামশাই আর থাকতে না পেরে বললেন, 'আরে, আর কত বলবে? এখনও কি শেষ হল না?'

নাপিত জোড়হাতে বলল, 'সে কি মহারাজ? সবে ত আরম্ভ। গুটি-কয়েক পঙ্গপাল সবে গুটিকয়েক ধান নিয়েছে। এখনো গোলা ধানে বোঝাই, ওদিকে আকাশ পঙ্গপালে অন্ধকার।'

কাজেই আর কি করা যায়? আরো দুদিন বসে পঙ্গপালের কথা শুনলেন। তারপর আর কিছুতেই থাকতে না পেরে কেঁদে বললেন, 'আমার ঢের হয়েছে বাবা, অর্ধেক রাজ্য নাও, নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।'

তখন নাপিতের খুব মজাই হল।

## ভুতো আর ঘোঁতো

ভুতো ছিল বেঁটে আর ঘোঁতো ছিল ঢ্যাঙা; ভুতো ছিল সেয়ানা, আর ঘোঁতো ছিল বোকা। দুজনে মিলে গেল কুলগাছ থেকে কুল পাড়তে। ঘোঁতো কিনা ঢ্যাঙা, সে দুহাতে খালি কুলই পাড়ছে। ভুতো কিনা বেঁটে, তাই সে কুল নাগাল পায় না, সে শুধু ঘোঁতোর পাড়া কুল খাচ্ছে।

কুল পাড়া হয়ে গেলে ঘোঁতো বলল, 'কুল কই রে?' ভুতো বলল, 'নেই। খেয়ে ফেলেছি।' ঘোঁতো বলল, 'বটে রে? তবে দাঁড়া, লাঠি আনছি।'

বলেই অমনি ঘোঁতো গেল গাছ কাটতে; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল—একটাও রাখল না?

গাছ বলল, 'এই যে ঘোঁতো, কেমন আছ? কোথা যাচ্ছ?' ঘোঁতো বলল, 'গাছ কাটতে; গাছ নিয়ে লাঠি বানাতে; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে; সে

কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' গাছ বলল, 'আমাকে কাটবে ? কি দিয়ে কাটবে ? কুড়ুল কই ?'

ঘোঁতো গেল কুড়ুল আনতে। কুড়ুল বলল, 'এই যে ঘোঁতো ! কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো, বলল 'কুড়ুল আনতে। কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' কুড়ুল বলল, 'আমাকে নেবে ? শানাবে কিসে ? পাথর কই ?'

ঘোঁতো গেল পাথর আনতে। পাথর বলল, 'এই যে ঘোঁতো, কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'পাথর আনতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে। কুড়ুল দিয়ে কাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে। সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' পাথর বলল, 'আমাকে নেবে ? ভেজাবে কি দিয়ে ? জল কই ?'

ঘোঁতো গেল জলের কাছে। জল বলল, 'এই যে ঘোঁতো ! কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'জল আনতে, জল দিয়ে পাথর ভেজাতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে, কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' জল বলল, 'আমাকে নেবে ? হরিণ আসবে, আমাতে নামবে, গা ভিজবে, তবে ত হবে।'

ঘোঁতো গেল হরিণের কাছে। হরিণ বলল, 'এই যে ঘোঁতো, কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'হরিণ আনতে ; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে ; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে ; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে, গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' হরিণ বলল, 'আমাকে নেবে ? কুকুর কই ? আমাকে ধরবে কে ?'

ঘোঁতো গেল তাদের কুকুর ভোলাকে ডাকতে। ভোলা বলল, 'এই যে ঘোঁতো। কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'ভোলাকে ডাকতে, ভোলাকে দিয়ে হরিণ ধরাতে ; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে ; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে ; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' ভোলা বলল, 'আমাকে নেবে ? তবে মাখন আনো, নখে মাখি !'

ঘোঁতো গেল মাখন আনতে। মাখন বলল, 'এই যে ঘোঁতো, কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'মাখন আনতে ; ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে ; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে ; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে ; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে, গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে,

লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' মাখন বলল, 'আমাকে নেবে ? তবে বেড়াল আনো, চেটে তুলুক।'

ঘোঁতো গেল তাদের মেনির কাছে। মেনি বলল, 'এই যে ঘোঁতো, কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'মেনিকে খুঁজতে, মাখন চেটে ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে ; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে ; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে ; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে ; সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' মেনি বলল, 'আমাকে নেবে ? দুধ দাও তবে খাই আগে।'

ঘোঁতো গেল গাইয়ের কাছে। গাই বলল, 'এই যে ঘোঁতো, কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'গাইয়ের কাছে দুধ আনতে ; মেনি তা খেয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিতে ; নখে মেখে হরিণ ধরতে ; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে ; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে ; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে। সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' গাই বলল, 'দুধ নেবে ? খড় আনো তবে, খাই আগে !'

ঘোঁতো গেল চাষার কাছে। চাষা বলল, 'এই যে ঘোঁতো ! কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'চাষার কাছে খড় আনতে ; গাইকে দিয়ে দুধ পেতে ; মেনি তা খেয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিতে ; নখে মেখে হরিণ ধরতে ; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে ; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে, কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে ; গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে। সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' চাষা বলল, 'খড় নেবে ? আটা আনো পিঠে খাব।'

ঘোঁতো গেল মুদীর কাছে। মুদী বলল, 'এই যে ঘোঁতো ! কেমন আছ ? কোথায় যাচ্ছ ?' ঘোঁতো বলল, 'মুদীর কাছে আটা আনতে, চাষাকে দিয়ে খড় নিতে। খড় নিয়ে গাইকে দিয়ে দুধ পেতে ; মেনি তা খেয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিতে, নখে মেখে হরিণ ধরতে ; হরিণ দিয়ে জল তোলাতে ; জল দিয়ে পাথর ভেজাতে ; পাথর দিয়ে কুড়ুল শানাতে ; কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে, গাছ দিয়ে লাঠি বানাতে ; লাঠি দিয়ে ভুতোকে মারতে। সে কেন কুল খেয়ে ফেলল, একটাও রাখল না ?' মুদী বলল, 'নদী থেকে এই চালনি ভরে জল আনো, নইলে আটা পাবে না।'

চালনি নিয়ে খুশি হয়ে ঘোঁতো গেল নদী থেকে জল আনতে। জল ত তাতে থাকে না, তুলতে গেলেই পড়ে যায়। যত তোলে ততই পড়ে। বেলা হল, বেলা গেল, সন্ধ্যা এল ; ঘোঁতো তবু খালি চালনি ডোবাচ্ছে আর তুলছে,

আর খালি ঝরঝর করে পড়ে যাচ্ছে। ঘোঁতো বলল, 'কি মুশকিল! এখন কি হবে?'

সেখানে কতকগুলো হাঁস ছিল, তারা প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকছিল। তা শুনে ঘোঁতো বলল, 'আরে তাই ত, ঠিকই ত বলেছে। চালনিতে পাঁক মাখিয়ে নিতে হবে, তাহলেই ফুটো বন্ধ হয়ে যাবে আর জল ধরবে।' নদীর ধারে পাঁক ছিল, ঘোঁতো তাই নিয়ে চালনিতে মাখাল; ফুটো বন্ধ হয়ে গেল, আর জল পড়তে পেল না। ঘোঁতো তখন হাসতে হাসতে জল নিয়ে মুদীর কাছে ফিরে এল। মুদী তাতে খুশি হয়ে ঘোঁতোকে ঢের আটা দিল। আটা নিয়ে ঘোঁতো গেল চাষার কাছে; চাষা তাতে খুশি হয়ে ঘোঁতোকে খড় দিল। খড় নিয়ে ঘোঁতো দিল গাইকে; গাই তা খেয়ে খুশি হয়ে ঢের দুধ দিল। দুধ নিয়ে ঘোঁতো দিল মেনিকে; মেনি তা খেয়ে মাখন চেটে ভোলাকে দিল। ভোলা সে মাখন নখে মেখে হরিণ ধরে আনল। হরিণ গিয়ে জলে নেমে গা ভিজিয়ে এল। ঘোঁতো তার গা থেকে জল নিয়ে পাথরে দিল, সেই পাথরে কুড়ুল ঘষে গাছ কাটল, সেই গাছ দিয়ে লাঠি বানাল, সেই লাঠি নিয়ে দাঁত কড়মড়িয়ে ছুটে গেল কুলগাছতলায় ভুতোকে মারতে। ভুতো কি ততক্ষণ গাছতলায় বসে আছে? সে তার কত আগেই ছুটে পালিয়েছে।

## গিল্‌ফয় সাহেবের অদ্ভুত সমুদ্র-যাত্রা

তোমরা 'ইউনাইটেড্ স্টেট্স' কোথায় জানো? পৃথিবীর মানচিত্রের বাঁ ধারের গোলাকারটির নাম নূতন মহাদ্বীপ। নূতন মহাদ্বীপের বড় দেশটা আমেরিকা। আমেরিকার মাঝখানটা খুব সরু, দেখিতে দুইটি দেশের মত দেখায়। এই দুইটির উপরেরটির নাম উত্তর আমেরিকা আর নিচেরটির নাম দক্ষিণ আমেরিকা। উত্তর আমেরিকার যত দেশ, ইউনাইটেড স্টেট্স তাহার মধ্যে সকলের বড়।

ইউনাইটেড স্টেট্সে গিল্‌ফয় সাহেবের বাড়ি। গিল্‌ফয় সাহেব বড় মজার লোক। বয়স তেত্রিশ বৎসর হইবে। সাহের এই বয়সটা প্রায় জাহাজে থাকিয়াই কাটাইয়াছেন। জাহাজে চড়িয়া কত দেশে গিয়াছেন, কত তামাশা দেখিয়াছেন, কিন্তু একা ছোট নৌকায় প্রশান্ত মহাসাগরে পার হন নাই, এই দুঃখে সাহেবের মন আর ঠাণ্ডা হয় না। ছুতারকে বলিলেন, 'আমাকে একখানা নৌকা গড়িয়া দাও।' ছুতার তাহাই করিল। নৌকা দৈর্ঘ্যে বার হাত,

চওড়ায় চার হাত, আর উঁচুতে দুই হাত হইল। পঞ্চাশ মণ জিনিস ধরে। সাহেব নাম রাখিলেন 'প্যাসিফিক্'। তাহার পর বলিলেন, 'জল-বিহার করিয়া অষ্ট্রেলিয়া যাইব।' অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকা হইতে প্রায় ছ'হাজার মাইল দূরে।

পাঁচ মাসের আন্দাজ খাদ্যসামগ্রী নৌকায় উঠানো হইল। ১৮৮২ সালের ১৯ আগস্ট গিল্‌ফয় সাহেব যাত্রা করিলেন; প্রথম সপ্তাহ বেশ সুখে সুখে গেলেন—তবে নৌকা বড় নিচু বলিয়া জল ছিটিয়া জিনিসগুলি ভিজাইয়া দিতে লাগিল—এই একটু অসুবিধা। এরপর প্রায় একমাস পর্যন্ত কোন দিন বাতাস পান, কোনদিন বা বাতাস থাকেই না; আর দলে দলে মাছ এবং সামুদ্রিক কচ্ছপ আসিয়া নৌকা ঘিরিয়া তামাশা দেখে। বাতাস নাই, পথ এগোয় না; খাবার জিনিসও বেশি নাই; সাহেব দেখিলেন, অত বেশি খাইলে চলিবে না। এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে এই সময়ে সাহেবের ক্ষুধা হ্রাস হইয়া উঠিল। বেশি খাইতে পারেন না—সুবিধার বিষয়ই হইল। ভোর হইবার পূর্বে তিন-চার ঘন্টা নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস ছিল, কিন্তু নৌকার নীচে কিসে ঠক্ ঠক্ করিয়া তাহার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। সাহেব দেখিলেন, হাঙ্গরের তাড়ায় ছোট ছোট মাছ আসিয়া নৌকায় ঠেকে—তাহাতেই এই শব্দ হয়। তিনি হাঙ্গর তাড়াইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তোমরা অনেকে বোটের মাঝিদের হাতে এক রকমের লগি দেখিয়াছ, তাহার মাথায় লোহার একটা বঁড়শির মত লাগানো থাকে। সাহেবের এর একটি ছিল। তিনি তাহার অগ্রভাগটা সোজা করিয়া লইলেন। এই অস্ত্র হাতে করিয়া তিনি হাল ধরিতে বসিতেন আর হাঙ্গর কাছে আসিলেই সুট করিয়া ঘা মারিতেন। হাঙ্গরগুলি ভয় পাইল, তিনি যতক্ষণ বাইরে বসিয়া থাকিতেন ততক্ষণ আর কাছে আসিতে সাহস পাইত না। ঘুমাইবার সময় একটা পিরাণ তাঁহার বসিবার জায়গায় লটকাইয়া রাখিতেন; তাহাতে হাঙ্গরগুলি মনে করিত মানুষটাই বুঝি বসিয়া রহিয়াছে; সুতরাং ঠক্‌ঠকি থামিল।

১০ই নভেম্বর একখানা জাহাজ দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার কাছে গিয়া কিছু খাবার চাহিয়া লইলেন। তাহার পর কয়েকদিন এত বাতাস পাইয়াছিলেন যে একদিন প্রায় একশত ছয় মাইল গিয়াছিলেন। ১৪ই ডিসেম্বর, ঝড় তুফানের দিন; একটা বড় ঢেউ আসিয়া তাঁহার নৌকাখানি উল্টাইয়া ফেলিল। সাহেব সাঁতরিয়া নৌকার পাশ দিয়া গেলেন এবং নোঙরের দড়ি ধরিয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে করিতে এক ঘণ্টায় নৌকাটিকে সোজা করিলেন। জল সেঁচিতে গিয়া তিনি কিছু বেশি হুড়োহুড়ি করিতে লাগিলেন—নৌকাখানি আবার উল্টাইয়া গেল। দ্বিতীয়বার নৌকা সোজা করিতে তত কষ্ট বোধ হইল না; এবার খুব সাবধান হইয়া জল সেঁচিলেন। এই গোলমালে সাহেবের ঘড়ি এবং কম্পাস হারাইয়া গেল। কিছুকাল পরে একটা কিরিচ মাছ আসিয়া নৌকার গায়ে ছিদ্র করিয়া দিয়া গেল। সাহেব তখন টের পাইলেন না।

কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন নৌকায় জল উঠিয়া জিনিসপত্র ভাসিতেছে, তখন চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি ছিদ্র বন্ধ করিলেন।

নূতন বৎসর আসিল। ৭ই জানুয়ারি একটি পাখি উড়িয়া নৌকায় আসিল, সাহেব তাহা ধরিয়া খাইলেন। ১১ই জানুয়ারি আর একটি পাখি ধরিলেন। কখন কখন দুই একটি "উড়ুক্কু" মাছ নৌকায় আসিয়া পড়িত তাহাও তিনি বিনা আপত্তিতে ভক্ষণ করিতেন। ১৬ই তারিখ তাঁহার হালটি ভাঙিয়া গেল, আর একটি করিয়া লইলেন। ইহার পর আর একদিন একটি পাখি ধরিয়াছিলেন। কিন্তু ২১এ হইতে ক্ষুধা তাঁহাকে রোগা করিতে লাগিল। নৌকার গায়ে যে সমস্ত শামুক ছিল তাহার বড়গুলি চুষিরা খাইলেন। আর একদিন গুলি করিয়া একটি পাখি মারিয়াছিলেন; কিন্ত জল হইতে উঠাইতে পারিলেন না। ৩০এ একটি পাখি ধরিয়া দেশলাই-এর আগুনে পোড়াইয়া খাইলেন। তারপর এত দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে নৌকা কোন্ দিকে যাইতেছে তাহার প্রতি মনোযোগ রহিল না। একদিন হেঁট মস্তকে বসিয়া নিজের অবস্থার কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ মাথা তুলিয়া দেখিলেন, একটি জাহাজ। তিনি আনন্দে জাহাজের দিকে যাইতে লাগিলেন; জাহাজের লোকেরাও তাহাকে দেখিতে পাইয়া জাহাজ ফিরাইল। জাহাজে উঠিয়াই তিনি কিছু খাবার চাহিলেন। খাবার শীঘ্রই আনা হইল; খাইয়া ঠাণ্ডা হইলে পর সমস্ত লোক তাঁহার ইতিহাস শুনিতে আসিল। তিনি নোট বহিতে সব লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; সেই বহি হইতে ইংরেজি পত্রিকায় এই গল্পটি ছাপা হইয়াছে।

## খুঁতধরা ছেলে

বিলাতে চারটি ভাই একদিন এক জায়গায় বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছিল। তাহাদের আলাপের বিষয়, কে কি করিবে। সকলেরই মনে ইচ্ছা, একটা কিছু হওয়া চাই। সকলের 'একটা কিছু'ত আর এক রকম হয় না। তাই চার ভাই চার রকম কথা বলিল।

একজন বলিল,—'আমি ইঁটের কারবার করিব। তাহাতে টাকা হইবে, আর ইঁট দিয়া আমার একখানা বাড়ি করিব।'

আর-একজন বলিল,—'দূর হ, তোর নেহাত ছোট নজর। আমি তোর চাইতে বেশি একটা কিছু হব—আমি ইঞ্জিনিয়ার হব। কত লোক আমার কাছে ঘরবাড়ির নক্সা করাইয়া নিতে আসিবে; কত লোকের বাড়ি-ঘর বাঁধিয়া দিব। আমি একটা 'দশজনের একজন' হইব! বলি কি, আমার নামে একটা স্ট্রীট যদি না হয়, তখন দেখিস্।'

তৃতীয় ভ্রাতা—বিলডার, কন্ট্রাক্টর, ইঞ্জিনিয়ার সব বাজে লোক, তোরা হবি চিনির বলদ। আমি কি করিব জানিস। আমি অন্যের কাজ নিয়ে ছুটোছুটি করিতে যাইব কেন? সব কাজে আমার নিজের বুদ্ধি খাটিবে। সব নূতন ফ্যাসানে বাড়ি-ঘর করিব। আমার সব এমন হইবে যাহা কেহ কখনও দেখে নাই।

শেষ ব্যক্তি উঠিয়া বলিল,—'তোরা যাহাই করিস ভাই, এমন কিছু করিতে পারিবি না যাহার উপর আমার বক্তৃতা না চলিবে। উত্তম হইল; দেখ দেখি। তোরা যাহা করবি, আমি তাহার দোষ ধরিব আনার কাজের আর অভাব কি?'

চারি ভা'য়ের পরামর্শ ঠিক হইল। একজন ইঁটের কাজ করিয়া কিছু টাকা করিল। ইঁট দিয়া তাহার একটি বাড়ি হইল। তা ছাড়া এক দুখিনী বুড়িকে ঐ ইঁট দিয়া আর একটি ঘর করিয়া দিল। কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি মহাশয়ও কথামত কাজ করিলেন। মিউনিসিপ্যালিটিকে খোঁচাইয়া নিজের নামে একটি ষ্ট্রীট পর্যন্ত কেমন করিয়া লইয়াছেন। তিনিও একটা কিছু হইয়াছেন। তৃতীয় বেচারা নূতন ধরনের বাড়ি করিতে গিয়া চাপা পড়িয়া মরিল। খুঁত ধরা মহাশয়ের ত কথাই নাই। তাহার কাজ ফুরায়ই না। মরিবার সময় পর্যন্ত সে সন্তোষজনকরূপে প্রশংসার সহিত কর্তব্য-কাজ করিয়া গেল।

একদিন স্বর্গের দরজায় দারোয়ান-দেবতা বসিয়া রহিয়াছেন। সে প্রকাণ্ড দরজা। বিশ্বকর্মার হাতের তৈরি। বুঝতেই ত পার, স্বয়ং বিশ্বকর্মা ঠাকুর যাহা করিয়াছেন সে কেমন সুন্দর। এত সুন্দর যে কি আর বলিব! দরজায় প্রকাণ্ড দুখানা কাচ লাগানো। তাহার ভিতর দিয়া দারোয়ান-ঠাকুর কে আসিল দেখিতে পান। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তাহা করিতেছিলেন না। অনেক কাল হইল স্বর্গে লোক আসে না, তাই আজকাল ব্যস্ততা কিছু কম। দেবতা দরজা খুলিবার হীরার হ্যাণ্ডেলে হাত ঝুলাইয়া সোনার টুলে বসিয়া ঝিমাইতেছেন! এমন সময় কড়াৎ কড়াৎ করিয়া দরজায় ঘা মারিবার শব্দ হইল। বাহির হইতে একজন লোক বলিতেছেন—

'অনুগ্রহ করুন মহাশয়, আমি ভিতরে আসিতে প্রার্থনা করিতে পারি? দরজাগুলি দরজাগুলি ত মন্দ নয়; কিন্তু স্বর্গের দ্বার বন্ধ থাকিবে কেন? দরজাগুলি আরো বড় হওয়া উচিত।'

'তুই কে রে? পৃথিবীর লোক, ক্যাট্ ক্যাট্ করিয়া কথা কহিতেছিস?'

'অত মোটা সুরে বলিতেছেন কেন? আমি স্বর্গে যাইতে চাই।'

'বটে? তুই করিয়াছিস কি?'

'আমি খুঁত-ধরা কাজ করিয়াছি। আমার তিন ভাই যে কাজ করিয়াছে তাহার সমস্ত দোষ আমার নোটবহিতে লিখিয়া আনিয়াছি। যে ইঁট পোড়াইয়াছিল সে আর দুই মণ কয়লা কম খরচ করিলে সুরকিওয়ালা সহজেই খোয়া

করিতে পারিত। যাহার নামে স্ট্রীট হইয়াছে সে এত রোগা যে অত বড় স্ট্রীটে তাহার কিছু দরকার নাই। যে চাপা পড়িয়া মরিয়াছে—'

'আরে থাম্, থাম্, ও-সব কি কাজ? তুই নিজের হাতে কি করিয়াছিস্?'

'এই সব নোট লিখিয়াছি।'

'দূর হ ব্যাটা, তুই কি আর কোন কাজই করিস নাই? কেবল দোষ ধরা কাজই করিয়াছিস্?'

'আর স্মৃতি পুস্তিকায় তাহা লিখিয়াছি।'

'যা, যা! তোর এখানে আসিবার হুকুম নাই।'

'আউ পচারিব কাণ্ডু জগনাথঙ্কু—' বলিয়া দারোয়ান দেবতা গান ধরিলেন। আমাদের সমালোচক দেখিলেন যে এত পথ খরচ, রেলভাড়া, গাড়িভাড়া করিয়া আসিয়াও কোন ফল পাইলেন না বিরক্ত হইয়া মনে করিলেন যে, কাগজে লেখা উচিত 'স্বর্গে ভাল অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত নাই।' গাড়ি পাইতে অনেক দেরি সুতরাং ইত্যবসরে দরজার দোষগুলি টুকিয়া রাখিতে লাগিলেন। দরজার কথা শেষ হইলে, সাহের দ্বারী-ঠাকুরের গানের এক মজার বর্ণনা লিখিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন যে, যে বুড়িকে তাঁহার ভাই ঘর করিয়া দিয়াছিল, সে আসিতেছে। তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও বুড়ি! তুই কেমন করিয়া আসিলি?'

'তাই ত বাপু, আমি ত কিছু জানি না। আমি গরীব দুঃখনী বুড়ি, এমন ত কিছুই করি নাই যাহাতে এখানে আসিতে পারি।'

'তুই কি কোন কাজই করিস নাই? আমি ত সমালেচনা করিয়াছি।'

'আমার আর ত কিছুই মনে হয় না। তবে একদিন আমার বাড়ির কাছে পুকুরে জমা বরফের উপরে পাড়ার সকলে খেলা করিতে গিয়াছিল। যাইবার সময় আমাকে সকলেই দেখিয়া মিষ্ট কথা কহিয়া গেল। আমি ভয়ানক কাতর ছিলাম। কিছুকাল পরে দেখি, আকাশে এক রকম মেঘ দেখা দিয়াছে। ওরূপ মেঘ আমার জন্মে আমি আর একবার দেখিয়াছিলাম। তখন দুই মিনিটের মধ্যে সমুদয় বরফ ফাটিয়া গিয়াছিল। আমার মনে বড় ভয় হইল। এখনই এতগুলি লোক ডুবিয়া মরিবে ভাবিয়া আমার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। আমি কি করি। রোগে মরি, উঠিবার শক্তি নাই, ডাকিলেও কেউ আমার কথা শুনিবে না। তখন আমি আস্তে আস্তে অনেক কষ্টে বাহিরে আসিয়া আপনার ঘরে আগুন লাগাইয়া দিলাম। সকল লোক বুড়ি পুড়িয়া মরিল মনে করিয়া দৌড়িয়া আসিল। তারপর কি হইল আমি বিশেষ জানি না। কেবলমাত্র একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কারও কিছু হয় নি ত?' একজন লোক বলিল, 'না, আমরা আসিয়াছি আর বরফও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।' তারপর আর কিছু জানি না। কে যেন আমাকে এখানে আনিয়াছে।'

বুড়ির কথা শুনিয়া দারোয়ান-দেবতা স্বর্গে খবর দিলেন। আর দলে দলে

দেবতারা আসিয়া 'এস এস, বুড়ি, এস' বলিয়া আদর করিয়া বুড়িকে স্বর্গের ভিতর লইয়া চলিলেন। কিন্তু বুড়ি সমালোচকের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল; বলিল—'ওর ভাই আমাকে বাড়ি করিয়া দিয়াছিল, আমার থাকিবার জায়গা ছিল না। ও মুখ কালো করিয়া ফিরিয়া যাইবে, আর আমি কোন্ প্রাণে তোমাদের সঙ্গে স্বর্গে যাইব? আমার মনে বড় লাগে। আমাকে তোমরা স্বর্গে নিও না। এ বেচারা তাহা হইলে বড় কষ্ট পাইবে।'

তখন দেবতারা সমালোচককে বলিলেন—'অলস অপদার্থ! যা! বুড়ির জন্য তোকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হইল। তুই জীবনটা কেবল সমালোচনা করিয়াই কাটাইলি, ভাল কাজ কিছুই করিলি না। তোর মতন লোক আর এর পূর্বে স্বর্গে যায় নাই।'

দেবতারা তারপর বুড়ির সঙ্গে সমালোচককেও টানিয়া স্বর্গে নিয়া চলিলেন। সমালোচক হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। একবার মাত্র বলিল, 'টানিয়া লওয়া বুঝি তোমাদের অভ্যাস নাই। ভাল করিয়া টানা হইতেছে না। এমনি করিয়া বুঝি টানে?'

ঢেঁকি যেখানেই থাক, তার ধান ভানা কাজ ঘোচে না; আমাদের সমালোচক ভায়া স্বর্গে গিয়াও খুঁত ধরিতে ব্যস্ত, আর কি-ই বা করে, একটা কাজ ত চাই? কতকগুলি ছেলে আছে, তারা কেবলই খুঁত ধরে; পরের দোষ দেখিয়া তাহার নিন্দা করার চেয়ে নিজের দোষ শোধরাইয়া পরের গুণ দেখা ভাল।

## নূতন গল্প

এক রাজা, তার তিন ছেলে। বড় ছেলে গাঁজা খায়, মেজ ছেলে লাঠি হাতে ঘুরিয়া বেড়ায়, ছোট ছেলে বাপের কাছে বসিয়া রাজ্যের কাজকর্ম দেখে। বড় দুটো ছোটটিকে দেখিতে পারে না।

'সোনার গাছ রুপোর পাতা শ্বেত কাকের বাসা তাতে!' রাজার বড় ইচ্ছা এই গাছ ছেলেরা আনিয়া দেয়। তিন ছেলে কত জায়গায় ঘুরিল। বড় দুটির কি হইল জানা গেল না; ছোটটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক রাজার বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত। সেখানে জনপ্রাণী কিছুই নাই; সব খালি। এক ঘরে একটি মেয়ে ঘুমাইয়া আছে; তাহার মাথার কাছে রুপোর কাঠি। পায়ের কাঠিটি মাথায় আনিল আর মাথার কাঠিটি পায়ের দিকে লইল; অমনি মেয়েটি জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বলিতে লাগল, 'হায়! মানুষের ছেলে তুই এখানে কেন এলি? তোকে এখনি খেয়ে ফেলবে। এ বাড়িতে রাক্ষস থাকে। আমার বাবাকে খেয়েছে, মাকে

খেয়েছে, বাড়ির সকলকে খেয়েছে, সেদিন দুটি রাজার ছেলে 'সোনার গাছ রুপোর পাতা, শ্বেত কাকের বাসা তাতে' এই গাছ নিতে এসেছিল, তাদেরও খেয়েছে। আমাকে যে কেন খায় নি জানি নে।' সে বুঝিতে পারিল যে এই মেয়ে তাহার দুই দাদার কথাই কহিতেছে। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া কত কথাই জানিয়া লইল; রাক্ষসগুলি সহজে মরিবে না, তবে যদি কেহ ঐ পুকুরের তলায় যে স্ফটিকের স্তম্ভ আছে, সেটাকে এক নিশ্বাসে ডুব দিয়া তুলিতে পারে; তারপর তাহাকে ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরে যে ভ্রমরটি আছে, তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে তবে ঐগুলি মরিবে। রাক্ষসেরা যত লোককে খাইয়াছে তাহাদের হাড়গুলি সবই রাখিয়া দিয়াছে। যদি কেহ রাক্ষসগুলিকে মারিয়া তারপর ঐ হাড়গুলিতে এই সোনার কাঠি এবং রুপোর কাঠি ধোওয়া জল ছড়াইয়া দিতে পারে, তবে ঐ-সকল লোক বাঁচিয়া উঠিবে। রাজার ছেলে এই কথা শুনিয়া একদিন রাক্ষসদের অনুপস্থিতেতে এই-সকল কার্য সাধন করিল। রাক্ষসও মারিল, ভাইদেরও বাঁচাইল।

আরো এক গল্প শুনিয়াছি। রাজার মেয়ে মরিয়া গেল, মুনি-ঠাকুর আসিয়া রাজার নিকট বলিলেন, 'রাজা, তোমার মেয়েকে আমি বাঁচাইয়া দিতেছি। আমাকে একটা বড় কড়া দাও, একটা ছুরি দাও, আর জল ও আগুন দাও। রাজা সকলই দিলেন। মুনি-ঠাকুর সেই মড়াটাকে কড়াতে সিদ্ধ করিয়া তার মাংসগুলি ফেলিয়া দিলেন। পরে হাড়গুলি পরিষ্কার করিয়া টেবিলে রাখিয়া তাহাতে মন্ত্রপূর্বক জল ছড়াইয়া দিলেন, আর অমনি যে মেয়ে ছিল সেই মেয়ে হইয়া উঠিল।

এ-সব ত গেল গল্প। সত্যি সত্যি মড়া বাঁচাইতে দেখিয়াছ? আমি দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি। চোরাসান্নিপাত রোগে যাহারা মরে, তাহাদের অনেককে দেশীয় শাস্ত্রীয় কবিরাজেরা বাঁচাইয়াছেন; এরূপ গল্প অনেকের মুখে আমি শুনিয়াছি।

একখানি ইংরাজি কাগজে নিম্নলিখিত গল্পটি পড়িয়াছি—

'বিলাতের একজন ডাক্তার একটি ছোট কুকুরের গলার শিরা কাটিয়া দিলেন; কুকুরটি দেখিতে দেখিতে রক্ত পড়িয়া মরিয়া গেল। মরিয়া গেলে পর তিন ঘণ্টাকাল একটি ঘরে কুকুরটিকে রাখিয়া দেওয়া হইল। কুকুরটি শক্ত হইয়া গেল। তারপর তাহাকে গরম জলে ফেলিয়া ক্রমাগত মাজিয়া দেওয়া হইল। হাত-পাগুলি অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দিলে পর শরীরটা যেন বেশ নরম হইল। তারপর সাহেব একটা রবারের নল দিয়া তাহার পেটে তিন ছটাক রক্ত পুরিয়া দিলেন। একটা কল দিয়া কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস করান হইতে লাগিল, এবং একটা বড় কুকুরের রক্ত ঐ ছোট কুকুরটির গায়ে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। এই সকল কার্য একেবারে হইতে লাগিল। অর্থাৎ একজন সাহেব নিশ্বাস প্রশ্বাস করাইতে লাগিলেন, একজন রক্ত দিতে লাগিলেন আর-একজন ক্রমাগত

তাহার শরীরটা মাজিতে লাগিলেন। ক্রমে কুকুরটির চক্ষু সতেজ হইল, আর কয়েক মুহূর্ত পর শরীরটা একটু একটু কাঁপিতে লাগিল। তারপর কুকুরটি হাঁপাইতে লাগিল, চক্ষু উজ্জ্বল হইল ; শেষে ফিট হইলে যেমন হয়, সেইরূপ করিতে লাগিল। তারপর ক্রমেই শান্ত হইয়া আসিতে লাগিল, একটু কোঁকাই-তেও লাগিল। প্রথম রক্ত দেওয়ার কুড়ি মিনিটের মধ্যে কুকুরটি উঠিয়া বসিল। শীঘ্রই দাঁড়াইয়া, তারপর হাঁটিতে লাগিল। দুদিনের মধ্যে সে রাস্তায় দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

সাহেবদের গরু-বাছুর মারিতে আপত্তি নাই, সুতরাং ডাক্তারমহাশয় একটি বাছুরকেও ঐরূপ করিয়া দেখিলেন। সেও বাঁচিল। আর একটি ছোট কুকুরকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া আবার ঐ প্রণালীতে বাঁচাইয়া দিলেন।'

আমরা ছোট-খাট রকমে একপ্রকার মরা জানোয়ার বাঁচাইয়াছি। সে হয়ত পাঠকগণের মধ্যে সকলেই এক-একবার করিয়া থাকিবেন। মাছিগুলিকে দু-একটা চড়চাপড় মারিলেই তাহারা মরিয়া যাইতে রাজী হয়। একটি মাছিকে ঐরূপ করিয়া তাহাকে সহজেই পুনরায় বাঁচান যাইতে পারে। মাছিটিকে এক হাতে রাখিয়া আর-এক হাত দিয়া তাহার উপর একটি ঘর নির্মাণ করিয়া দেও। ঘরের একটি ছোট দরজা রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া খুব ফুঁ দিতে থাক। দেখিবে, শীঘ্রই মাছিটি বাঁচিয়া উঠিবে।

আমাদের দেশের কথা শুনিয়াছি, সর্পাঘাতে মরা লোকগুলিকে তিন দিন চারি দিন পরে ওঝা আসিয়া মন্ত্র পাড়িয়া বাঁচাইয়া দিতে পারে। সত্য মিথ্যা শপথ করিতে পারি না।

## ভূতের গল্প

আমি ভূতের গল্প বড় ভালবাসি। তোমরা পাঁচজনে মিলিয়া ভূতের গল্প কর, সেখানে পাঁচ ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে পারি। ইহাতে যে কি মজা ; একটা শুনিলে আর একটা শুনিতে ইচ্ছা করে, দুটি শুনিলে একটা কথা কহিতে ইচ্ছা করে। গল্প শেষ হইয়া গেলে একাকী ঘরের বাহিরে যাইতে ইচ্ছা হয় না। তোমাদের মধ্যে আমার মতন কেহ আছ কিনা জানি না, বোধহয় আছ। তাই আজ তোমাদের কাছে একটা গল্প বলিব। গল্পটা একখানি ইংরাজি কাগজে পড়িয়াছি। তোমাদের সুবিধার জন্য ইংরাজি নামগুলি বদল করিয়া দিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গল্পটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবে যে শুধু নাম বদলাইলে কাজ চলিবে না। সুতরাং ঠিক যেরূপ পড়িয়াছি প্রায় সেইরূপ অনুবাদ করিয়া দেওয়াই ভাল বোধ হইতেছে।

'স্কটল্যাণ্ডের ম্যাপটার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলে বাঁ ধারে ছোট-ছোট দ্বীপ দেখিতে পাইবে। তাহার উপরেরটি নাম নর্থ উইস্ট্। নিচেরটির নাম সাউথ উইস্ট্। এর মাঝামাঝি ছোট-ছোট আরও কতকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এ সেকালের কথা, তখন স্টীম এঞ্জিনও ছিল না টেলিগ্রাফও ছিল না; আমার ঠাকুরদাদা তখন এর একটি দ্বীপে স্কুলে মাস্টারি করিতেন।

সেখানে লোক বড় বেশি ছিল না। তাদের কাজের মধ্যে কেবল মাত্র মেষ চরান, আর কষ্টে সৃষ্টে কোনমতে দিন চলার মত কিছু শস্য উৎপাদন করা। সেখানকার মাটি বড় খারাপ; তারি একটু একটু সকলে ভাগ করিয়া নেয় আর জমিদারকে খাজনা দেয়। এরা বেশ সাহসী লোক ছিল। আর ঐরকম কষ্টে থাকিত এবং সামান্য খাইয়াও বেশ একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইত। * * *

এই দ্বীপে এল্যান ক্যামেরণ নামে একজন লোক ছিলেন, তাঁহার বাড়ি গাঁ থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। এল্যানের সঙ্গে মাস্টারমশায়ের বড় ভাব, তাঁর কাছে তিনি কত রকমের মজার গল্প বলিতেন। হঠাৎ একদিন ক্যামেরণ বড় পীড়িত হইলেন, আর কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার কেউ আপনার লোক ছিল না, সুতরাং তাঁহার সমস্ত বিষয় বিক্রি হইয়া গেল। তাঁর বাড়িটা কেহই কিনিতে চাহিল না বলিয়া তাহা অমনি খালি পড়িয়া রহিল।

'এর কয়েক মাস পরে একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে ডনাল্ড্ ম্যাকলীন বলিয়া একটি রাখাল ঐ বাড়ির পাশ দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ জানালার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল, আর সে ঘরের ভিতরে এল্যান ক্যামেরণের ছায়া দেখিতে পাইল। দেখিয়াই ত তার চক্ষু স্থির! সেখানেই সে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার চুলগুলি খ্যাংরা কাঠির মত সোজা হইয়া উঠিল, ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল, গলা শুকাইয়া গেল। * * *

শীঘ্রই তাহার চৈতন্য হইল। ঐ রকম ভয়ানক পদার্থের সঙ্গে কাহারই বা জানাশুনা করিবার ইচ্ছা থাকে? সে ত মার দৌড়! একেবারে মাস্টারমহাশয়ের বাড়িতে। তাঁহার কাছে সব কথা সে বলিল। মাস্টারমহাশয় এ-সব মানেন না; তিনি তাহাকে প্রথমে ঠাট্টা করিলেন, তারপরে বলিলেন, তাহার মাথায় কিঞ্চিৎ গোল ঘটিয়াছে; আরো অনেক কথা বলিলেন—বলিয়া যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন যে, ঐরূপ কিছুতে বিশ্বাস থাকা নিতান্ত বোকার কার্য।

ডনাল্ড্ কিন্তু ইহাতে বুঝিল না, সে অপেক্ষাকৃত সহজ বুদ্ধি বিশিষ্ট অন্যান্য লোকের কাছে তাহার গল্পটা বলিল। শীঘ্রই ঐ দ্বীপের সকলেই এই গল্প জানিতে পারিল। ঐসব বিষয় মীমাংসা করিতে বৃদ্ধরাই মজবুত; তাঁহারা ভবিষ্যত সম্বন্ধে ইহাকে কত কুলক্ষণই দেখিতে পাইলেন।

'ঐ দ্বীপের মধ্যে কেবলমাত্র মাস্টারমহাশয়ের কাছেই খবরের কাগজ আসিত।

মাসের মধ্যে একবার করিয়া কাগজ আসিত আর সেদিন সকলে মাস্টারমহাশয়ের বাড়িতে গিয়া নূতন খবর শুনিয়া আসিত। সেদিন তাহাদের পক্ষে একটা খুব আনন্দের দিন। রান্নাঘরে বড় আগুন করিয়া দশ-বার জন তাহার চারিদিকে সন্ধ্যার সময় বসিয়া কাগজের বিজ্ঞাপন হইতে আরম্ভ করিয়া অমুক কর্তৃক অমুক যন্ত্রে মুদ্রিত হইল ইত্যাদি পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের তদারক ও তর্কবিতর্ক করিত। শেষের কথাগুলি সকলের একপ্রকার মুখস্থ হইয়াছিল এবং পড়া শেষ হইলে ঐ কথাটা প্রায়ই সকলে একসঙ্গে একবার বলিত।

এই সকল সভায় রাখাল, কৃষক, গির্জার ছোট পাদরি প্রভৃতি অনেকেই আসিতেন। গ্রামের মুচি ররীও আসিত। ররী ভয়ানক নাছোড়বান্দা লোক, একটা কথা উঠিলে তাহাকে একবার আচ্ছা করিয়া না ঘাঁটিয়া সহজে ছাড়িবে না।

ডনাল্ড ম্যাকলীনের ঐ ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন সকালে এইরূপ সভা করিয়া বসিয়াছে, মাস্টার মহাশয় চেঁচাইয়া তর্জমা করিতেছেন, এমন সময় একজন আসিয়া বলিল যে, এল্যান ক্যামেরণের ছায়া আবার দেখা গিয়াছে। এবারে একজন স্ত্রীলোকে দেখিয়াছে। ঐ রাখাল যে স্থানে যেভাবে উহাকে দেখিয়াছিল এও ঠিক সেই রকম দেখিয়াছে।

এরপর আর পড়া চলে কি করিয়া! মাস্টারমহাশয় চটিয়া গেলেন এবং ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। ররী তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিল। ররী কোন কথাই ঠিক মানে না; এবারেও মাস্টারমহাশয়ের কথাগুলি মানিতে পারিল না। প্রচণ্ড তর্ক উপস্থিত। ভূতের কথা লইয়া সাধারণভাবে এবং ক্যামেরণের ভূতের বিষয় বিশেষভাবে বিচার চলিতে লাগিল; আর সকলে বেশ মজা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ররীর মেজাজ গরম হইয়া উঠিল; সে বলিল—

'দেখ মাস্টারের পো, যতই কেন বল না, আমি একজোড়া নতুন বুট হারাব, তোমার সাধ্য নেই আজ দুপুর-রেতে ওখান থেকে গিয়ে দেখে এস।'

সকলে করতালি দিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয় হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু ররী ছাড়িবে কেন? সে সকলের উপর বিচারের ভার দিল। তাহারা এই মত দিল যে, মাস্টারমহাশয় যখন গল্পগুলি মানিতেছেন না, সে স্থলে তাঁহার উচিত যে নিদেনপক্ষে তিনি যে এ মানেন না তা প্রমাণ করিয়া দেন।

মাস্টারমহাশয় দেখিলেন, অস্বীকার করিলে যশের হানি হয়। তিনি বলিলেন, 'যাব বইকি' কিন্তু আমি গিয়ে ফিরে এলেও এর চাইতে আর তোমাদের জ্ঞান বাড়বে না'।

ররী—'আচ্ছা দেখা যাক।'

মাস্টারমহাশয়—'ভাল, ওখানে গিয়ে আমি কি করব?'

ররী—'ওখানে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনবার বলবে—এল্যান

ক্যামেরণ আছ গো!' কোন জবাব না পাও ফিরে এস, আমি আর ভূত মানবো না।'

মাস্টারমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, 'এটা ঠিক জেনো যে, এল্যান সেখানে থাকলে আমার কথার উত্তর দিবেই। আমাদের বড় ভাব ছিল।'

একজন বলিল, 'তাকে যদি দেখতে পাও, তাহলে মুচির কাছে ও যে টাকা পেত, সে কথাটা তুল না।'

এ কথায় সকলে হাসিয়া ফেলিল, ররী একটু অপ্রস্তুত হইল।

এইরূপে হাসি-তামাশা চলিতে লাগিল; ক্রমে মাস্টারমহাশয়ের যাওয়ার সময় হইয়া আসিল।

শেষে মুচি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—'বারটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। তুমি এখন গেলে ভাল হয়; তাহলে ঠিক ভূতের সময়টাতে পেঁছাতে পারবে।'

বেশ করিয়া কাপড়-চোপড় জড়াইয়া, মাস্টারমহাশয় যষ্টি হস্তে সেই বাড়ির দিকে চলিলেন। মাস্টারের যাইবার সময়ে সকলেই দু-একটি খোঁচা দিয়া দিল, এবং স্থির করিল, ফলটা কি হয় দেখিয়া যাইবে।

রাত্রি অন্ধকার। এতক্ষণ বেশ জ্যোৎস্না ছিল, কিন্তু এক্ষণে কালো কালো মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। মাস্টার চলিয়া গেলে সকলে আরম্ভ করিল যে, সমস্ত রাস্তাটা সাহস করিয়া যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব কি না। ছোট পাদরি বলিল যে তিনি হয়ত অর্ধেক পথ গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া যাহা ইচ্ছা বলিবেন, তখন আর কাহারো কিছু বলিবার থাকিবে না। ইহা শুনিয়া মুচির মনে ভয় হইল, জুতা জোড়াটা নেহাত ফাঁকি দিয়া নেয়, এটা তাহার ভাল লাগিল না। তখন একজন প্রস্তাব করিল যে, ররী যাইয়া দেখিয়া আসুক।

প্রথমে ররী ইহাতে আপত্তি করিল। কিন্তু উহার বক্তৃতার পরে রাজি হইল। সকলে তাহাকে সাবধান করিয়া দিল, যেন মাস্টার তাহাকে দেখিতে না পায়। তারপর সে বাহির হইল। খুব চলিতে পারিত এই গুণে শীঘ্রই সে মাস্টারকে দেখিতে পাইল। ররী একটু দূরে দূরে থাকিতে লাগিল—রাস্তাটা একটা জলা জায়গার মধ্য দিয়া—একটিও গাছপালা নাই যে মাস্টার ফিরিয়া চাহিলে তাহার আড়ালে থাকিয়া বাঁচিবে।

পরে মাস্টারমহাশয় যখন ঐ বাড়িতে পেঁছিলেন তখন ররী একটু বুদ্ধি খাটাইয়া খানিকটা ঘুরিয়া বাড়ির সম্মুখে আসিল। সেখানে একটা নিচু বেড়া ছিল, তাহার আড়ালে শুইয়া পড়িল।

সে অবস্থায় দূতের কার্য করিতে যাইয়া তাহার অন্তরটা গুর গুর করিতে লাগিল। মাস্টারমহাশয় ছিলেন বলিয়া, নহিলে সে এতক্ষণ চেঁচাইয়া ফেলিত। কষ্টেসৃষ্টে কোন মতে প্রাণটা হাতে করিয়া দেখিতেছে কি হয়। মনে করিয়াছে,

মাস্টারমহাশয় যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখা হইয়া গেলেই সে বাহির হইবে।

গ্রামের গির্জার ঘড়িতে বারটা বাজিল। সে বেড়ার ছিদ্র দিয়া চাহিয়া দেখিল যে মাস্টারমহাশয় নির্ভয়ে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

মাস্টারমহাশয় গলা পরিষ্কার করিলেন এবং একটু শুষ্ক স্বরে বলিলেন—'এল্যান ক্যামেরণ আছ গো !'—কোন উত্তর নাই।

দু-এক পা পশ্চাৎ সরিয়া একটু আস্তে আবার বলিলেন, 'এল্যান ক্যামেরণ আছ গো'—কোন উত্তর নাই।

তারপর বাড়িতে আসিবার রাস্তাটির মাথা পর্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া থতমত স্বরে অর্ধ চিৎকার অর্ধ আহ্বানের মত করিয়া তৃতীয়বার বলিলেন—'এল—ক্যামেরণ—আছ— !' তারপর আর উত্তরের অপেক্ষা নাই।—সটান চম্পট।

কি সর্বনাশ ! কোথায় মাস্টারের সঙ্গে বাড়ি যাইবে, মাস্টার যে এ কি করিয়া ফেলিলেন ! মুচি বেচারীর আর আতঙ্কের সীমা নাই। তবে বুঝি ভূত এল। আর থাকিতে পারিল না। এই সময়ে তার মনে যে ভয় হইয়াছিল, তারই উপযুক্ত ভয়ানক গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে সে মাস্টারমহাশয়ের পিছনে ছুটিতে লাগিল।

সেই ভয়ানক চিৎকার শব্দ মাস্টারমহাশয়ের কানে গেল। মুচি দৌড়িতেছে আর ডাকিতেছে—'দাঁড়াও গো মাস্টারমশাই, দাঁড়াও।' মাস্টারমহাশয় শুনিতে পাইলেন। পশ্চাতে একপ্রকার শব্দ শুনিতে পাইলেন। আর কি ? ঐ এল্যান ক্যামেরণ ! ভয়ে আরো দশগুণ দৌড়াইতে লাগিলেন। রবী বেচারা দেখিল বড় বিপদ ! ফেলিয়াই বুঝি গেল। কি করে তারও প্রাণপণ চেষ্টা। মাস্টারমহাশয় দেখিলেন, পাছেরটা আসিয়া ধরিয়াই ফেলিল। তাঁহার গায়ের বল চলিয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে মাস্টারমহাশয় যখন দেখিলেন যে আর রক্ষা নাই, তখন তিনি সাহসে ভর করিলেন, এবং খুব শক্ত করে লাঠি ধরিয়া সেই কল্পিত ভূতের দিকে ফিরিলেন এবং আর মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া যত জোর ছিল একবার সেই কল্পিত ভূতের মস্তকে 'সপাট'—সাংঘাতিক এক ঘা ! তারপর সেটাও যেন কোথাও অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

ভূতটা যাওয়াতে এখন একটু সাহস আসিল, কিন্তু তথাপি যতক্ষণ গ্রামের আলোক না দেখা গেল ততক্ষণ থামিলেন না। গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্বে সাবধানে ঘাম মুছিয়া ঠাণ্ডা হইয়া লইলেন। মনটা যখন নির্ভয় হইল তখন ঘরে গেলেন, যেন বিশেষ একটা কিছু হয় নাই। অনেক কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি সকলগুলিরই উত্তরে বলিলেন—

'ঐ আমি যা বলেছিলাম ; ভূত টুত কিছুই ত দেখতে পেলাম না !'

এরপর মুচির জন্য সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মাস্টারকে তাহারা বলিল যে, সে স্থানান্তরে গিয়াছে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।

আধঘণ্টা হইয়া গেল তবু মুচি আসে না। সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। চিন্তা বাড়িতে লাগিল, ক্রমে একটা বাজিল। তারপর আর থাকিতে পারিল না, মুচির অনুপস্থিতির কারণ তাহারা মাস্টারমহাশয়কে বলিয়া ফেলিল। মাস্টারমহাশয় শুনিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিলেন। লাফাইয়া উঠিয়া লণ্ঠন হাতে করিয়া দৌড়িয়া বাহির হইলেন এবং সকলকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া দৌড়িয়া চলিলেন।

সকলেরই বিশ্বাস হইল মাস্টারমহাশয়ের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। হৈ চৈ কাণ্ড! সকলেই জিজ্ঞাসা করে—ব্যাপারটা কি? তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া তাহারা মাস্টারকে দাঁড়াইতে বলিতে লাগিল। তাহাদের শব্দ শুনিয়া কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। কুকুরের গোলমালে গাঁয়ের লোক জাগিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করে—ব্যাপারখানা কি!

এই সময়ে মাস্টারমহাশয় জলার মধ্যে দিয়া দৌড়িতেছেন। মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে—কেবল পুলিস—ম্যাজিস্ট্রেট—জুরী—ইত্যাদি ভয়ানক বিষয় মনে হইতেছে। তাঁহার লণ্ঠনের আলো দেখিয়া অন্যেরা তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছে।

সকলে তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহাকে ধরিল এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মাস্টারমহাশয়ের উত্তর দিবার পূর্বেই সেই মাঠের মধ্য হইতে গালি এবং কোঁকানি মিশ্রিত একপ্রকার শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। কতদূর গিয়া দেখা গেল, একটা লোক জলার ধারে বসিয়া আছে। লণ্ঠনের সাহায্যে নির্ধারিত হইল যে এ আর কেহ নহে, আমাদের সেই মুচি। সেইখানে বেচারা দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া আছে, আর তাহাদের মাস্টারের উদ্দেশে গালাগালি দিতেছে। তাহার নিকট হইতে সকলে সমস্ত ঘটনা শুনিল।

* * *

শেষে অনুসন্ধানে জানা গেল যে ঐ বাড়ির জানালার ঠিক সম্মুখে একটা গাছ ছিল। তাহারই ছায়া চন্দ্রের আলোতে দেয়ালে পড়িত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই ছায়ার আকৃতি দেখিতে ঠিক ক্যামেরণের মুখের মত। সেদিন চন্দ্র ছিল না বলিয়াই মাস্টারমহাশয় সেই ছায়া দেখিতে পান নাই।

[illegible]